ফাঁস

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : দোলপূর্ণিমা, ১৩৭১

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

মুদ্রক : নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

ফাঁস

।। এক ।।

সময়টা হল সকাল, কলকাতার কাছাকাছি কোনও একটা পল্লী। মানুষের কলকোলাহলে জেগে উঠেছে। একালের একটি হাউসিং এস্টেট। ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা বিশ্রী বাড়ি। ওইরকমই একটি বাড়ির প্রবেশমুখ. সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। অপরিচ্ছন্ন, জীবনে ঝাঁট পড়ে না। চারপাশে গোটাকতক আধমরা গাছ। এক একরকম চেহারার মানুষ ঢুকছে-বেরোচ্ছে। চারপাশে বাড়ি, মাঝখানে টাক-পড়া খোলা একটা মাঠ। কোথাও পড়ে আছে প্লাস্টিকের ব্যাগ, কোথাও পড়ে আছে আইসক্রীমের কাপ। পাঁচমিশেলি আবর্জনার ছড়াছড়ি। এই মাঠেই মর্নিং ওয়াক করছেন শৌখিন এক বৃদ্ধ। পরিধানে ধপধপে সাদা পাজামা ও পাঞ্জাবি। হাতে একটা বাহারি ছড়ি। সাঁই করে একটা সাইকেল চক্কর মেরে চলে গেল। আরোহী এক যুবক। ফ্ল্যাটের একদিকে একতলার সংলগ্ন একচিলতে জমিতে আর এক প্রবীণ মানুষ বাগান করার ব্যর্থ চেষ্টা নিত্যদিনের মতো আজও করছেন। হাতে খুরপি, মাঝে মাঝে নিচু হচ্ছেন। পরে পরেই সোজা হয়ে এক হাত দিয়ে কোমরের পিছন দিকটা চেপে ধরছেন। ভদ্রলোকের নাম নিত্যানন্দ। যিনি বেড়াচ্ছেন তাঁর নাম পরমানন্দ।

নিত্যানন্দ নিজের মনেই বলছেন, এই কোমর! সারাটা জীবন ভুগিয়ে গেল। নিচু হলে কনকন, সোজা হলে খটাস।

পরমানন্দ রাউন্ড দিতে দিতেই শুনলেন। বাগানের বেড়ার কাছাকাছি এসে বললেন, এসব নেগলেকটের ফল, কোমর হল কব্জা। তাকে কব্জায় রাখতে গেলে যোগাসন করতে হয়, রোজ ভুজঙ্গাসন কর, উপকার পাবে। ভোগটাই শিখলে, যোগটা শিখলে না। আমাকে দেখ, এই বয়সেও ফিট।

নিত্যানন্দ একটু হেসে বললেন, শুধু ফিট নয়, ফিটফাট। তুমি ভাই ব্যাচেলার মানুষ, সংসারীদের শতেক জ্বালা। রিটায়ার করার পর সাহেবী কায়দায় গার্ডেনিং শুরু করলাম। না হল গার্ডেন, না গেল কোমরের বার্ডেন। আচ্ছা, টেলিভিশনের মেয়েগুলো অমন কোমর দুলিয়ে নাচে কী করে? আমি সেদিন বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করেছিলুম, তিনদিন শয্যাশায়ী।

পরমানন্দ বললেন, তোমার যেমন বুদ্ধি, কোমরে বল-বিয়ারিং ফিট না করলে ও নাচ নাচা যায় না। তুমি বিকেলে এসো, ভুজঙ্গাসন প্র্যাকটিস করাব।

পরমানন্দের কথা শেষ হতে না হতেই ভিতর থেকে ভেসে এল এক আর্ত নারীকণ্ঠ, শিগ্‌গির এসো, খোকা দরজা খুলছে না। নিত্যানন্দ খুরপি ফেলে ভিতরের দিকে দৌড়লেন। পরমানন্দ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিত্যানন্দের ফ্ল্যাটে ঢুকলেন। নিত্যানন্দের ফ্ল্যাটের একটি ঘর দরজা-বন্ধ, বাইরে সবাই— নিত্যানন্দের স্ত্রী মালিনী, মেয়ে পূর্ণা।

নিত্যানন্দ— দরজা খুলছে না, ধাক্কা মেরেছ?

মালিনী— অনেকবার।

নিত্যানন্দ— অনেকবার! তাহলে কী হবে?

নিত্যানন্দের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ছড়ি হাতে পরমানন্দ। তিনি ছড়ি দিয়ে দরজায় টোকা মারতে মারতে বললেন, দরজা ভাঙতে হবে। সাইকেলে যে ছেলেটি বাইরে পাক মারছিল তার নাম মোহন। হইচই শুনে সেও ঢুকে পড়েছিল। কেউ লক্ষ্য করেনি। মোহন বললে, দাঁড়ান কাকাবাবু, ভাঙার আগে আমি বাইরের জানালা দিয়ে দেখে আসি। মোহন চলে যেতেই পরমানন্দ বললেন, এ স্কাউন্ড্রেলটা কোথা থেকে এল? পূর্ণা ভুরু কুঁচকে বলল, স্কাউন্ড্রেল বলছেন কেন? পরমানন্দ মেঝেতে ছড়ি ঠুকে বললেন, কেন বলব না। এমন কোনও পাপ নেই যা করেনি। মোহনকে আসতে দেখে নিত্যানন্দ বললেন, চুপ চুপ, আসছে। মোহন এসে বলল, ঘরে কেউ নেই, এমটি। সকলে একসঙ্গে বলে উঠলেন, তাহলে! মোহন দরজার ওপর দিকটা দেখিয়ে বললে, তাহলে এই, দরজার ওপর দিকে তাকান। বাইরে থেকে ছিটকিনি তোলা। পরমানন্দ এতক্ষণের সমালোচনা ভুলে বলে উঠলেন, রাইট ইউ আর। তোমার চোখ আছে, আমাদের থেকেও নেই। মোহন বললে, আপনারা এত ভয় পেলেন কেন? ভাবলেন, আত্মহত্যা করেছে। তাই না?

মালিনী বললেন, ছেলেটা বড় ডিপ্রেশানে ভুগছে। পরমানন্দ একটু তিরিক্ষি গলায় বললেন, একালের এই এক ফ্যাশন হয়েছে। যৌবন আর ডিপ্রেশন। আমাদের কালে এসব ছিল না। নিত্যানন্দ উত্তর দিলেন, আমাদের কালে টিভিও ছিল না, কম্পিউটারও ছিল না। পরমানন্দ বললেন, এর জন্য প্রয়োজন মেডিটেশন ও প্রাণায়াম। এক দুই তিন চার, চার তিন দুই এক। ভ্রমণ প্রাণায়াম। কুম্ভক নেই। একেবারে ফিতে মাপা শ্বাস-প্রশ্বাস। মনের সব বিক্ষিপ্ততা হাওয়া। যাই, আমার ফিফটি রাউন্ড্ এখনও বাকি। পরমানন্দ বেরিয়ে যেতেই পূর্ণা বললে, মোহনদা, দাদার কী হয়েছে জান তুমি? মোহন বললে, জানি। নিত্যানন্দ ও মালিনী একসঙ্গে বলে উঠলেন, জান তুমি? মোহন বেশ গম্ভীর গলায় বললে, এপাড়ার সকলের সব খবর আমি জানি। আমি এক যাযাবর, আমি এক টিকটিকি। দেওয়ালে দেওয়ালে আমি ঘুরি। মালিনী দুঃখের গলায় বললেন, আমাদের কিছুই বলে না। তুমি জান তো বল না। মোহন বললে, আমি বলাবলির মধ্যে নেই। আমার হল কার্য-কারণ, কারণ-কার্য, খোকা আমার বন্ধু জ্যাঠামশাই।

মালিনী অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লেন, সেই মেয়েটা? মোহন একটু বাঁকা হেসে বললে, কোনও মেয়ের জন্য কোনও ছেলে একালে বিষ খাবে না। সে হত অতীতে, ইতিহাসে। হীর-বণঝা, লায়লা-মজনু, শাহজাহান-তাজমহল। জ্যাঠাইমা, কারণ অন্য। পূর্ণা প্রাথমিক উত্তেজনাটা কেটে গেছে দেখে নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল, মোহনদা, চা খাবে? মোহন বললে, না, আমি কোনও বাড়িতে চা, জলখাবার, ভাত খাই না। চায়ের দোকান, হোটেল আমার জায়গা। একবারই চা

খেয়েছিলাম এক বাড়িতে। পরে জানতে পারলুম, তারা কাপটা ফেলে দিয়েছিল। ভেবেছিল, আমার মতো একটা জঘন্য ছেলের জঘন্য ডিজিজ থাকাই স্বাভাবিক। ভদ্দরলোকেদের ব্যাপারই আলাদা ভাই, তাই সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি/সারা জীবন আমি যেন ছোটলোকই থাকি।

॥ দুই ॥

রাত হয়েছে। গুপীর চায়ের দোকান। বাইরে রোল ও চাউমিনের ঠেক। সেখানে গুপীর যৌবনবতী বউ সামাল দিচ্ছে। চেহারার চটকও আছে, প্রদর্শনও আছে। এপাড়ার সোফিয়া লোরেন, সবাই সোফিয়া বলেই ডাকে। দোকানের ভিতরে একটা গুলতানি, তার মধ্যে মোহনও আছে। প্রশান্ত চোখে একটা ঠাকুর্দ্দা মার্কা চশমা পরে খুব জ্ঞান দিচ্ছে। প্রশান্ত বলে তাকে কেউ আর ডাকে না। বলে জ্ঞানদা।

প্রশান্ত খুব গম্ভীর মুখে বলছে, ভারতের এখন যা অবস্থা, তাতে সব অচল হয়ে যাবে। একটা পরিবর্তন চাই। সর্বত্র দুর্নীতি, পটলে দুর্নীতি, আলুতে দুর্নীতি, চায়ে দুর্নীতি—কোনও কিছুতেই কিছু নেই। মানুষে মানুষ নেই, পুকুরে মাছ নেই।

মোহন বললে, কুকুরে কিন্তু কুকুর আছে। খেতে দিলে লেজ নাড়ে, ইট মাড়লে কেঁউ কেঁউ করে।

প্রশান্ত বললে, এই মানুষ ছাড়া আর সব ঠিক আছে। কোনও বাবা কুকুর বলবে না, আমার ছেলে-মেয়েরা আগের মতো নেই। নো জেনারেশন গ্যাপ।

হঠাৎ একটা ছেলে ঢুকল, সামান্য একটু উত্তেজিত। তাকে দেখেই মোহন বললে, কী হল রে? অমন চনমন করছিস? বাঘ বেরিয়েছে? ছেলেটি বললে, মধুচক্রে পুলিশ হানা। মোহন জিজ্ঞাসা করল, কী অপরাজিতায়? ছেলেটি বলল, হ্যাঁ, বউদি, ক্যাচ-কট-কট। প্রশান্ত দার্শনিকের মতো বলে উঠল, ঘরে ঘরে ব্রথেল, যুবসমাজ জাগো, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। মোহন বললে, ধপাস্ করে শুয়ে পড়। প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল, ক' জোড়া? ছেলেটি বলল, তিনজোড়া। প্রশান্ত বলল, খোঁজ নিয়ে দেখ, সব টিন-এজার। বুঝলে এ বাজার অর্থনীতি দেশটার বারোটা বাজাবে। লোভ, লোভ, বাইবেলে আছে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

গুপী চায়ে চিনি গুলতে গুলতে বললে, না খেয়ে মরার চেয়ে খেয়ে মরাই ভাল। মরতে তো হবেই। প্রশান্ত বললে, তোমরা খাচ্ছ না, তোমার বউকে কী মধুচক্রে যেতে হচ্ছে। গতর খাটিয়ে খাচ্ছ। তোমরা হলে উজ্জ্বল উদাহরণ। মোহন তোমার কী মত?

মোহন বললে, পৃথিবীটাকে আরও একটু বুঝি তারপর বলব, কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক। আপনার টিউটোরিয়াল হোমের কী হল? সেই প্রশ্নপত্র আউট। গুপী চায়ের কাপ সাজাতে সাজাতে বলল, আ মোহন, তোমার এই এক বদ

অভ্যাস, মানুষের লেজে পা দেওয়া।

প্রশান্ত বললে, না, না, ও ঠিক বলেছে, আমরা সবাই অসৎ। আমি টিউটোরিয়াল তুলে দিয়েছি। আমি সৎ হবার চেষ্টা করছি। কিন্তু মোহন, তুমি কী সৎ?

মোহন বললে, না, আমি একশো ভাগ অসৎ, এক অ্যান্টিসোশ্যাল।

প্রশান্ত বললে, আমি তা মনে করি না, তুমি সাহসী। তুমি যা তুমি তাই। তোমার মধ্যে অভিনয় নেই। প্রশান্ত সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই পকেটে ভরে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। মোহন বললে, প্রশান্তকে আমরা জ্ঞানদা বলি, মানুষটা কিন্তু বেঁচে আছে। কিছুক্ষণ পরে মোহনও বেরিয়ে গেল। রোল-কাউন্টারের সামনে সোফিয়া বললে, রাতে আসছ তো? মোহন বললে, না এলে খাব কোথায়? সোফিয়া জিজ্ঞাসা করলে, চললে কোথায়? মোহন বললে, সমাজসেবায়। রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

।। তিন ।।

একটা অন্ধকার ঘুপচি মতো জায়গা। কালো কালো গোটা কয়েক সিল্যুয়েট। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট হচ্ছে চেহারা। সেই অন্ধকারে মোহন প্রবেশ করল। কে যেন একজন বলে উঠল, মোহনদা। মোহন জিজ্ঞাসা করল, এখানে খোকা এসেছে? কণ্ঠস্বর বলল, না। মোহন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল, গেল কোথায় সকাল থেকে, সত্যিই স্যুইসাইড করল নাকি? কণ্ঠস্বর বললে, করতে পারে। দু'লাখ টাকা চোট হয়ে গেছে। মোহন বললে, মানে? কণ্ঠস্বর বললে, তুমি জান না, সব খবরই তো রাখ। মোহন বললে, আমি একটা খবরই রাখি। পূর্ণা আমাকে ভালবাসে। কিন্তু ভালবাসা আমার মধ্যে নেই। ভালবাসার চেয়ে ভাল একটা বাসা একালে অনেক দামি। ভালবাসা নয় ভাল বাসা। এক প্রোমোটার আমার পিছনে লেগেছে। বলছে, অনন্তদের বাড়িটা ম্যানেজ করে দিতে পারলে নগদ তিন লাখ ও ফ্রি একটা ফ্ল্যাট তিনতলায়। কণ্ঠস্বর বললে, করে দাও। ওরাও তো মোটা পাবে। মোহন বললে, বাড়িটার ইতিহাস জানিস? গান্ধীজি তিন দিন কাটিয়েছিলেন। তার আগে সি আর দাশ ওখানে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মিটিং করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ আসতেন। ওটা জাতীয় সম্পত্তি। একটা মন্দির। প্রতিটি ইঁটে লেখা আছে বিপ্লবের কাহিনী। ওখানে পায়রার খোপ করে স্বার্থপরদের সংসার বসাবে?

কণ্ঠস্বর বললে, তোমার ইতিহাস-ভূগোল রাখ, টাকাই সব। এই যে আমার বাবার বাইপাস করাতে হবে। দেড় থেকে দু'লক্ষর ব্যাপার। এই মাসের মধ্যে নামাতে না পারলে মন্ত্র পড়তে হবে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম। মাকে বললুম, বের কর তোমার গহনাপত্র। অনেক হাঁটকা-হাঁটকির পর লেংটি ইঁদুরের লেজের মতো একটা হার বেরোল। সে কী গো এই তোমার অবস্থা। বোনের বিয়েতে

গহনা গোত্রান্তর হয়ে গেছে। তোমার ওই প্রোমোটারকে আমার দিকে ঠেলে দাও, এক সপ্তাহের মধ্যে ওই ইতিহাসে বর্তমানের স্ট্রাকচার তুলে দেব। অ্যাডভান্স দু'লাখ।

মোহন বললে, কাকাবাবুর বয়স হল কত?

কণ্ঠস্বর, পঁয়ষট্টি।

মোহন বললে, ম্যাক্সিমাম। নড়বড়ে আরও ধর পাঁচ বছর। সত্তর। এই পাঁচটা বছরের দাম দু'লাখ। ভেরি কস্টলি। চোখ, হাঁটু, গাঁটের কী হাল?

কণ্ঠস্বর, গ্লুকোমা, আরথ্রাইটিস।

মোহন বললে, এবার ছুটি করে দে।

কণ্ঠস্বর, যায় না। হৃদয় খুব দুর্বল। মাটির মা দুর্গাকে বিসর্জন দিতে চোখে জল আসে।

মোহন বললে, দু'লাখ পাবি কোথায়?

কণ্ঠস্বর বললে, ওই প্রোমোটার। এক্স জমিদারের চার ছটাক জমি।

মোহন বললে, যাবি কোথায়?

কণ্ঠস্বর, একটা খুপরি তো মিলবে।

মোহন বললে, তোর জুতোর ব্যবসার কী হল?

কণ্ঠস্বর, ক্যাপিটাল নেই।

মোহন জিজ্ঞাসা করল, চাকরি?

কণ্ঠস্বর, চাকর আছে, নো চাকরি।

মোহন জিজ্ঞেস করল, উপায়?

কণ্ঠস্বর বললে, নিরুপায়।

অদূরেই বড় রাস্তা। মাঝে মাঝে গাড়ি চলে যাচ্ছে হু-হু শব্দে। হেডলাইটের একঝলক আলোয় অন্ধকারের চরিত্ররা স্পষ্ট হতে না হতেই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেই আলো-আঁধারিতে ত্রস্ত নারী-কণ্ঠস্বর, দাদা এখানে আছিস?

কণ্ঠস্বর বললে, কী হল? তুই এখানে? বাবা?

নারীকণ্ঠ, না, দিদিকে থানায় নিয়ে গেছে।

কণ্ঠস্বর, কেন?

নারীকণ্ঠ, দিদি ওখানে ছিল।

নারীকণ্ঠ, কোন্‌খানে, পথ অবরোধে?

নারীকণ্ঠ, না, ওইখানে।

অন্ধকারে মোহনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বুঝতে পারছিস না কেন? রেবাদের ফ্ল্যাটে, মধুচক্রে।

কণ্ঠস্বর, মাকে বল, একটা দড়ি নিয়ে যেতে, গলায় দিয়ে ঝুলে পড়ুক।

মোহন বললে, কেন? এই তো জ্ঞান দিচ্ছিলিস, টাকাটাই সব। কল্যাণী তুই বাড়ি যা, আমি দেখছি।

।। চার ।।

পাড়ার নেতা বিধান বোসের ডেরা। বিধান আর মোহন মুখোমুখি।

বিধান।। মোহনানন্দ আনন্দেই আছ। একটু ভুঁড়ি নেমেছে মনে হচ্ছে।

মোহন।। উদুরি হচ্ছে দাদা।

বিধান।। কী কারণে অধমের কাছে আগমন?

মোহন।। সেবার তোমার রাইভ্যাল মুকুন্দের জিওগ্রাফি পালটে দেবার পর তুমি বর দিতে চেয়েছিলে রাজা দশরথ। কৈকেয়ী এখন বর চাইতে এসেছে। টেলিফোনটা তোল।

বিধান।। তুলে?

মোহন।। থানায় ও.সি.-কে বল, রেবাদের ঠেক থেকে মাধুরী বলে যে মেয়েটাকে তুলে এনেছে তাকে যেন ছেড়ে দেয়।

বিধান।। মাধুরী কে?

মোহন।। কল্যাণ চৌধুরীর বড় মেয়ে।

বিধান।। লাইনে নেমে পড়েছে?

মোহন।। না। অবশ্য রটে যাবে সেইরকম। মাধুরী বিউটিশিয়ানের কোর্স করেছে। ফেসিয়াল, হেয়ার ড্রেসিং এইসব। আমার ধারণা, রেবাদের ফ্ল্যাটে ও ওইসব করাতেই গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ পুলিশ-হানা।

বিধান।। বাজে জায়গায় যায় কেন?

মোহন।। বারণ করে দেব। তুমি এখন টেলিফোনটা তোল।

বিধান।। আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

মোহন।। তাহলে আরও একটা বর চাই।

বিধান।। আবার?

মোহন।। তোমার কোনও কাজই সহজ নয়।

বিধান।। সহজ হলে তোমাকে বলব কেন?

মোহন।। কাজটা শুনি।

বিধান।। এক ব্যাটাকে ফাঁসাতে হবে।

মোহন।। ভুঁড়ি।

বিধান।। না, ক্যারেকটার।

মোহন।। হয়ে যাবে।

বিধান।। কী বর চাই?

মোহন।। মাধুরীর বাবার বাইপাস করাতে হবে। তুমি বাজোরিয়াদের কাছ থেকে লাখ দুই ম্যানেজ করে দাও।

বিধান।। হয়ে যাবে।

বিধান মোহনকে বললেন, হ্যান্ডসেটটা নিয়ে এস। রিসিভারের বোতাম টিপছেন। পিঁক পিঁক করে আওয়াজ। মোহন পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে।

।। পাঁচ।।

অনেক রাত, কল্যাণবাবুর বাড়িতে পুরো পরিবার থম মেরে বসে আছে। মোহন বসে আছে একটা টুলে। কল্যাণবাবু খাটে শুয়ে আছেন। কল্যাণবাবু বলছেন—

কল্যাণবাবু।। এ পাড়া তাহলে ছাড়তে হবে মোহন?

মোহন।। কেন?

কল্যাণবাবু।। কলঙ্ক।

মোহন।। ও সেকালের কাঁসার বাসনে পড়ত। একালে সব স্টেনলেস স্টিল।

কল্যাণবাবু।। ব্যাপারটা যে ক্লিন একটা চক্রান্ত সেটা বুঝলে। মাঝখান থেকে মাধুরী হয়ে গেল কলগার্ল।

মোহন।। এই প্রপার্টি নিয়ে খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে মামলাটা কতদিন চলছে?

কল্যাণবাবু।। লাস্ট টেন ইয়ার্স।

মোহন।। কী অবস্থায় আছে?

কল্যাণবাবু।। ওরা নো হোয়্যার হয়ে যাবে।

মোহন।। মাধুরী, তোকে বারান্দা থেকে কে ডেকেছিল?

মাধুরী।। রেবাদি।

মোহন।। তুই রেবার কেচ্ছা শুনিসনি?

মাধুরী।। শুনেছি। বিশ্বাস করিনি। রেবাদির মেয়ে আমার সঙ্গে পড়ত।

মোহন।। রেবার মেয়ে পড়লেই রেবা ধোয়া তুলসীপাতা।

মাধুরী।। আগে কতবারই তো ওদের বাড়ি গেছি।

মোহন।। তখন কী ওর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল?

মাধুরী।। না।

মোহন।। ওর স্বামীকে খুন করেছে। ডেডবডি পাওয়া যায়নি।

মাধুরী।। কোনও কেস হয়নি আজও।

মোহন।। তাতে কী! কানেকশান থাকলে একটা কেন, দশটা মার্ডার করা যায়। মাধুরী, এত সরল হলে এই জটিল যুগে পদে পদে বিপদ। তুই জানিস না, তোদের এক শত্রু আত্মীয় রেবার ব্যবসার পার্টনার। তোর একটুও সন্দেহ হল না, একটা মেয়েমানুষের এত পয়সা হল কী করে? তোকে ডাকার কারণ?

মাধুরী।। বিউটি পারলার খুলবে। খুব ভালভাবেই কথা বলছিল। তোদের এই অবস্থা, একটা ইনকাম না থাকলে কী করে চলবে। তখন যে ভেতরের ঘরে ওইসব হচ্ছিল, কী করে জানব।

মোহন ।। পুলিশ রেড না হলে তোর কী অবস্থা হত বুঝতে পারছিস? আমাদের ও. সি. অত্যন্ত ভাল লোক। মুখ দেখলে মানুষ চিনতে পারেন।

মাধুরী।। আমার কী হবে মোহনদা। কাল সকালে রাস্তায় বেরোব কী করে?

মোহন ।। সেইজন্যেই বসে আছি। ভোব হলেই হাওড়া।

মাধুরী।। হাওড়া কেন?

মোহন ।। হাওড়া থেকে হাওয়া।

মাধুরী।। কোথায়?

মোহন ।। জামশেদপুরে। আমার পিসেমশাই ডাক্তার। নাম-করা।

মাধুরী।। তারপর?

মোহন মাধুরীর কথাটি শেষ হওয়া মাত্রই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত সেই গানের একটি লাইন 'তার আর পর নেই, নেই কোনো ঠিকানা' উদাত্ত গলায় গেয়ে উঠল। মোহন থামা মাত্রই কল্যাণবাবু বললেন—আহা. কী গলা। এ ছেলেটা গান গেয়েই মাৎ করে দিতে পারে। কেন যে করে না! মোহনের ক্লাসিক্যাল আমি শুনেছি আসরে। মনে আছে তোমার?

মোহন ।। সব মনে আছে কাকাবাবু। এত বড় দুঃসাহস, অত বড় বড় ওস্তাদদের সামনে দরবারী কানাড়া গেয়েছিলুম।

কল্যাণবাবু ।। সেই গান আজও আমার কানে। জানো তো মোহন, এ বাড়িতেও গান-বাজনার যথেষ্ট চর্চা ছিল। আবদুল করিম, ফয়েজ খান, মহিষাদল রাজ এস্টেটের পুলিনবিহারী। বেহাগে সিদ্ধ ছিলেন, আসরে আমাদেব বাস্তুসাপ ঢুকে পড়েছিল। গল্পকথা নয়. চোখে দেখা, তখন আমি টেন ক্লাসের ছাত্তর। তারপর, ভাগ্য আর কপাল। জীবনটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারলুম না। লাগামছাড়া ঘোড়া। যতবার চেপে বসি, ছিট্‌কে ফেলে দেয়।

মোহন ।। একটা ব্যবসা তো করেছিলেন। কিসের ব্যবসা? ম্যানুফ্যাকচারিং?

কল্যাণবাবু ।। না সেলিং।

মোহন ।। কী সেল করতেন?

কল্যাণবাবু ।। পেটারনাল প্রপারটি। বিষয়-সম্পত্তি, স্থাবর, অস্থাবর সব বেচে বেচে বছর কুড়ি খুব লপচপানি। তারপর একে একে নিবিল দেউটি। দিনগুলি মোর রইল না, সোনার খাঁচায় রইল না, নানা রঙের দিনগুলি। দারিদ্র্য, নোনা-ধরা দেয়াল. ঝুরঝুর বালি। একটা শাস্ত্রবাক্য শোনো মোহনলাল.

বরং বনং ব্যাঘ্রগজেন্দ্রসেবিতং
দ্রুমালয়ঃ পত্রফলাম্বুভোজনম্।

তৃণানি শয্যা বসনঞ্চ বল্কলং
ন বন্ধুমধ্যে ধনহীন জীবনম্।।

গৃহত্যাগ করে বনে গিয়ে বাঘ হাতির সঙ্গে বাস করা ভাল। পাতা, ফল, জল খাও। ঘাসের বিছানা। পরনে বল্কল। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে ধনহীন-দরিদ্র মানুষের জীবন অপমান আর অবহেলায় অসহ্য, দুর্বিষহ। যাও, হাই উঠছে সব। দুটো বাজল, শুয়ে পড়। আবার কাল। লড়াই, লড়াই, এ লড়াই মরার লড়াই, লড়াই করে মরতে হবে।

।। ছয় ।।

কল্যাণবাবুদের বাড়ির বারান্দায় একটা বেতের আরাম চেয়ারে টান টান হয়ে শুয়ে আছে মোহন। বাইরে ল্যাম্পপোস্টের আলোর একটা ঝলক এসে পড়ছে মোহনের মুখে। ঘরে ঢুকল মাধুরী। মোহনকে ওইভাবে শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, একটা কিছু পেতে দি না মোহনদা। তোশক, মশারি সব আছে।

মোহন।। অকারণে কাজ বাড়িয়ো না। আমি কোথায় কোথায় শুয়ে ঘুম পাকিয়েছি জানিস—ইস্টিশানের বিছানায। সেটা কী? কাঠের বেঞ্চি। মাঠের ঘাস, বাড়ির খড়ের চাল, পার্কের পাঁচিল, কলকাতার ফুটপাথ, গঙ্গার ঘাট, নৌকোর পাটাতন, গাছের মগডাল, শ্মশানের বটতলা, ভাঙা মন্দিরের দালান, চলন্ত ট্রাক, হাসপাতালের খাট, ঝুপড়ির খাটিয়া।

মাধুরী।। আজ না হয় বিছানা।

মোহন।। কেন অমন করছিস মাধু। খাতির আমার অসহ্য লাগে। পথেই জীবন পথেই মরণ আমাদের। ফুটে যা তো। একা একটু ঝিমোতে দে।

মোহন শরীরটাকে আরো একটু এলিয়ে দিল। ঘুমিয়ে পড়েছে মোহন। দূর থেকে ভেসে আসছে হরিধ্বনি। ঘোলাটে অতীত স্বপ্ন হয়ে আসছে। গানের আসর, অজস্র শ্রোতা, মোহন দরবারী কানাড়ায় আলাপ করছে। ভোরের ঘোলাটে অন্ধকার, হাততালির শব্দ। একটা ঝাড়লণ্ঠন ঝপ্ করে নিভে গেল। পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে নীল ধোঁয়া। বেতের চেয়ারে আধশোয়া মোহন হাততালির শব্দে সোজা হয়ে বসল। স্বপ্নের অতীত বর্তমানে এসে মিলিয়ে গেল। মোহন আপন মনেই হা-হা করে হাসছে। মোহনের হাসির শব্দে মাধুরী ছুটে এসেছে।

মাধুরী।। কী হল? হা-হা করে কংসের মতো হাসছো? এখনও ভাল করে ভোরই হল না।

মোহন।। হাসব না কেন! আমার অতীত যদি স্বপ্ন হয়ে আসে তাহলে আমার বর্তমান কেন হাসবে না।

মাধুরী।। এইটুকু সময়ের মধ্যে কী স্বপ্ন আবার দেখলে?

মোহন।। দেখলুম, বিরাট এক আসর। অজস্র শ্রোতা আর ওস্তাদ, আমি মঞ্চে

বসে দরবারি কানাড়ায় গান গাইছি। গান শেষ হতেই হাততালি আর হাততালি। আর বড়ে গোলাম আলি আমাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খাচ্ছেন আর বলছেন, কেয়াবাত, কেয়াবাত।

মাধুরী।। একদিন তো তাই হয়েছিল।

মোহন ।। একদিন, একদিন, বহুদিন, দিনের পর দিন চলে গেল। পড়ে রইল, মোহন দি অ্যান্টিসোশ্যাল। কথা শেষ করেই মোহন উঠে দাঁড়িয়ে, শরীরের দু'পাশে হাত দুটো টান টান করে ছড়িয়ে দিল।

মাধুরী।। শোন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি যে বললে, জামশেদপুরে পালাবে, আমাকে তোমার পিসিমার কাছে রেখে আসবে। আমি বলছি, পালাব কেন, কেন পালাব?

অবাক বিস্ময়ে মাধুরীর দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল মোহন। কথা শেষ হওয়া মাত্রই মোহন উত্তেজনায় মাধুরীর দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি মেরে বলল— আমি তো সেই কথাই বলতে চাইছি। মাধুরী, পালাবি কেন? রুখে দাঁড়া, দেখ, লেখাপড়া আমি তেমন করিনি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই লাইনটা আমার বেঁচে থাকার মন্ত্র—

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

মোহন আর মাধুরী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎই মাধুরী বলল, পালাতেই যদি হয় তবে একজনের সঙ্গেই পালাব।

মোহন ।। মানে, এ আবার কী কথা? সে কে?

মাধুরী মোহনের ডান গালে তর্জনী দিয়ে টোকা মারতে মারতে বলল, তুমি, তুমি, তুমি।

ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে কর্পোরেশনের সাইলেন্সার কাটা ময়লার গাড়ি বিকট শব্দ করতে করতে চলে গেল। দূরে একজন লোক বাজখাঁই গলায় ব্রঙ্কাইটিসের কাশি কাশতে কাশতে নিজেকেই গালাগাল দিচ্ছে—শালার কাশি লাংস দুটো ফেঁড়ে ফেঁড়ে ফেলে দেবে। এই ভদ্রলোকের পত্নীকে কাশি বানিয়ে ছেড়ে দিলে। কাশি আর যেতে হবে না।

মোহন ।। নাও, ভোর হতে না হতেই শুরু হল গদাইদার কপচানি। জানিস মাধুরী, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন এই পাড়ায় ভোরবেলায় সংকীর্তনের দল বেরোত। গাইতে গাইতে যেত—

আর ঘুমায়ো না মন, মায়াঘোরে।
কতদিন আর রবে অচেতন।

তা তুই এ-কথাটা কী বললি?

মাধুরী।। কোন্ কথাটা?

মোহন ।। আমার সঙ্গে পালাবি? আমার মতো একটা র‍্যাজাটে ছেলে যার কোনও চালচুলো নেই।

মাধুরী।। ষাঁড়ের মতো চেল্লাচ্ছ কেন? এ তো তোমার সঙ্গে আমার কথা। পলিটিক্যাল বক্তৃতা দিতে দিতে তুমি সবকিছুই বল বক্তৃতার ঢঙে। তা মহাদেবের কী ছিল? দালানকোঠা ছেড়ে দিয়ে শ্মশানে বৈঠকখানা। পার্বতী সেই মহাদেবকে পাবার জন্যই তপস্যা করেছিলেন।

মোহন ।। ওইসব সাহিত্যমার্কা ন্যাকান্যাকা কথা বলিসনি তো। লায়লা-মজনু, হীর-রণঝা, শাহজাহান-তাজমহল এসব ইলেকট্রিকের আলো আর স্যাটেলাইটের যুগের আগের ঘটনা। এ যুগ হল কম্পিউটার, এ যুগ হল কেরিয়ারের। এ যুগ হল P_3-র।

মাধুরী।। P_3?

মোহন ।। কিছুই জানিস না। ধেড়ে হয়ে বসে আছিস। শোন তিনটে পি হল, পপুলেশন, পলিউশন, পলিটিক্স।

মাধুরী।। তোমাকে ভালবাসি। পরিষ্কার সোজা কথা তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমার চোখে দেখেছি আমি আমার সর্বনাশের ইশারা।

মোহন ।। শোন, সভ্য মানুষের জীবনে একটা ইংরেজি আছে, সেটাকে বলে গুড মর্নিং। সেটা কী জানিস?

মাধুরী।। কী?

মোহন ।। ভাঙা কাপে, কালচে রঙের তিনটে পিঁপড়ে ভাসা এককাপ তেতো চা। সেটার আশা কী আছে? না, আশার আশা ভবের আশা, আশা মাত্র হল সার। কাল সারারাত তোদের বারান্দার ব্লাডব্যাঙ্কে তা প্রায় আধবোতল রক্ত দিয়েছি, এখন একটু পুষ্টিকর চা না হলে এই চাতাল যে ভোরের কা-কা-র বদলে চা চা করবে।

অস্পষ্ট একটা কোলাহলের শব্দ দূর থেকে ভেসে এল। মোহন কান খাড়া করে বললে,

— সাতসকালে কি আবার হল!

মাধুরী।। যাই হোক, তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

মোহন ।। তুই কি আমাকে রিফর্ম করতে চাস! ফুল ফুটলে ভ্রমর ছুটবেই।

মাধুরী।। আর আমি যদি শ্যামল মিত্রের সেই বিখ্যাত গান গেয়ে বলি, ফুলের বনে মধু নিতে অনেক কাঁটার জ্বালা। ভ্রমরা যাসনে সেখানে।

মোহন ।। সে হল তোর বাংলা ফুল। আমি হলুম, ইংরিজি Fool। আমার মাস্টারমশাই বলতেন—Fools tread where angels dare to step in. যেতে আমাকে হবেই। গোলমালটা আসছে খেলার মাঠের দিক থেকে।

।। সাত ।।

খেলার মাঠে গোলপোস্টের পেছন দিকে কৌতূহলী এক দল মানুষের জটলা। মোহন দ্রুত এগিয়ে গেল সেইদিকে। মোহন দূর থেকেই জিজ্ঞেস করছে—কী হয়েছে রে, কী হয়েছে?

মোহন এ পাড়ার অভিভাবক। সকলেই আশ্বস্ত হল। নেতা এসে গেছে। আর ভয় নেই। ভিড়ের মধ্যে থেকেই একটি ছেলে বললে, এই দ্যাখো মোহনদা, একটা লাশ পড়ে আছে।

গোলপোস্টের পেছনদিকে ঝোপঝাড় আগাছার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে এক জোড়া পা। এক পায়ে জুতো, আর এক পা খালি। দেহের ঊর্ধ্বভাগ ঝোপের অন্তরালে। যে পারছে সেই একবার করে উঁকি মারছে। ঠোঁটে ঠোঁটে প্রশ্ন ফিরছে—লোকটা কে? মোহন ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। এগোতে এগোতে বলছে, এতে এত হইচই করার কি আছে! মানুষ তো আজকাল কুকুরেরও অধম। মরে গেলেই হল। লাশটা কার?

কে একজন বললে, দেখে মনে হচ্ছে সমীরদার।

—সমীর! কোন সমীর? এ পাড়ায় সাতটা সমীর আছে।

—আরে, শেয়ারের দালাল সমীর। তুমি তো চেন।

মোহনের গলায় বিস্ময়— সমীর সরকার! যাঃ, ওকে ঝেড়ে দিলে! আমি জানতুম ও হড়কাবে। ধর্মের কল বাতাসেই নড়বে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এল পুলিশের ধধ্ধড়ে জিপ। জিপটাকে আসতে দেখেই ভিড় হাওয়া। গোলপোস্টের সামনে গোলকিপারের মত একা দাঁড়িয়ে মোহন। পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বেজারমুখো দু'জন সেপাই। পুলিশেব বড়বাবু আসতে আসতে দূর থেকেই বলছেন,

—কি হে মোহনলাল, আবার একটা নামিয়েছ?

—স্যার! এতকাল ক্রিমিন্যালদের চরিয়ে এ-কথা বললেন কী করে! খুনী কখনো খুনের জায়গায় থাকে? আর বডিটা দেখলেই মালুম হবে, কাঁচা হাতের কাজ।

—খুনী খুনের জায়গায় থাকে না ঠিকই, তবে আমাদের শাস্ত্র কি বলে জানো—খুনী খুনের জায়গায় ফিরে আসবেই।

—জানি স্যার। তবে এত তাড়াতাড়ি নয়।

অফিসার সিপাইদের হুকুম দিলেন, সাবধানে ডেডবডি স্পর্শ না করে ঝোপটাকে একটু পরিষ্কার করতে। সিপাই দু'জন সাবধানে কচুঘেঁচুর ঝোপ সরিয়ে মৃতদেহটাকে দৃশ্যমান করল। অফিসার মোহনকে প্রশ্ন করলেন,

—চেন?

—চিনি স্যার! সমীর সরকার। লোকে বলে, সমীর শেয়ার।

অফিসার।। এই আর এক উপসর্গ ঢুকেছে শেয়ার। কিছুদিন হল, চিটফান্ড। এখন রসখ্যাপা বাঙালিকে ধরেছে শেয়ারে। শেয়ারের ট্যাক্সি, শেয়ারের অটো, বাকি রয়েছে শেয়ারে বিয়ে করাটা।

মোহন।। বিয়ে জিনিসটা উঠে যাবে স্যার। এখন এসে গেছে লিভ টুগেদার, ধরো আর ছাড়ো আবার ছাড়ো আর ধরো। (চিৎকার করে) জাগো বাঙালি। ডলার ছাড়াই আমেরিকান। খালি পেটে বুলি ঝেড়ে আর বুলি শুনে স্বাধীনতার ফিফটি ইয়ারস। আমি তাহলে আসি স্যার।

অফিসার।। আসবে মানে?

মোহন।। মানে আমি যাই।

অফিসার।। তুমি তো আমার সঙ্গে যাবে। হাতের কাছে এমন একটা জিনিস থাকতে খুনীকে আমি কোথায় খুঁজে বেড়াব? লাশ আর কিলার একসঙ্গেই পাঠিয়ে দেব।

মোহন।। আগে সনাক্ত করুন, তারপর তো ধরবেন। নাহলে তো এদিক দিয়ে ঢুকে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাব।

অফিসার।। কাজের সময় ইয়ার্কি নয়। আবার তোমাকে দেখলেই দুটো রসের কথা বলতে ইচ্ছা করে। জান তো পুলিশের সব থেকে বড় বন্ধু হচ্ছে ক্রিমিন্যাল। কেসটা কী বল তো?

মোহন।। কেসটা বললে—আমার খুব একজন স্নেহভাজন ফেঁসে যাবে। সেটা আমি চাই না স্যার।

অফিসার।। এই তো বলেই বিপদ করলে। তুমি যখন জান তখন না বললে আমাদের বলানোর মেথড তো তোমার জানাই আছে মোহন।

মোহন।। এই আপনাদের দোষ স্যার। থেকে থেকে পালটে যান। পুলিশ কী কখনই মানুষ হবে না।

অফিসার।। ব্যাপারটা রেসিপ্রোকাল। তোমরা মানুষ হলে পুলিশও মানুষ হয়ে যাবে।

অফিসার মোহনের কাঁধে হাত রাখলেন। অন্তরঙ্গতা দেখলে মনে হবে যেন কতকালের বন্ধু দু'জন প্রাণের কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন। এই সময় আর একটা জিপ, বেশ ঝক্‌ঝকে, রাশভারী, ঝাঁ করে ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়াল। দু'জন অফিসার নামলেন। গট্‌গট্‌ করে এগিয়ে গেলেন ঘটনাস্থলের দিকে। ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ। এইবার মাপজোকের ফিতে বেরোবে। লেন্‌স, ক্যামেরা। ছাপ তোলা হবে। আরো কত কী! আপাতত স্থানীয় থানার আর কিছু করার নেই।

।। আট ।।

নিত্যানন্দের ফ্ল্যাটে নিত্যানন্দ, মালিনী, পূর্ণা। চিন্তিত মুখ। রাতে ঘুম নেই কারো চোখে। মোহন বসে আছে একটা মোড়ায়। হাঁটুর ওপর হাত দুটো টানটান। মোহনের বসার ধরনটা যোগীর মতো। কখনও সামনে ঝোঁকে না। মুখ তুলে মোহন প্রশ্ন করল,

—খোকা কোথায়?

নিত্যানন্দ।। কাল থেকে সেই যে হাওয়া হয়ে গেছে, কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

মোহন।। আপনাদের মতো ইডিয়েট...। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে...। প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা হয়ে গেল, ছেলেটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। থানায় একটা ডায়েরি করতে পারতেন তো!

মালিনী ।। না, আমরা ভাবছিলুম, দেখি না, ফিরে আসে কি না!

মোহন একটা আক্ষেপের শব্দ করে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে,

—এ কী বেড়াল যে ফিরে আসবে! মানুষের ছানা! আপনাদের মতো ক্যাবলাদের সংসার করাটাই উচিত হয়নি। এখন কী হবে।

পূর্ণা প্রশ্ন করে উদ্বেগটা আরো বাড়িয়ে দিল—এখন কী হবে মোহনদা!

মোহন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কেস খুব সিরিয়াস। সমীরের কাছ থেকে খোকা শেয়ার কিনেছিল, সেই শেয়ার জাল। ট্রান্সফার করাতে গিয়ে ধরা পড়ল জাল সই। খোকার লাখ দুই টাকা চোট। সমীরের ডেডবডি গোলপোস্টের পেছনে। একটু পরেই পুলিশ কুকুর আনবে। সেই কুকুর যদি শুঁকতে শুঁকতে এই বাড়িতে আসে তাহলে কী হবে?

পূর্ণা ।। এই বাড়িতে আসবে কেন?

মোহন ।। মাথামোটা! এই খুনের পেছনে খোকা যদি থাকে কিছু অন্যায় হবে।

পূর্ণা ।। দাদা থাকবে কেন?

মোহন।। এই কারণে থাকবে, দাদার টাকা চৌপাট হয়ে গেছে। টাকার শোক তো ভোলা যায় না। সেই শোকে খোকা যদি ঝেড়ে দিয়ে থাকে!

পূর্ণা।। দাদা খুনের এবিসি জানে না। ওরকম নরম মনের মানুষ জলজ্যান্ত একটা মানুষকে মেরে ফেলবে?

মোহন।। বাবা, টাকা কী বস্তু জান না! টাকার জন্য বাপ ছেলেকে, ছেলে বাপকে খুন করতে পারে। এটা স্বর্গ নয়, নরক পৃথিবী। এই সত্যটি ভুলো না কখনও।

নিত্যানন্দ।। আমার প্যালপিটেশান হচ্ছে।

মোহন।। হলেও কিছু করার নেই। শোন্ পূর্ণা, তোর দাদা খুন না করলেও আর একজন কেউ খুন করে তোর দাদার ঘাড়ে দায়টা চাপিয়ে দিতে পারে।

প্রফেশনাল খুনীরা অনেক আটঘাট বেঁধে কাজ করে। পুলিশ যখন জাল ফেলবে তখন সেই জালে রুই, কাতলা, চুনোপুঁটি সব উঠবে। খুন না করলেও হ্যারাসমেন্টটা যাবে কোথায়!

মোহন উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে—যে ভাবেই হোক খোকাকে খুঁজে বের করতেই হবে। পূর্ণা, তুই বাবার জিভের তলায় একটা সরবিট্রেট দিয়ে দে।

মোহন একটা গানের দুটো কলি গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল,

এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয় সব সত্যি।
ঘুরিয়ে এই দুনিয়ার লাট্টু, ভগবান,
তুমি হারিয়েছো লেত্তি।

।। নয় ।।

গুপীর চায়ের দোকানে জোর গুলতানি। পাড়ার সব বিশেষজ্ঞের জমায়েত! যত না চা উড়ছে, তার চেয়ে বেশি ছুটছে কথা। আলাদা করে বক্তাদের চেনার চেষ্টা না করাই ভাল। স্বরক্ষেপের দিকে কান রাখা যাক :

।। কণ্ঠস্বর ।।

১। এর পেছনে রাজপরিবারের হাত আছে। ডেফিনিট।

২। ধুস্, চার্লস একেবারে ভেঙে পড়েছে। ফ্র্যাকচারড। দশ বছর বয়েস বেড়ে গেছে এক ঝটকায়। বউকে ভালবাসত। যে যাই বল, প্রেম মরে না। ও হল বটের শেকড়।

৩। ভাই, এই তো জীবন, হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়/কার যে কখন সন্ধে হয়। এই তো সমীর! কী লপচপানি। চলে গেল লাশকাটা ঘরে। কাল সেলাই-ফোঁড়াই হয়ে শ্মশানে, দেড় কেজি ছাই!

৪। আমি দেখছি, অনেকেরই পয়সা সহ্য হয় না। ডায়ানা, ডোডি কম বড়লোক। হীরের আংটিটার দাম এক লাখ বিশ হাজার পাউন্ড।

৫। শেয়ার সমীর জাস্ট তিন দিন আগে গাড়ি কিনেছে। লে হালুয়া।

৬। কার কাজ বল তো, অমাবস্যার রাতে ঝড়াকসে নামিয়ে দিল মাইরি!

৭। ওই ডায়ানার মার্সিডিজ। ফাস্ট দৌড়লেই ক্র্যাশ। সমীর ফাস্ট রান করছিল। পাঁচ বছর আগেও গুপীদার ধারের খদ্দের। পাঁচ বছর পরে তাজে ডিনার।

৮। বাঙালির এই এক রোগ। কেউ মরলেই হল, অমনি ফিলজফি। আরে বাবা বাঁচতে এসেছিস, যে ভাবেই হোক বেঁচে থেকে একদিন ফুটে যা। ইলিশ খা, ঢেঁড়স খা, রোল খা, মোগলাই খা, প্রেম কর, ঝগড়া কর, ভাব কর।

৯। লাও, শুরু হল ভাদ্দরের পচা তাল, ভড়ড় ভড়ড়।

এই কথার গজর বজরে মোহন দমকা বাতাসের মতো দোকানে ঢুকল। ঢোকা মাত্রই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সোফিয়ার ঝাঁঝ। চায়ে চিনি গুলছিল। চাপা গলায় মোহনকে বললে, —কবে তুমি ভদ্দরলোক হবে?

—ভদ্দরলোক তো হয়েই আছি।

—যার কথার ঠিক নেই সে আবার ভদ্দরলোক।

—এই লাও, কিছুই জান না, সাঁই করে একটা কথা বলে বসলে। ভদ্দরলোকের লক্ষণই হল, তার কথার ঠিক থাকবে না। বলবে এক, করবে আর এক। এত ভদ্দরলোক চারপাশে থই থই করছে। দেখলেই তো শেখা যায়। লোনা না হলে সমুদ্রের জল হয়! ঝাল না হলে লঙ্কা হয়!

—এটা দেখি কথার ঝুড়ি।

—ওটাও তোমার ভদ্দরলোকের লক্ষণ।

—যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলব না, অসভ্য! তোমার জন্যে কাল রাতে আমার খাওয়াই হল না। কত কী রাঁধলুম।

—রাগ করে না। অবশ্য রাগলে তোমাকে আরো সুন্দর দেখায়।

—থাক থাক, খুব হয়েছে। আমি চাউলী, চাউলীই থাকব।

—আমি বেওয়ারিশ মাল বেওয়ারিশই থাকব। মরলে মুখে কেউ জলও দেবে না, শ্রাদ্ধও করবে না।

হঠাৎ সোফিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলে—খোকনকে দেখেছ? কাল থেকে একবারও?

সোফিয়া বললে—না তো!

মোহন নিজের মনেই বলে উঠল—আশ্চর্য! ছেলেটা ভ্যানিশ হয়ে গেল!

সোফিয়া বললে, তাতে তোমার কী?

—এই দেখ, ভদ্দরলোকের মতো কথা বললে। আমি ভদ্দরলোক হলে আমার কিছুই হত না। ছোটলোক হয়েই বিপদে পড়েছি। ছেলেটার খুব বিপদ। যেভাবেই হোক, ওকে বাঁচাতে হবে।

—ওর আবার কী হল, ম্যালেরিয়া, না জন্ডিস!

—দুটোই। এক গেলাস কড়া ছাড়।

—রাতে কিছু জুটেছিল?

—না।

—সেই কাল দুপুরে খেয়েছিলে, এখন বেলা এগারোটা। আমি যদি তোমার কেউ হতুম, তাহলে তোমার মতো ছেলেকে কী ভাবে টাইট দিতে হয় দেখিয়ে দিতুম।

—তুমি যে আমার কে তুমি না জানলেও আমি জানি। কিন্তু সেই জানাটা তোমার অজানাই থেকে যাবে।

মোহন সোফিয়াকে ছেড়ে দোকানের ভেতর গুলতানিতে বেঞ্চের একপাশে বসল। মোহনকে দেখে সবাই সমস্বরে বলে উঠল—গুরু অনেকদিন বাদে মিইয়ে যাওয়া পাড়াটা আবার তেতে উঠল।

সোফিয়া মোহনের হাতে চায়ের গেলাসটা ধরাচ্ছে, মোহন সকলকে শুনিয়ে সোফিয়াকে বললে,

—সোফিয়া শুনলে, এরাই হল ভদ্রলোক। কারোর সর্বনাশ কারোর পোষ মাস।

দোকানের বয় কিশোর। বাইরে বসে কাপডিশ ধুচ্ছিল। হঠাৎ তিন লাফে দোকানে—

—পুলিশ কুকুর ছেড়েছে, শুঁকতে শুঁকতে এইদিকেই আসছে।

দোকানে যারা বসেছিল, পেছনের দরজা দিয়ে নিমেষে সব হাওয়া। ওদিকে আবর্জনা ভরা একফালি পোড়ো জমি। অন্য সময় হলে যেত না। মোহন একটা পা বেঞ্চের ওপর ছড়াতে ছড়াতে বললে,

—যাঃ, সব ব্যাটা হাওয়া!

।। দশ ।।

কলকাতার লাল আলোর এলাকার একটি কুঠি। তার তিনতলার চিলেকোঠার ঘরে খোকন বসে আছে খাটে। এক গাল দাড়ি। বিধ্বস্ত চেহারা। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে একটি মেয়ে পিঠ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা ঘন কালো চুলে চিরুনি চালাচ্ছে। অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছে, যেন ঝাউয়ের পাতায় বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। মেয়েটি সুন্দরী। দেহের খাঁজে খাঁজে, ভাঁজে ভাঁজে পাগল করা আকর্ষণ। মেয়েটির সঠিক নাম হারিয়ে গেছে। এ পাড়ায় তার নাম ডলি। খোকন আয়নার প্রতিচ্ছবির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। খোকনের জ্বর হয়েছে। ডলি আয়নায় খোকনের মুখ দেখতে পাচ্ছে। ডলি বলছে,

—তোমাকে দূর করে দিইনি এই তোমার বাপের ভাগ্যি। কবে কোন জন্মে চুটকি মারতে এসেছিলে সেই অধিকারে ঠাঠা দুপুরে ফুর্তি করতে চলে এলে। দেখে তো মনে হচ্ছে ভদ্দর ঘরের ছেলে। একেবারে নাদান। মুখটা দেখে মায়াই হচ্ছে। রাতের বাবুরা সকাল হলেই আমাদের মেয়েমানুষ বলে। তা বলুক—আসলে তো আমরা মায়ের জাত। শয়তানরা টেনে বের করে এনে মাকে মাগি বানায়। গর্ভে ছেলে এলে বাংলায় বলবে জারজ, ইংরেজিতে বাস্টার্ড, হিন্দিতে বলবে হারামি। বউয়ের পেটের ছেলে—সন্তান, আমার পেটে সেই একই বাপের ছেলে—হারামি! কী বিচার মাইরি তোমাদের!

ডলি আয়নার সামনে থেকে উঠে এসে বেশ আয়েস করে খোকনের পাশে বিছানায় আধশোয়া হল। কথা শেষ হয়নি। খোকনের উরুতে হাত রেখে বললে—দেখে মনে হচ্ছে, কিছু একটা বাধিয়ে এসেছ। খুনখারাপি করার সাহস

তোমার হবে না, তবে এমন একটা কিছু দেখে ফেলেছ যাতে তুমি নিজেই খুন হয়ে যাবে।

—কী করে বুঝলে বল তো! খোকন অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। ডলির শিক্ষিত হাত যেখানে সেখানে ভ্রমণ করছে। খোকনের সারা শরীর শিরশির করছে।

ডলি বললে—এই বয়েসেই হাজার খানেক লোক চরিয়েছি। মানুষের ভেতরটা দেখতে পাই। এখানে এসেছ কেন?

খোকন অসহায়ের মতো বললে—জানি না, কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে এল। সেই কবে একবার দুর্গাপুজোর রাতে তোমার কাছে এসেছিলুম। সিদ্ধির ঘোরে মনে হয়েছিল, তুমিই মা দুর্গা। কিছু করতে পারিনি বলে আমাকে ক্যাঁত ক্যাঁত করে লাথি মেরেছিলে।

—খুব তেল মারতে পার মাইরি! কী মতলবে এসেছ বলো তো। ঘাপটি মেরে থাকবে কিছু দিন। এই একটা জায়গা। আমরা যেন পাপের আড়তদার! আমার রেট জানো। পকেটে কত টাকা আছে গুরু?

—একটা টাকাও নেই।

—ওরে আমার ফোতো কাপতেন রে। এসব জায়গায় আসতে গেলে ট্যাঁকের জোর থাকা চাই।

—তাহলে আমি চলেই যাই।

খোকন উঠে দরজার দিকে এগোচ্ছে। বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদের কলকাতা। ডলি খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মজা দেখছে। ভীরু একটা ছেলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলে যাচ্ছে। কোথায় কী করে এসেছে কে জানে। ডলি বললে, এই যে দাঁড়াও, তোমাদের তো আবার নাম থাকে না, আমাদেরও অবশ্য থাকে না। এটা নামহীনদের পাড়া।

খোকন ছাতে বেরিয়ে এসেছিল। দাঁড়াও—আদেশ শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছে স্ট্যাচুর মতো! ডলি খোকনের সামনে মুখোমুখি। ঝাঁঝালো গলায় বললে—যেতে বলতেই সুড়সুড় করে চলে যাচ্ছ যে! আগের জন্মে ট্রেনিং নেওয়া বিলিতি কুকুর ছিলে বুঝি।

খোকন কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মেয়েটির মুখের দিকে।

ডলি আঙুল উঁচিয়ে কড়া গলায় বললে—ভেতরে চলো। ক'দিন খাওনি। মুখটা তো শুকনো আমের মতো হয়ে গেছে।

খোকন ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকল আবার। মেয়েটা পাকা মাছুড়ের মতো খোকনকে খেলাচ্ছে! কতই বা বয়েস! খোকনের বয়সিই হবে। খোকনের মায়ের কথা, বোনের কথা মনে পড়ছে। তুলনা আসছে। এও মেয়ে তারাও মেয়ে। কত তফাৎ। ডলি কোলে একটা তাকিয়া নিয়ে খাটের ওপর বাবু হয়ে বসল। খোকন ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো সামনে দাঁড়িয়ে। কি করবে বুঝতে পারছে না।

ডলি পান চিবোতে চিবোতে বললে—সঙের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এস। দরজাটা বন্ধ করতেই ঘরের ঝনঝনে আলো বেশ নরম হল। খোকন দাঁড়িয়ে আছে খাড়া।

ডলি মুচকি হেসে বললে—এইবার কি হবে বলো তো!

—কি হবে?

—পয়সাকড়ি নেই তো?

—না। গোটা কুড়ি টাকা আছে।

—ওতে কি হবে! আমি রাত বিক্রি করি, দু'হাজার তিন হাজারে। দিন বিক্রি করি ঘণ্টা-মিটারে। পাঁচশো, হাজার। আমি এখন শোবো, তুমি আমার পা টিপবে। বিলিতি সাবান মেখে চান করেছি। চুলে করেছি এলো খোঁপা। পেটে পড়েছে বিরিয়ানি, চাঁপ। মুখে ঠুসেছি জর্দা পান। আর সামনে দাঁড়িয়ে আছ তুমি উপোসী। তোমার কেসটা এবার শোনা যাক। বেশ মজা লাগছে। তোমার সেই হরিদাসের গুপ্ত কথা। নিশ্চয় একটা মেয়ে আছে। একটা ছেলে একটা মেয়ে—পৃথিবীর যত গল্পের শুরু।

ডলি সুর পালটে এক ধমক লাগাল—চাকরের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে বসতে পারছ না। মেড়া কোথাকার।

খোকন বসতে গিয়ে খাট আর নিজের পেছনের দূরত্ব অনুমান করতে না পেরে মেঝেতে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিল। ডলি খিল খিল করে হাসতে হাসতে বললে— ভয় পেয়ে মানুষ কী রকম ভেড়া হয়ে যায় মাইরি।

কথা শেষ করেই ডলি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। পা দুটো তুলে দিল খোকনের কোলে—পা দুটো আগে দেখ। এর নাম শ্রীচরণ। কেষ্টঠাকুর শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ সেবার পর শ্রীফল পেতেন। এই রকম পা দেখেছ? কী, এইতেই মরে গেলে, গলা শুকিয়ে কাঠ। এখনো যে অনেক বাকি মিঞা। কুঞ্জকানন অনেক দূর। আমার মুখের পান চিবনো খাবে? বেশ রসেছে। বহুত প্রেম। ঠোঁট দুটো আমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসো। পান খাও, পান করো। কত সুধা পৃথিবীতে। বোতল সুধা, অধর সুধা, দেহ সুধা। কত সুধা!

খোকন অবাক হয়ে পা দুটো দেখছে। মানবীর পা এত সুন্দর হয়! হাঁটু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বস্ত্রের অন্তরালে আরো বিস্ময়। হিসেব করে, শাস্ত্র মেনে বাঁচতে গেলে জীবনের কিছুই দর্শন হয় না। সব বিসর্জন দিলে তবেই অর্জন হয়।

।। এগারো ।।

ফুটবল খেলার মাঠ। মাঝমাঠে বল। দু'দিকে দুই স্কুল টিম। সবই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। হাত-পা নাড়ছে। গজর গজর কথা হচ্ছে। দুজন প্রবীণ মানুষ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে। কোনো একটা সমস্যা। যার সমাধান এই দু'জন প্রবীণ মানুষের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। এমন সময় দেখা গেল, মোটর সাইকেলে চেপে মোহন

আসছে। সাদা শার্ট, সাদা ট্রাউজারে একেবারে টিপটপ।

দুই প্রবীণ একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন—মোহন, মোহন!

মোটর বাইক কান্নিক মেরে রাস্তার বাঁ পাশে মাঠের ধারে চলে এল। মোহনের একটা পা মাটিতে। বাইকের চাপা গর্জন। মোহন গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল—কী হল স্যার!

প্রবীণদের একজন বললেন—একবার এস না বাবা!

মোহন বাইকটাকে রাস্তার পাশে রেখে এক লাফে মাঠে পড়ে ছুটতে ছুটতে দূর থেকে বললে—শরীরটা এখনও ফিট আছে, বলুন স্যার?

মোহনের পায়ের কাছেই ফুটবল। সটান লাথি মারার লোভনীয় একটা জিনিস। মাঠের ঘাসে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মোহনের শৈশব ফিরে আসছিল। বলটা দেখার পর সেই অনুভূতি আরো তীব্র হল। ধাঁই করে এক শট। বলটা উড়ে গেল গোলের দিকে। সেখানে কেউ নেই, অথচ অদৃশ্য কোনো গোলকিপার বলটাকে যেন পাঞ্চ করে ফিরিয়ে দিল।

মোহনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—যাস শালা।

সঙ্গে সঙ্গে বললে—সরি স্যার। তাজ্জব ব্যাপাব।

মাস্টারমশাইদের একজন বললেন—সেইজন্যেই তোমাকে ডেকেছি বাবা। তখন থেকে এইরকমই হচ্ছে। কী ব্যাপার বলো তো!

মোহন বললে—আজকে খেলাটা বন্ধ রাখলেই পারতেন। সকালে এত বড় একটা কেলোর কীর্তি হয়ে গেল।

—কী করব! আমাদের টুর্নামেন্ট চলছে যে!

রেফারি কিছুক্ষণ চিন্তা করে রায় দিলেন—খেলা আজ বন্ধ থাক স্যার। যে কোনো কারণেই হোক, মাঠের আবহাওয়া আজ ভাল নয়। মনে হয়, হাওয়ার জন্যেই আজ এইরকম হচ্ছে। বল ঠেলে বের করে দিচ্ছে।

শিক্ষকমশাই বললেন—কী যে বলো! হাওয়াই নেই তো হাওয়া! গাছের একটা পাতাও কি নড়ছে!

রেফারি বললেন—এ হাওয়া সে হাওয়া নয়। এই যে বলে, আবহাওয়া বার্তা, তাতে হাওয়া আছে?

—ঝোড়ো হাওয়া আছে।

—যে হাওয়ায় গাছের পাতা নড়ে সে হাওয়া আছে কী? নেই। সে হাওয়ায় আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়াও নেই।

কিছুক্ষণ ভ্যাজোর ভ্যাজোর করে মাঠ ফাঁকা করে সবাই চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইল একা মোহন। মোহন গোলপোস্টের দিকে এগিয়ে গেল আবার। প্রশ্নটা থেকেই গেল। ঘটনাটা লৌকিক না অলৌকিক! বিজ্ঞানের যুগে ভূতের অস্তিত্ব কেউ বিশ্বাস করবে! গোল-পোস্ট। পেছনে ঝোপঝাড়। ঝোপঝাড় সামান্য

বিধ্বস্ত। কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। তাহলে?

মোহন আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল বাইকের কাছে। স্টার্ট নিয়ে চলে গেল যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকে। পড়ন্ত বেলার রোদ। মোহনের বাইক দূর থেকে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। মাঠটা পড়ে রইল শুনশান।

।। বার ।।

সুচন্দ্রা লাল পাড়ার এখন টপ বারবধূ। পাঁচ হাজারের কমে কথা বলে না। নামী-দামী লোক আসে, বসে, ফুর্তি করে, চলে যায়। আর আসে সবচেয়ে কুখ্যাত মানুষরা। যারা হাসতে হাসতে খুন করে। ভীষণ সাজানো-গোছানো একটি ঘর দোতলায়। যমদূতের মতো বসে আছে দুটো লোক। মদের বোতল, গেলাস, সোডা ওয়াটারের খালি বোতল। তিনটে প্লেটে মাংসের হাড়। সুচন্দ্রা প্রায় আউট। লোক দুটো নেশায় টান টান। পাপের জগতে এদের একজনের নাম পীরু, আর একজনের নাম জগা।

জগা পীরুকে বলছে—ব্যাটা ষণ্ড। মাথামোটা। তোকে বললে চমকে দিতে, আর তুই পাঠিয়ে দিলি মায়ের ভোগে।

পীরু—আরে, বুড়বাকের মতো কথা বলিস না তো! খুন তো করিসনি কোনোদিন। কারো গলা টিপে ধরলে আরো টিপতে ইচ্ছে করে। তা দম বন্ধ হয়ে গেলে আমি কি করব। শালা নেতিয়ে পড়ল।

জগা—তা লাশটা পাড়ায় না ফেলে বেপাড়ায় ফেলতে পারতিস তো!

পীরু—তোর দয়ামায়া কিস্যু নেই। মাল খেয়ে খেয়ে সব লোপাট চৌপাট হয়ে গেছে। পাড়ার জিনিস পাড়াতেই রইল। শালার বাড়ির লোকের লেবার কমে গেল। এক ছুটে এসে মড়া দেখে মরাকান্না জুড়ে দেবে।

জগা—ভালই করেছিস মাথামোটা। এইবার দু'সাইডের ধোলাই খাবে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচলেও মোহন শালা কী ছাড়বে? ব্যাটা যমদূত।

পীরু—ছাড়বে ছাড়বে। দুই আর দুইয়ে চার হয় সোনা। গব্বর সিং-এর মতো গতরটাই বাগিয়েছিস। মাথায় আছে ছাই। গোবর থাকলে তবু সার হতো। হিসেবটা বোঝার চেষ্টা কর।

জগা—এর মধ্যে আবার হিসেব কী! তোর হাফ আমার হাফ।

পীরু—ওরে আমার মানিক রে! পুরো কেসটা নামালুম আমি, অপারেশন আমার। এক কোপে খতম। ঘ্যাঁক করে গলাটা চেপে ধরে তিনটে ঝটকা। আর তুমি মেরে দেবে হাফ! শোন নেপো, এই দইয়ের এক ছিটেও তুমি মারতে পারবে না।

জগা— যাঃ, তুই আমায় এত পেয়ার করিস, প্রসাদ না দিলে তোর দিলে লাগবে রে। তোকে তো আমি জানি। মানুষের চেহারা হলে কী হয়, আসলে একটা হাতি। যাকে ভালবাসিস তাকে শুঁড়ে তুলে পিঠে চড়াস। আর যার ওপর

রেগে যাস তাকে খেঁতো করিস। তুই আর ব্যাঙ্ক তো এক রে। যতদিন থাকবে মাল সুদে বাড়বে। এইবার তোর সেই হিসেবটা বল মাইরি।

পীরু এক চুমুকে আধ গেলাস সাবড়ে জগাকে হিসেব বোঝাচ্ছে—

—শোন, মোহন খোকনকে ভালবাসে। খোকনকে কেন ভালবাসে। বল্, কেন বাসে! দেখি তোর নেশা হয়েছে কী হয়নি।

জগা একটু ভেবে বললে—খোকনের বোন পূর্ণা।

পীরু—ইয়া, মার দিয়া কেল্লা। ধরেছিস ঠিক। ষাঁড়ের কালিয়া। হুইস্কি খেলে সায়েবদের মতো বুদ্ধি হয়, কী বলো বেগম সাহেবা। তুমি যে বাবা এরই মধ্যে চেত্তা খেয়ে গেলে।

জগা—ওকে ছাড় এখন। তুই আটকে গেছিস, আগে বাড়ো।

পীরু—কী যেন হচ্ছিল?

জগা—হিসেব।

পীরু—হিসেব করে কী হবে! ওসব করবে ওই কেরানিরা। আমাদের হল জিও, পিও। কেউ মনে রাখবে না আমাদের। একদিন আদর করে নিজের মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছি, চিৎকার—বাপ হয়ে মেয়েকে রেপ করতে চাইছ! আমাদের ক্যারেকটার বলে আর কিছু নেই রে জগু।

জগা—লে হালুয়া! শেষ পর্যন্ত তোরই নেশা হয়ে গেল। আরে ব্যাটাচ্ছেলে ওই হিসেব—মোহন ভালবাসে খোকনকে, আসলে ভালবাসে পূর্ণাকে, তাহলে? তাহলে কী?

পীরু—অ, তুই ওই হিসেবটা বলছিস? খোকনের দু'লাখ টাকা চোট হয়েছে, তাহলে সমীরকে খতম করার কথা ছিল মোহনের, তার আগে আমরাই ওকে শুইয়ে দিয়েছি। সমীর অনেকের টাকা মেরেছে! ব্যাটা পাপী। পাপীরা কোথায় যায়?

জগা—নরকে।

পীরু—উসকো হাম নরকমে ভেজ দিয়া। হামাব কোতো, কোতো পুণ্য হল। সোব লোকের ভি কোতো আনন্দ হল। এইবার বাজি পোড়াবে, পটকা ফাটাবে। আভি তুমহার হিসাব ছোড়ো দোস্ত, এক রাউন্ড নাচা-গানা হো যায়। পীরু কোনো রকমে উঠে দাঁড়িয়ে নাচার চেষ্টা করল। পিয়া ঘর আয়া, আহা, আহা। শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে টলে পড়ে গেল। সেন্টার টেবল, মোড়া সব ছিটকে উলটে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড। পীরুর নাচ দেখে জগা খাটের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। পীরুকে বলছে—ব্যাটার লিভারে কিছু নেই, ছিবড়ে হয়ে গেছে। এই দ্যাখ, আমি স্টেজে দাঁড়িয়ে কেমন নাচি।

জগা, পীরুর কাণ্ড দেখে সুচন্দ্রা দু'হাত তুলে আতঙ্কের গলায় বলছে—উতার যাও, উতার যাও, খাট ভাঙ যায়েগা।

।। তের ।।

ওই পাড়ারই ডলির ঘরে তখন অন্য দৃশ্য। খোকন দাড়ি কামিয়েছে, চান করেছে। নিচের, নিচের ফ্ল্যাটে গুলজার। খদ্দের ঢুকছে, বেরোচ্ছে। ঘরে ঘরে প্রেম উপচে পড়ছে। কচি কলাপাতায় মোড়া বেলফুলের মালা। কারো কারো খোঁপায় জুঁইফুলের গোড়ের মালা। ফুল আর মদের গন্ধে বাতাস ভারী। ডলির ঘর সেই তুলনায় শান্ত। ছাদের নিরালায় এক টেরে। খোকনের সামনে একটা টেবিল। তার ওপর বড় প্লেটে কচুরি আর আলুর দম।

ডলি—তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আমি মাসিকে বলে আসি ঘরে লোক আছে। একটাই সমস্যা আজ আর কামাই হবে না। টাকাটা আমার গ্যাঁট থেকে যাবে।

খোকন—কত টাকা?

ডলি—তা ধরো পাঁচশো।

খোকন—তুমি আমার জন্যে এতটা করবে স্বপ্নেও ভাবিনি। ভগবান দিন দিলে পাঁচশো কেন, তোমাকে আমি পাঁচ লাখ দেবো।

ডলি—গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। আগে নিজে বাঁচো। আমার যদ্দিন যৌবন আছে তদ্দিন রোজগার আছে। তোমার তো কিছুই নেই।

খোকন—খুনটা দেখে ফেলেই বিপদ করেছি। আমার মোহনদাকে একবার ধরতে পারলে এখুনি একটা রাস্তা বেরোয়। ওরা আমাকে মারবেই, কারণ এই খুনের আমিই তো একমাত্র সাক্ষী।

ডলি—ওই ছোট্ট মাথায় অত দুশ্চিন্তা আর ঢুকিও না। রাতটা আমার খাটের তলায় কাটিয়ে দাও; কারণ মাঝরাতে আমার এক বাঁধা খদ্দের আছে। চুর হয়ে ঢোকে, একটু হাতটাত বুলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সকাল হলে তোমাকে পাচার করে দোবো।

খোকন—কোথায় পাচার করবে?

ডলি—আরে দেশে কী জায়গার অভাব আছে? আমি যেভাবে পাচার হয়েছি, তুমিও সেইভাবেই পাচার হবে।

খোকন—তুমি আমার জন্য এত করছ কেন?

ডলি—ন্যাকামি করো না। কেন-র কোনও জবাব নেই। ঝপ করে মেরে দাও, আমি বাইরে থেকে দরজায় তালা মেরে দিয়ে যাচ্ছি।

।। চোদ্দ ।।

কালীবাড়ি। মা খুবই জাগ্রত। প্রায় তিনশো বছরের প্রাচীন মন্দির। আরতি হচ্ছে মহা সমারোহে। মালিনী আর পূর্ণা বসে আছে হাতজোড় করে। এধারে, ওধারে আরো দু'চারজন ভক্ত। আরতি শেষ হল। সৌম্যদর্শন পূজারী হাতে হাতে চরণামৃত দিচ্ছেন।

মালিনী চাপা স্বরে বললে— ঠাকুরমশাই! আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

ঠাকুরমশাই—দাঁড়াও মা, একটু ব্যস্ত আছি। একটু পরে সব শুনব।

ঠাকুরমশাই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে উচ্চকণ্ঠে এক সুবেশ তরুণকে ডাকছেন, শোনো বাপি, শোনো বাপি।

যুবকটি ডাক শুনে মন্দিরের সামনের জমিতে উঠে এল রাস্তা থেকে। পূজারীকে প্রণাম করে বললে,

—ভালো আছেন জ্যাঠামশাই? বাবা আজ সকালেই আপনার কথাই বলছিলেন। আপনি কিন্তু অনেকদিন আমাদের বাড়িতে যাননি। একদিন আসুন না। একটু জ্যোতিষ-টোতিস হবে।

—যাবো, যাবো, তোমার বাবার সঙ্গে আমাব খুব দরকার।

—আমাকে বলতে পারেন।

—না, না, সে-কথা তোমাকে বলা যায় না। আমি রবিবার সকাল নটায় যাব। বাবাকে বলে রেখো।

ছেলেটি মন্দিরে মাকে প্রণাম করে চলে গেল। পূজারী সিল্কের উত্তরীয় সামলাতে সামলাতে মন্দিরের দালানে উঠে বিশ্বত্রাতার ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। ঢুলু ঢুলু চোখে মালিনীকে বললেন,

—বলো মা, তুমি যা বলবে সব আমি জানি। এই পনের তারিখ পর্যন্ত গ্রহগুলো সব তেড়েবেঁকে আছে। সে তোমরা বুঝবে না, মহাকাশে এক মহাচক্রান্ত। এখন কেউ ভালো নেই, কেউ ভালো থাকতে পারে না। এই দেখ না, চোদ্দ বছর পর আমার বাত আবার ফিরে এসেছে। বসলে উঠতে পারি না, উঠলে বসতে পারি না। অথচ এই পা দুটো এই শরীরটাকে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা কম ঘোরান ঘুরিয়েছে! তীর্থ থেকে তীর্থে। গোমুখ, গঙ্গোত্রী একসময় আমার কাছে ছিল এপাড়া-ওপাড়া। সব ওই বেটীর খেলা, হাসছে দেখো! খিল খিল করে হাসছে। আমি মাঝে মাঝে জিভটা টেনে দিই। আদর, বুঝলে আদর। যা চাইবার ওই বেটীর কাছে চাও, মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই। তোমাদের ধোয়া কাপড়?

মালিনী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠাকুরমশাই—তাহলে যাও, ভেতরে যাও। মায়ের পা দুটো জড়িয়ে তিনবার কপাল ঠোকো। এই কথার পিঠে বাইরে থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল— কপাল লিখিতং ধাতা কোন শালা কিং করিষ্যতি।

ঠাকুরমশাই—কে, কোন অর্বাচীন?

—আজ্ঞে, অর্বাচীন মোহন।

—তুই বাপি, এই সময় কোথা থেকে জ্বালাতে এলি। তোর তো এখন অন্য জায়গায় থাকার কথা বাপি!

—আজ্ঞে, শক্তিসাধনার পীঠস্থানেই তো এসেছি। শক্তির তো দুটো রূপ

ঠাকুরমশাই, একটা সলিড, একটা লিকুইড। আচ্ছা, বলুন তো কত রকমের লবণ আছে?

—এ আবার কী অর্বাচীন প্রশ্ন বাপি! এ প্রশ্নের কোনো উত্তর হয়!

—এত শাস্ত্র পড়লেন, এত যজমানকে খলখলে করলেন, এই উত্তরটা জানেন না? এ হচ্ছে গোলাপি রেউড়ির মতো গোলাপি ধাঁধা। শুনুন তাহলে, লবণ, সৈন্ধব লবণ, ভাস্কর লবণ। একই লবণ, প্রথমটা সংসারির ভোগে লাগে, দ্বিতীয়টা দেবভোগে, তৃতীয়টা অম্বলের রোগীর হজমে। শক্তিও সেইরকম ঠাকুরমশাই।

—শোন্ বাপি। সাড়ে তিনশো বছরের এই কালীমন্দিরে এসে আজেবাজে কথা নাই বা বললি।

—ঠাকুরমশাই, সবই মায়ের ইচ্ছা। ছিল সিমেন্টের খরখরে মেঝে, হয়ে গেল পাথরের। দেয়ালে পিঁপড়ে পিছলে যাচ্ছে, আগে পিঠ লাগলে নুনছাল উঠে যেত। আর নিজে হয়েছেন ফ্রিজ থেকে সদ্য বের করা একটি কুলফিমালাই।

—বাপি, হাত জোড় করছি।

—আমার দিকে নয়, ওই মায়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ান। বলুন, মা ভবতারণী, আমাকে চৈতন্য দাও মা, আমার অহঙ্কার কিঞ্চিৎ ছেঁটে দাও মা। আজ আছি কাল নেই মা, মরে গেলে কোনো নাম নেই মা।

মন্দিরের পেছন দিক থেকে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ঝুমকো চুলো একটা ছেলে সিঁড়ি দিয়ে দু'ধাপ নেমেছে কি নামেনি মোহন বাঘের মতো তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাঞ্জাবির সামনেটা খামচে ধরে দু'বার ঝাঁকানি মেরে মোহন গর্জে উঠল,

—শুয়োরের বাচ্চা, হারামি, তোকে এইবার কোন জগদম্বা বাঁচাবে। মায়ের পায়ের লাল জবা এক ঝুড়ি চিবিয়ে খেলেও এই হাঁড়িকাঠেই তোর শেষ গতি।

ছেলেটির নাম পরেশ। ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। তোতলাতে তোতলাতে বলছে,

— মোহনদা আমি কী করেছি?

ঠাকুরমশাই ভয়ে জড়সড় হয়ে বলছেন— বাপি, এটা মায়ের মন্দির। এখানে ওসব করে না বাপি।

মোহনের হাতের মুঠো এতটুকু আলগা হল না। পরেশের পাঞ্জাবি সেই একই কায়দায় ধরে আছে। আর একটা ঝাঁকানি মেরে বললে—ঠাকুরমশাই, সাড়ে তিনশো বছর আগে এখানে নরবলি হত। সাড়ে তিনশো বছর পরে এই নরছাগলটাকে পাওয়া গেছে। আপনি শুধু এর গলাটা আর খাঁড়াটাকে একটু পুজো করে দিন। এক কোপে নামিয়ে দি।

মোহনের এবার অন্য চেহারা, কেশর ফোলানো সিংহের মতো। একটা হুঙ্কার ছেড়ে বললে—মা, অনেকদিন নিরামিষ খেয়ে আছিস মা, আজ তোর আমিষ ভোগ।

পূর্ণা এতক্ষণ থম মেরে বসেছিল। সে তরতর করে নেমে এসে মোহনের

হাত ধরল,

—কী করছ মোহনদা?

—এই শুয়োরটা একটু আগে মাধুরীকে বলে এসেছে, ইজ্জত যখন একবার গেছেই তখন শরীরটাকে কাজে লাগিয়ে দু'পয়সা ইনকাম কর না। আমার হাতে ভাল ভাল খদ্দের আছে।

মোহন পরেশকে সপাটে একটা থাপ্পড় হাঁকাল। পরেশ ঠিকরে হাঁড়িকাঠের ওপর। মোহন দু'কোমরে হাত রেখে বললে—খাঁড়াটাকে আর অপবিত্র করব না ঠাকুরমশাই। এই পায়রাটার জন্যে ছোট একটা দানাই যথেষ্ট। আমার কোমরের খাপে এই মেশিনটা অনেক দিন উপোস করে আছে।

পরেশ—গুরু, বুঝতে পারিনি, সেমসাইড হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মোহনের এক লাথি। পরেশ কোঁক করে উঠল।

মোহন—আমার পায়ে ধরে কী হবে। আমার এলাকায় মেয়েদের অসম্মান চলবে না। তোকে সবার সামনে মাধুরীর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে।

পরেশ—বেইজ্জত তো আগেই হয়ে গেছে মোহনদা।

মোহনের মার শুরু হল। ঠাকুরমশাই ভয়ে মন্দিরের ঝোলা ঘণ্টাটাকে জোরে জোরে বাজাতে লাগলেন। আর গাঁক গাঁক করে চিৎকার করতে লাগলেন—জয় মা জয় মা।

।। পনের ।।

একটা পুরনো বাড়ির ভাঙা ভাঙা ঘর। রাত গভীর। মোহন মদে চুর। একপাশে গুম মেরে বসে আছে। গুপীদাও অল্পবিস্তর খেয়েছে। মুখটা টকটকে লাল। সোফিয়া টগবগ করছে। যত রাত বাড়ছে ততই তার জেল্লা বাড়ছে।

মোহন গুপীকে বলছে—তুমি কী আমাকে চরিত্রহীন ভাবো?

গুপী—ঠিক উলটো ভাবি। তোমার মতো চরিত্রবান ছেলে এপাড়ায় ক'জন আছে! তুমি শেয়াল নও, তুমি বাঘ। সোফিয়ার বয়েস আমার অর্ধেক। আমি ওর বাপের বয়সী। দুটো জীবন অ্যায়সি মিলে গেছে। সোফিয়া তোমাকে ভালবাসে, তা আমি জানি; কিন্তু তুমি জান, সোফিয়া গুপী ঢ্যামনার বউ। এই অবস্থায় হিন্দি ছবি হলে কী হতো? সোফিয়া আর তুমি আমাকে হাপিস করে ম্যানহোলে ফেলে আসতে। কই তা তো তুমি করোনি মোহন। তোমার কোমরে তো সবসময় মেশিন থাকে। ছোট্ট একটা দানা, ছোট্ট একটু শব্দ, একটা কুত্তার মৃত্যু, একটা লেংটি খতম। তার বদলে তুমি কী করলে! এই শালাকে গুপীদা বলে সম্মান করলে, আগলে রাখলে। তা না হলে এই গুপীদা কবে খতম হয়ে যেত। তুমি এই খাতির কী সোফিয়ার জন্যে করো? না। গুপীর একটা অতীত আছে। পড়তি জমিদার বংশের মুক্‌খু ছেলে। যৌবনে দু'হাতে উড়িয়েছি। সোফিয়াকে ওর দাদুর কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে গোটা ভারতে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরেছি। আমি জানি, তুমি আমাকে ভালবাস, কেন বাস মোহন?

মোহন—তুমি একটা মানুষ, সেন্ট পারসেন্ট খাঁটি মানুষ। তুমি আমার মায়ের কথারই উজ্জ্বল উদাহরণ। আমার মা কে বল তো গুপীদা?

গুপী—তোমার মা তো তোমার চার বছর বয়সেই চলে গেছেন।

মোহন—গর্ভধারিণী নয় গো। আমার জীবনদায়িনী, শক্তিদায়িনী মা সারদা, ওই যে তাঁর ছবি। ওই মা বলেছিলেন, শোন মোহন, যখন যেমন তখন তেমন, যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন, যেখানে যেমন, সেখানে তেমন। তুমি কেঁচোর মতো বড়লোকি চাল নিয়ে গর্তে ঢুকে মরতে চাওনি। তুমিই হলে একালের জ্যান্ত স্লোগান—লড়াই, লড়াই, লড়াই চাই।

রয়াল এনফিল্ড মটোর বাইকের বিকট শব্দে মোহনের গলা চাপা পড়ে গেল। সোফিয়া উৎকণ্ঠায় টানটান—

—সেই শুয়োরের বাচ্চা। মোহনদা, আসছে সে।

॥ ষোল ॥

অন্ধকার রাত। সামনে অমাবস্যা। কালো ঘুটঘুটে নির্মেঘ আকাশ। তারার ঝাঁক ফুল ভোল্টেজে ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। সেই অন্ধকারে বিশাল মোটর সাইকেল থেকে নামছে কালোয়ারের ছেলে সূরয। সবাই বলে কালা সূরয, গেরোন লাগা সূর্য। দুটো 'ম' নিয়ে পড়ে আছে। পাতি সাপ্লাই দেয় মালকোঁচা মারা সেকেলে বাপ। শিবের ভক্ত। বাড়িটাই শিবমন্দির। কালা সূরয চোরাই অস্ত্রের ব্যবসা করে। বম্বের মাফিয়াদের সঙ্গে কানেকশান। কালা সূরয গুপীর বাড়িতে ঢুকছে। কাঁধে একটা বড় ব্যাগ। সূরয সামনের দরজা দিয়ে ঢুকছে। মোহন আর গুপী সুট করে বেরিয়ে গেল পেছনের দরজা দিয়ে। মোহন পাশের একটা গলিতে মোটরসাইকেল রেখেছিল। মোহন বেরিয়ে যাওয়ার সময় সোফিয়াকে বলেছিল—শিকারটাকে আচ্ছাসে খেলাও। আজকের রাতই ওর শেষ রাত হবে। অন্ধকার গলি ধরে মোহন ছুটছে 'রতন স্টুডিও'-র দিকে।

এদিকে সূরয ঢুকছে। বড়ি চমকিলি রাত।

—মেরি দুলাড়ি। বুঢ্ঢাটা কোথায়? গন্ধী মাল।

সোফিয়া যেন কতই প্রেমিকা। মায়া মেশানো গলা তার—সেটাকে আউট করে দিয়েছি।

—তাহলে?

—তাহলে আবার কী! তুমি আমার, আমি তোমার। পুজোর সময় চম্পট। সোজা বোম্বাই। তুমি আমাকে 'সিল্কি স্মিতা' করে দেবে। লাখ লাখ টাকা, গাড়ি, বাড়ি, হীরের গয়না।

সূরয খুব খুশি—এই তো, এই তো, লাইনে এসেছ। তোমার যা ফিগার মাইরি। একটু মেকআপ মেরে নামিয়ে দিলে সব আউট। রাস্তা ঝাড়ু দেবে। খালি একটু নাচাগানা শিখতে হবে।

—আরে ইয়ার সে তো আমি জানি। বিলকুল জানি।

—তাহলে আমাদের ডানকুনির বাগানে এই শনিবার।

—হয়ে যাক। আমার সিল্কের শাড়ি আছে, নকলি সোনার গয়না আছে।

—আরে আসলি পরবে, আসলি। আমার নাম সূরয, তুমি আমার চন্দা।

ওদিকে রতন স্টুডিওর সামনে মোহন। ডাকছে—এই রতন, রতনা।

স্টুডিওর রোলিং-শাটার অর্ধেক নামানো। তলা দিয়ে গলে বেরোতে বেরোতে রতন বলছে,

—গুরু! তুমি এত রাতে!

—শিকার পড়েছে। তোর পোলারাইজটা নিয়ে শিগ্‌গির আয়। একটুও দেরি চলবে না।

—এক সেকেন্ড, মালটা লোড করে নি।

—ফ্লপ করে না যেন।

রে বাবা, জার্মানির এক নম্বর মাল। শিওর শট। অন্ধকারে শেয়ালের চোখ।

এদের দু'জনকে রেখে আবার আমরা সোফিয়ার ঘরে যাই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে খোঁপা ঠিক করতে করতে সোফিয়া সূরযকে বলছে—কেমন দেখছ?

লোভে সূরযের চোখ দুটো জ্বলছে। সূরয সোফিয়ার ঘাড়ে ঠোঁট ঠেকিয়ে বলছে—

পাগল হয়ে যাব। শিউজির ষাঁড় আমি।

—ষাঁড় নয়, ভাদ্দর মাসের কুকুর।

—যাঃ, নিজেকে কুকুর বলতে ইচ্ছে করে!

—আগে আলোটা নেবাও।

আলো নিবল। মোহন আর রতন নিঃশব্দে পেছনের খিড়কি দিয়ে ঢুকছে। ডানপাশে একটা উঁচু মতো জায়গায় বসে আছে গুপী। বিড়ির আগুন বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে।

মোহন গুপীকে ফিসফিস করে—বিড়ি ফেলে দাও। হাওয়া ওইদিকে বইছে। গন্ধ যাবে। সব ঠিক আছে তো!

গুপী বিড়ি ফেলে দিয়ে চাপা গলায় বললে, এই মাত্র আলো নিবেছে।

মোহন আর রতন নিঃশব্দে বেড়ালের মতো ভেতরে চলে গেল। গুপী বাইরেই বসে রইল। অন্ধকারে দুটো সিল্যুয়েটের নড়াচড়া। মোহন রতনের কানে কানে জিজ্ঞেস করলে—শাটারের শব্দ হবে না তো?

—না। ক্যামেরাটা কম্পিউটারাইজড।

—সাবাস বিজ্ঞান।

সূরয ইতিমধ্যে অন্ধকারে বেশ কিছুদূর এগিয়েছে। সেমিফাইনাল থেকে ফাইনালে যাবে, এমন সময় দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। সূরয চমকে উঠেছে। ঠিক দরজার সামনে দীর্ঘকায় মোহন, পাশে রতন পালোয়ান।

মোহন বরফ শীতল গলায় বললে,—সূরযবাবু, ইঁদুর কলে পড়েছ। বেশি রং নেবার চেষ্টা করো না। এই যে দেখছ যন্তরটা, পোলারাইজড ক্যামেরা। এর ভেতর আছে তোমার মৃত্যুবাণ।

সূরয চাদর জড়ানো অবস্থায় ঘরের এক কোণে উজবুকের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বললে—মোহনবাবু, আপনি এইসময় এখানে?

মোহনেরও সেই একই প্রশ্ন—সূরযবাবু, আপনি এইসময় এখানে? ব্যাগে কত মাল আছে?

—কেন মোহনবাবু?

—আজ রাতে পঁচিশ হাজার ক্যাশ। এরপরে মাসে মাসে এক লাখ।

—আমার সঙ্গে দিল্লাগি করছেন?

—তাহলে এই তিরিশখানা ছবি আপনার বাবার কাছে, বউয়ের কাছে, আপনার শ্বশুর, শাশুড়ির কাছে পাঠিয়ে দিই।

—আপনার মতো লোক আমাকে ব্ল্যাকমেল করছেন।

—ও সব ঢঙের কথা খুব হয়েছে, যা বলছি তাই কর। তা না হলে আমি যা বলেছি তাই হবে।

—এতে তো সোফিয়ার ভি ক্ষোতি হোবে।

—সে জন্যে তো আমি আছি।

—দেখুন, মোহনবাবু, আমাকে ভয় দেখিয়ে কোনো কাম হোবে না, বোরোং আপনার ক্ষোতি হোবে।

—আমার যে ক্ষতি করতে পারে সে এখনো জন্মায়নি রে শালা। এইবার আমি তোর কী হালত করি দেখ।

মোহন রতনের দিকে ফিরে বললে—এই তোর কাছে লাইটার আছে?

—আছে।

—একটা কাজ কর। এই শালার গন্ধী শার্ট, ট্রাউজার, জাঙ্গিয়া—সব বাইরের বাগানে একটা খোলা জায়গায় নিয়ে গিয়ে লাইটার মেরে দে। ছাই করে দিয়ে চলে আয়।

সূরয একটা হুঙ্কার ছাড়ল—রতন, তুমি মোহন নও।

মোহন বললে—রতন, তুই আমার ছাতার তলায় আছিস। তোর টিকি কেউ ছুঁতে পারবে না।

—জানি গুরু, রতন তিনবার মরতে মরতে বেঁচেছে। আমি মরতে ভয় পাই না। সূরযবাবু আজ তুমি নাঙ্গা হয়ে বাড়ি ফিরবে। কেমন লাগবে। তোমার ছেলে

দেখবে, মেয়ে দেখবে।

মোহন বললে—তোমার ওপর আরো একটু কাজ হবে। কপালে একটা উল্কি করে দোবো। জীবনে উঠবে না, আর শব্দটা এতই অশ্লীল যে নিজের মুণ্ডু নিজেকেই না কাটতে হয়।

মোহন কথা বলতে বলতে ক্রমশই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। এ মোহন সেই মোহন, যে সবকিছু গুঁড়িয়ে দিতে পারে। দু'হাত তুলে অদ্ভুত একটা গলায় বললে—আজ, চতুর্দশী। ওর সভ্যতার খোলস পুড়িয়ে ছাই করে ঘাড় ধরে রাস্তার চৌমাথায় নিয়ে গিয়ে ল্যাম্প-পোস্টে বেঁধে রাখ। ভাবছে, ওই চাদরটা লজ্জা নিবারণ করবে। ওটাও খুলে নেওয়া হবে টান মেরে। সূর্যকুমার! সামনের ইলেকশানে বিধানের পার্টি না কী টিকিট দিচ্ছে তোমাকে? ভেতরের খবরটা বলে দি—পার্টির ভেতরের কোঁদলে বিধান আউট হয়ে যাচ্ছে। এই ছবিগুলো পার্টিরও কাজে লাগবে। রতনে রতন চেনে। দুই মালই আউট। খামে ভরব আর ভেজে দোব।

সূরয—আমার কাছে এখন অত টাকা নেই।

মোহন—কত আছে?

সূরয—দশ, পনের হবে। দুটো বিলিতির বোতল আছে।

মোহন—রতনা, ব্যাগটা সার্চ কর।

সূরয বাধা দেবার চেষ্টা করতেই মোহন মাবল এক ঝটকা। সূরয পিংপং বলের মতো ঠিকরে গেল। মোহন হাসছে—

—বেটার অবস্থা দেখ রতন। বেহালার মতো করুণ!

রতন—বেহালা! জায়গা না বাজনা!

মোহন—বাজনা রে বাজনা। আজ পর্যন্ত বেহালায় করুণ সুর ছাড়া কিছু বাজতে শুনেছিস। বেহালা হল ভারতীয় নারী। কান্নার জন্যেই তার জন্ম।

রতন ব্যাগ থেকে প্লাস্টিকে মোড়া ছোট একটা পুবিয়া বের করে মোহনকে দেখাল—

মোহনদা, মালটা কী?

মোহন—একবার থানায় ফোন কর। বুঝতে পরবে মালটা কী! নারকোটিক্স। দেশের যুবশক্তিকে গোল্লায় পাঠাবার সাদা গুঁড়ো। ভাল মাল পেয়েছিস রতন। ওইতেই বছর দশেক ঘানি ঘোরাবে। মামাদের আদরে ভাগনে ভালই থাকবে। জরিমানাও হবে যথেষ্ট।

সূরয—উল্টোটাও হতে পারে মোহনবাবু। মালটা এখন তোমার হাতে। আমি অস্বীকার করব। পুলিশ তোমাকেও চেনে। আমার চেয়ে ভাল চেনে।

মোহন—চেনা কাকে বলে, জানো তুমি সূরয; দু'রকম চেনা আছে রে মর্কট। প্রকৃত চেনা আর ওপর ওপর চেনা। তবু তোমাকে যাতে চিনতে ভুল না হয়, সে

ব্যবস্থা আমি করব কালাচাঁদ। রতন তোর ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ আর ডটপেনটা বের কর। সূরযবাবু এইবার আমি একটা জিনিস বের করি।

মোহন কোমরের কাছ থেকে একটা রিভলবার বের করল, দু'পা পেছিয়ে গিয়ে একটা টুলে বসল। নলে একটা ফুঁ মেরে সূরযেব দিকে তাক্ করে বললে—যা বলছি, ওই কাগজটায় লেখ—আমি সূরয সিং, আমার নাম মহাবীর সিং। ঠিকানা, ছ'নম্বর নবকৃষ্ণ নন্দী লেন। আমি হেরোইনের চোরা চালানদার। আমার এই ব্যাগ থেকে মোহনলাল যে প্যাকেটটা বের করেছে তার মালিক আমি। হয়েছে লেখা?

সূরয—আমি বাংলা লিখতে জানি না।

মোহন—একটি থাপ্পড়ে তোমার বদন ঘুরিয়ে দেবো রাসকেল। যা বলছি লেখ্—শালা, বরাহনন্দন।

সূরয—তুমি আমায় গুলি করতে পারবে না। গুলির শব্দে লোক ছুটে আসবে। আমি মরে গেলে তোমাকে পুলিশে ধরবে। তোমার ফাঁসি হবে। এটা হিন্দি সিনেমা নয় মোহনলালবাবু!

মোহন সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে রতনকে বললে—

ওর গায়ের চাদরটা খুলে নিয়ে পাকিয়ে পাখার হুকে বাঁধ। একটা ফাঁস তৈরি কর। বহুত ভ্যানতাড়া হয়েছে। চল, ঝুলিয়ে দিয়ে থানায় যাই। একটা এফ আই আর করে আসি। সোফিয়াকে রেপ করছিল, আমরা দেখে ফেলায়, ব্যাটা পেটাইয়ের ভয়ে ঝুলে পড়েছে।

সূরয বললে—কেন অত ঝামেলা করছ মোহনলাল। তোমার অনেক ক্ষমতা, অনেক খুন করেছ তুমি, সব আমি জানি। তবু আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি। আমি জানি, তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে ছারপোকার মতো টিপে মেরে ফেলতে পার। আমার অনেক পাপ। এখানে আসা আমার উচিত হয়নি। আমার অন্যায় হয়েছে। এইবার তোমার যা ইচ্ছে হয় আমাকে কর। তোমার কাছে সারেন্ডার করলে তুমি অপরাধীকে ক্ষমা কর, তা আমি জানি। আমি এমন কাজ আর কখনও করব না মোহনলাল। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা রইল না। আজ থেকে আমি তোমার বন্ধু। তুমি আমাকে ভাল হওয়ার সুযোগ দাও।

মোহন—সত্যিই তুমি আমার বন্ধু হতে চাও?

সূরয—জরুর! আমার জবানের দাম আছে।

মোহন—তাহলে বলো, এই সাদা গুঁড়োর পেছনে কে কে আছে?

সূরয—আমি তোমাকে বলব, তবে আজ নয়। আমাকে আরো একটু জানতে হবে। আমি ছুটকোগুলোকে জানি, আসল রাজা কে জানতে পারিনি। তোমার মতো আমিও জানতে চাই, খতম করে দিতে চাই। আমার ব্যাগে পঁচিশ হাজার আছে, সোফিয়াকে দিয়ে দাও। আজ থেকে সোফিয়া আমার বন্ধু।

ছবিগুলো তোমার কাছেই থাক, তাতে তোমার কাছে আমার টিকি বাঁধা থাকবে। আমি তোমার দুশমন না দোস্ত, আগে প্রমাণ করি। তুমি মনে রেখ, ওই ছবিতে সোফিয়া ভি আছে। এইবার তুমি আমার লজ্জা ফেরত দাও।

মোহন—রতন। ওর জামা, প্যান্ট ফেরত দে।

রতন—গুরু। তুমি বিশ্বাস করে বিপদে পড়বে!

সূরয তার ব্যক্তিত্ব ক্রমশই ফিরে পাচ্ছে। যতই হোক, সূরযেরও পাওয়ার আছে। টাকা আছে। নেতাদের টাকা খাওয়ায়। এক গাদা গুণ্ডা পোষে। ব্যঙ্গের গলায় রতনকে বললে—

—আরে এই ফটোওয়ালা, রাজায় রাজায় কথা হচ্ছে দোস্ত। তুমি একটু চুপ থাক। এ তোমার অন্ধকারে তসবির খ্যাঁচা নয়। এ ইস্যুটা অনেক বড়, ইন্টারন্যাশনাল।

॥ সতের ॥

ক্লান্ত মোহনলাল মাধুরীদের বাড়ির সামনে বাইক থেকে যখন নামল, তখন গভীর রাত। হাওয়া ঘুরে গেছে। তারাদের স্থান পরিবর্তন হয়েছে। হেডলাইটের আলোয় ফাঁকা রাস্তা এক ঝলক দেখা গেল। মাধুরীদের বাড়ির ভেতর থেকে সেতারের মিহি আলাপ ভেসে আসছে। মোহন অন্ধকারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপরে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে, তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে কলিংবেল টিপল। সেতার আর বেল একসঙ্গে বাজছে। সেতার থেমে গেল। দরজা খুলল মাধুরী।

মাধুরী—এ কী! এত রাতে তুমি কোথা থেকে এলে?

মোহন—তোকে বড় দেখতে ইচ্ছে হল।

মাধুরী—দেখে তো মনে হচ্ছে একেবারে বিধ্বস্ত।

মোহন—সারা জীবন ছ্যাঁচড়ামি করতে করতে আমি ছিবড়ে হয়ে গেলুম। কিছু খেতে দিবি রে!

মাধুরী—তুমি হাত-মুখ ধোবে তো।

মোহন—আরে ধুস। আমি এই বারান্দায় আমার বেতের চেয়ারটায় বসছি। তুই কুড়িয়েবাড়িয়ে যা পাস নিয়ে আয়। পেটে আগুন জ্বলছে।

মাধুরী—ও শোনো, ভাগ্যিস মনে পড়ল—একটা উটকো ছেলে এসে তোমার নামে একটা চিঠি দিয়ে গেছে।

মোহন—এখানে?

মাধুরী—হ্যাঁ, এখানে।

মোহন—তার মানে সকলেই জেনে গেছে, এইটেই আমার বাড়ি। যাব্বাবা! যার কোনো চালচুলো নেই, দালান-কোঠা ফেলে দিয়ে যার শ্মশানে বৈঠকখানা,

পাবলিক তার মাথার ওপর ছাত তৈরি করে দিলে! দে, দে, চিঠিটা দে। নিশ্চয় জরুরি। তুই খুলে দেখিসনি?

মাধুরী—তোমার চিঠি, তোমার অনুমতি ছাড়া পড়বো কেন?

মোহন—সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে?

মাধুরী—পড়বে না! রাত কত হল বল তো!

মোহন—তুই কেন জেগে আছিস?

মাধুরী—যদি বলি তোমার জন্যে!

মোহন—শোন, তুই আর আমাকে দুর্বল করে দিস না। যা, চিঠিটা নিয়ে আয়।

মাধুরী—এই বারান্দাতেই থাকবে? ভেতরে আমার ঘরে আসবে না?

মোহন—তুই একটা আইবুড়ো মেয়ে, আমি একটা আইবুড়ো ছেলে। এই গভীর রাত, সবাই ঘুমুচ্ছে, রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা বলা উচিত ছিল। বারান্দা পর্যন্ত এসেছি, এইটাই তো যথেষ্ট দুঃসাহস।

মাধুরী—যাকে দেখে পাড়ার সমস্ত লোক কাঁপে, সে নিজে এত ভীতু! তুমি যখনই কলিং বেল বাজিয়েছো, জেনে রাখ, বিছানা না ছাড়লেও সবাই জেগে আছে।

মোহন—শোন বাঘকে সবাই ভয় পায়; কিন্তু তুই যদি বাঘের সামনে ভটাস্ করে একটা ছাতা খুলিস, বাঘ ভয়ে পালাবে। আমি মানুষকে মেরে চৌপাট করে দিতে ভয় পাই না; কিন্তু মেয়েদের প্রেমকে ভয় পাই। ওর চেয়ে ভয়ঙ্কর ফাঁস পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

মাধুরী—যে এত ভাল গান গায়, তার ভেতরে প্রেম নেই, এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে!

মোহন করুণ গলায় বলল—ভীষণ খিদে পেয়েছে রে।

মাধুরী ভেতরে চলে গেল। বারান্দার আলো-আঁধারিতে বসে আছে মোহন। হুকে হুকে ঝুলছে অর্কিডের টব। মোহনের পাশে একটা সেন্টার টেবল, অ্যাশট্রে। কে একজন সামনের পথ দিয়ে যেতে যেতে কাশছে।

মোহন জিজ্ঞেস করলে—কে যায়?

পথিক জড়ানো গলায়—কে কয়?

মোহন গলা শুনে চিনতে পেরেছে—আরে হারুদা।

হারু জড়ানো গলায় বললে—এই তো রতনে রতন চেনে, ভাল্লুকে চেনে শাঁকালু। এত রাতে এই ঠেকে কী করছ বাওয়া! এটা কী তোমার কাফেটেরিয়া?

মোহন গলা নকল করে—বিরিয়ানি খাচ্ছি বাওয়া।

হারু—যার যেমন বরাত! তুমি খাচ্ছ বিরিয়ানি, আমি খাচ্ছি বিড়ি।

মোহন—কতটা চড়িয়েছ?

হারু—রোজ যা চড়াই।

মোহন—মাতাল হয়ে গেছ, বাড়ি যাও।

হারু—বাড়ি, বাড়ি, বাড়ি।

হারু সুন্দর সুরেলা গলায় গান ধরল—ভালবাসা মোরে ভিকিরি করেছে, তোমারে করেছে বাড়িউলী। ঢুকলেই মুড়ো ঝ্যাঁটা, সারারাত চুলোচুলি।

মোহন—হারুদা, বাড়ি যাও প্লিজ।

হারু—দেখ মাইরি। ইংরিজি বলে অত খাতির করিসনি। বলো— এই শালা হারু বাড়ি যা। হ্যাঁগা, তুমি কে?

মোহন—তোমার মতোই এক পথহারা পথিক।

হারু—তা পথে নেমে এস ভাই, গলা জড়াজড়ি করে গান গাই।

হারু গান গাইতে গাইতে অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে চলে গেল। মাধুরী সেন্টার টেবিলে প্লেট, চামচ রাখছে। সামান্য টুং টাং শব্দ। মোহন মাধুরীকে দেখছে। মায়া আসছে, ভালবাসা জাগছে। শক্ত, উন্মত্ত পৃথিবী ক্রমশ নরম হচ্ছে। মাধুরীকে স্পর্শ করার, আদর করার বাসনা হচ্ছে। কোথাও, কোনোখানে নতুন একটা জীবন শুরু করার ইচ্ছে।

মাধুরী বললে—এই নাও সেই চিঠি।

মোহন—তুই পড়। আমি ততক্ষণ খাই।

মাধুরী আলোর দিকে সরে গিয়ে চিঠি পড়ছে,

'মোহনদা, আমি খোকন। কাদের বক্স লেনের সাত নম্বর বাড়ির চিলেকোঠায় লুকিয়ে আছি। এ পাড়ায় মেয়েটার নাম ডলি। তুমি কাল দুপুরে একবার যদি আস। তোমাকে সব কথা বলে হালকা হতে চাই। দয়া করে আশ্রয় দিয়েছে দেবীর মতো এই মেয়েটি। তুমি অবশ্যই আসবে। খোকন।'

মাধুরী বললে—খোকনের চিঠি। বেঁচে আছে। যাক বাবা।

মোহন বললে—কতদিন বাঁচবে! যাক, কাল যা হয় হবে। কী রেঁধেছিস মাধুরী! আগের জন্মে সিওর তুই দ্রৌপদী ছিলিস।

মাধুরী—ক্ষিধের মুখে সবই ভাল।

মোহন—তুই সব তুলে নিয়ে যা। এইখানটায় আমি একটু আরাম করি।

মোহন বেতের চেয়ারে শরীরটাকে সামনে ঠেলে দিয়ে ঘাড়টাকে বাঁদিকে হেলিয়ে তার সেই বিচিত্র ভঙ্গিতে নিমেষে চলে গেল ঘুমের জগতে। স্বপ্ন দেখছে। সেই একই স্বপ্ন। রোজ আসে। বিরাট এক বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন তার মা। পেছনে একটা নদী। ঘাটে বাঁধা একটা নৌকো ঢেউয়ের দোলায় দুলছে।

মোহন—মা, তুমি কখন এলে?

মা—দেখতে এলুম, তুই কেমন পিকনিক করছিস?

মোহন—এই দেখ না মা, উনুন ধরছে না, বারে বারে নিবে যাচ্ছে।

মা—দাঁড়া, ওটা তোর কাজ নয়। আমি সূর্যের কাছ থেকে আগুন আনি।

মোহন—সে তো অনেক দূরে মা, তুমি কাছে গেলে ছাই হয়ে যাবে।

মা—আমি তো ছাই হয়েই গেছি।

ঘাট থেকে নৌকো খুলে গেল। মা ভেসে যাচ্ছেন মাঝ-নদীর দিকে।

মোহন চিৎকার করে বলছে—মা, আমাকে নিয়ে যাও। এ জীবন আমার ভাল লাগছে না।

মা দূর থেকে বলছেন—তোর এখনও সময় হয়নি। অনেক বাকি। পথটা দেখে রাখ, সময় হলে চলে আসিস চিনে চিনে।

নদী, ঢেউ, দিগন্ত, জনপ্রাণীহীন বিস্তার। বাস্তবে মোহন অন্যকে কাঁদায়, স্বপ্নে সে নিজে কাঁদে। ৪

এপার ওপার

বসে বসে হাওয়া খাচ্ছিলুম! ফুরফুরে সুন্দর বাতাস। শুনছিলুম পাখির ডাক নয় কুজন। এখানে সেইরকমই বলে। নদীকে বলে স্রোতস্বতী। কখনও বলে, তটিনী। প্রবীণরা বলেন, প্রবাহিনী। কখনও কারোকে নদী বলতে শুনলুম না। এখানে এসে প্রথম প্রথম পুরনো অভ্যাসে নদীই বলে ফেলতুম, পরে নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছি।

যেখানে বসে আছি সেটি একটি মনোরম উদ্যান। সুন্দরী অপ্সরাগণ ইতস্তত মনের হরষে বিচরণ করিতেছেন। তবে সেই একই পৃথিবীমার্কা কেস। পুরুষদের পাত্তা দিতে চায় না। একজনকে মনে ধরায় কাছাকাছি গিয়ে একটা কুপ্রস্তাব দিয়েছিলুম। বলেছিলুম, 'চল না, গড়ের মাঠে গিয়ে দু'জনে পাশাপাশি হাতে হাত রেখে বসে দশ-বিশ টাকার চিনেবাদাম খাই।'

প্রসঙ্গত বলে রাখি, পৃথিবীতে যা যা আছে স্বর্গেও তা তা আছে। অবিশ্বাসীর প্রশ্ন হতে পারে, কি করে জানলে বাছা? সোজা উত্তর, আমি স্বর্গে এসে দেখছি। একদম সরাসরি রিপোর্টিং। পৃথিবীতে থাকতে থাকতেই শুনেছিলুম, পৃথিবীটা ব্রহ্মের মায়া। ব্রহ্মা নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্ন দেখে চলেছেন আর পৃথিবীতে বাস্তব হয়ে সেইসব ফুটে উঠছে। কিছু ক্ষণস্থায়ী, কিছু দীর্ঘস্থায়ী। সহজ করে বললে বলতে হবে, পৃথিবীটা একটা জেরক্স কপি। দীর্ঘস্থায়ী আর ক্ষণস্থায়ী বলতে কি বোঝায় একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। ধরা যাক, কলকাতার গড়ের মাঠ। মাঠ আর মনুমেন্ট দীর্ঘস্থায়ী। মনুমেন্টের তলার মানুষ, ভেলপুরিআলা, ফুচকাআলা, আখমাড়াইআলা, ছিনতাইবাজ, তেলমালিশ, প্রেমিক-প্রেমিকা, অগ্নিবর্ষী নেতা— এরা সব ক্ষণস্থায়ী মায়া। আর একটু ক্লিয়ার করতে হলে দোলের সময় রঙ খেলার উপমায় যেতে হবে। কিছু রঙ ধোয়া মাত্রই হাওয়া। এক ধরনের বাঁদুরে রঙ আছে, তিনদিন, চারদিন এমনকি এক সপ্তাহও লেগে যেতে পারে পুরোপুরি উঠতে। কাপড়ের রঙের উপমা দিয়েও বোঝান যায়। জলে পড়া মাত্রই সব রঙ ভর-ভর করে উঠে গেল। বললে, 'ফাস্ট কলার'। আর এক ধরনের রঙ আছে, কাপড় না ছেঁড়া পর্যন্ত থেকে যায়। একে বলে 'পার্মানেন্ট কলার'। প্রত্যেক মানুষ নিজেকে দিয়ে এই ক্ষণমায়া আর দীর্ঘমায়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। এসব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা, তামাসা, ইয়ার্কি একদম চলে না। এটা হল গিয়ে আমাদের অস্তিত্ব, অনস্তিত্বের প্রশ্ন। আমরা সত্য-সত্যই আছি না নেই। খুব মাইন্যুটলি বোঝা দরকার। স্বপ্নে খুব বিরাট একটা বাঘ এসেছিল। ভয়ে পালাতে গিয়ে মশারি-ফশারি ছিঁড়ে মেঝেতে পড়ে গেছি। ঘুম ভেঙে গেছে। এইবার এটাকে ফ্রিজ করে রেখে, বোঝার চেষ্টা করা যাক। বাঘটা স্বপ্ন, খাট থেকে মাটিতে পড়ে আছি এটা কি স্বপ্ন! তেষট্টি নম্বর বাড়ির দোতলায় সত্যশরণ পড়ে আছে, খাটে শুয়ে আছে স্ত্রী, ফুলুৎ-ফুলুৎ নাক ডাকছে, যেন রসে ভেজান দুটো ছোট মাপের লিচু দু-নাকের ফুটোয় অনবরত ওঠা-নামা করছে। ফুলুট বাঁশির

মতো। ফুঁ দিলেই ফুত্। এটি কেমন করে স্বপ্ন হয়। আর কিঞ্চিৎ পরেই ওই নাসিকাদ্বয়ের অধিকারিণী জাগ্রতা হইয়া জগন্মাতা দুর্গার ন্যায় একটা হুঙ্কার ছাড়িবেন, তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ। মহান্ ঘোর গর্জনে...'

না, এটা স্বপ্ন হতে পারে না, এ কখনই মায়া নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব! মেঝেতে যে পড়ে আছে সে বাস্তব, বিছানায় শায়িতা যিনি তিনিও বাস্তব। বৈদান্তিক মায়াবাদী বললেন, 'ধুর্ ব্যাটা! বোকা পাঁঠা! বাঘের স্বপ্ন দেখে খাট থেকে পড়ে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলে বুঝতে পারতে স্বপ্নের ভেতর স্বপ্ন। ঝিনুকের ভেতর মুক্তো, নারকোলের ভেতর জল যেমন। বিরাট একটা স্বপ্নের ভেতর কিছু খুচরো স্বপ্ন আর কি! দাঁড়াও, আরো একটু ক্লিয়ার করে বোঝাই। মানিব্যাগে বড় নোট-ছোট নোট, খুচরোখাচরা। ব্যাগ থেকে রোজ টাকা-পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে। আলু, পটল আসছে। গপাগপ খেয়ে উড়িয়ে দিলে, তখন পয়সাও নেই, আলু-পটলও নেই। স্বপ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাগটা তখনও আছে। এইবার ধর, ব্যাগটা পকেটমার হয়ে গেল! খেল খতম! তুমি একটি স্বপ্ন-ঠাসা স্বপ্ন-ব্যাগ।

দাঁড়াও, আর একভাবে বলি।

মোটামুটি বুঝেছি। যেটুকু বুঝিনি, সেটুকু বাঁচতে বাঁচতে বুঝে যাব।

নাছোড়বান্দা বৈদান্তিক—না হে, হচ্ছে যখন হয়ে যাক। আর একটু চাপালেই সিদ্ধ হয়ে যাবে। ধর, তুমি দেখছ, একটা সাপ আর একটা ব্যাঙ। সাপটা ব্যাঙটার দিকে এগোচ্ছে। এইবার কপ্! সাপ ব্যাঙটাকে গিলে ফেলেছে। কি দেখছ?

'দেখছি ব্যাঙটা নেই, সাপটা লম্বা হয়ে পড়ে আছে, পেটের কাছটা ঢ্যাবলা, ব্যাঙটা অবশ্যই ওই জায়গায় আছে।'

'সে থাক। একটু পরে ওই ফোলাটা থাকবে না।'

'সাপটা কিন্তু রয়েছে। বহাল তবিয়তেই আছে।'

'থাকবে না, আমি এক্ষুনি সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওই দেখ, ঝোপের মধ্যে থেকে একটা তাগড়া বেঁজি বেরিয়ে এল। একটু অপেক্ষা কর। কি দেখছ?'

'সাপে-নেউলে।'

'এইবার কি দেখছ?'

'সাপটা নেউলের পেটে।'

'শুরুটা কি দিয়ে করেছিলে?'

'সাপ আর ব্যাঙ দিয়ে। বেঁজিটা কিন্তু রয়েছে।'

'সে ব্যবস্থাও রয়েছে। ওই দেখ, ব্যাধ।'

'তাহলে সব শেষে কি ব্যাধ! সাপ, ব্যাঙ, বেঁজি মিথ্যা, মায়া, স্বপ্ন, একমাত্র ব্যাধই সত্য।'

'না, ব্যাধের আন্ত্রিক হবে। ব্যাধও মারা যাবে।'

'তাহলে আন্ত্রিক সত্য, বি হেপাটাইটিস সত্য, ক্যানসার সত্য।'

'না। এত করে বোঝাচ্ছি, বুঝছ না কেন! স্বীকার করি, বেদান্ত খুব কঠিন ব্যাপার, তবু অনেকেই তো বুঝেছেন। যা আছে তা নেই হবে একদিন, যা নেই তা আছে হবে একদিন। সত্য যা, তাহল একটি ইরেজার। লেখা হচ্ছে আর মোছা হচ্ছে।'

পৃথিবীতে যা বুঝিনি, স্বর্গে এসে তা একেবারে ক্লিয়ার। জলবৎ তরলং। ক্লিয়ার হত না, যদি না একদিন ঘুরতে ঘুরতে সেই জায়গাটায় গিয়ে পড়তুম। দূর থেকে প্রথমে মনে হয়েছিল কুম্ভমেলা বুঝি। অশান্ত কুম্ভ নয়, শান্ত কুম্ভ! শত সহস্র সন্ন্যাসী চোখ বুজিয়ে ধ্যানস্থ। নট নড়ন-চড়ন। তাঁরা যে স্বর্গোদ্যানে ধ্যানস্থ তার মাঝখানে সুন্দর একটা কাঁচের ঘর। উদ্যানের প্রবেশতোরণে লেখা রয়েছে—ব্রহ্মার নিকেতন = ব্রহ্মনিকেতন। তার তলায় লেখা ইংরেজিতে, ফুললি কম্প্যুটারাইজড। টেকনোলজি ইম্পোর্টেড ফ্রম জাপান অ্যান্ড কন্ট্রোলড বাই জাপানিজ টেকনোলজিস্ট। স্যাটেলাইট কম্যুনিকেশন—কার্টসি ইউ.এস.এ.। সুন্দর কিমোনো পরা শতখানেক জাপানি সুন্দরী, প্রজাপতির মতো উড়ছে।

পৃথিবীতে যে ক' বছর আমি ছিলুম, ধর্ম-কর্ম আমার ধাতে সইত না। বাড়িতে পুজোপাঠ হলে পালিয়ে গিয়ে সিনেমা হলে বসে থাকতুম, হয় জেমস বন্ড, না হয় রগরগে কোনও হিন্দি। মোগলাই আর কষা মেরে বাড়ি ফিরে আসতুম। সিন্নি, দধিকর্মা একেবারে সহ্য হত না। ভোগের খিচুড়ি মন্দ লাগত না। জীবনে একবারই ধর্মসভায় গিয়েছিলুম। বক্তা ইনিয়ে-বিনিয়ে একই কথা দেড়ঘণ্টা ধরে বলে গেলেন; রাজনৈতিক বক্তৃতার মতো, কেন্দ্র আর রাজ্যের বিষাক্ত সম্পর্ক, জীব আর ভগবানের সম্পর্ক। পাশ ফিরলেই ভগবানের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাবে, তবু আমরা জীবন জীবন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কোথায় ভগবান! কত বড় ইডিয়েট আমরা। কত বড় জানোয়ার! আহার, নিদ্রা, মৈথুন, একেবারে কুকুর ব্র্যান্ড। দেড়ঘণ্টা ধরে খুব বকাঝকা করলেন। অনেক আগেই উঠে পড়তুম; কিন্তু ভুল করে বসে পড়েছিলুম সভার মাঝখানে। দেখতে দেখতে দেরাদুন এক্সপ্রেসের সেকেন্ড ক্লাস। যেখানেই পা ফেলবে সেখানেই মানুষ। অতক্ষণ বসে থাকার ফলে পায়ের রক্তচলাচল বন্ধ। দাঁড়ানো মাত্রই থ্যাস। ময়দার লেচির মতো লেদকে গেলুম এবং বিবাহ!

এই দ্যাখ, এই হল বাঙালির প্রবলেম। কোথা থেকে যে কোথায় যাবে, নিজেও জানে না, অন্যেও জানে না। চটিজুতো। পৃথিবীর কোন্ কাজের দেশের মানুষ চটি-জুতো পরে, ন্যাকা-ন্যাকা গলায় বউকে 'শুনচো শুনচো' করে! বলা নেই, কওয়া নেই ছেলে-মেয়ে, বউ, লকস্টক ব্যারেল নিয়ে—এলুম রে বলে অন্যের বাড়িতে গিয়ে অসময়ে হাজির হয়। চোখ কপালে উঠে গেলেও মোটামাথা বুঝতে পারে না। ভাবে আনন্দে চক্ষু ছানাবড়া!

ধর্মসভায় বক্তৃতা শুনছিলুম। পায়ে ঝিনঝিনি। সেখানে বিবাহ্ এল কোথা থেকে?

এল। এসে গেল। থপাস্ করে বসে পড়লুম কোলাব্যাঙের মতো বউয়ের কোলে। মেরে মালাইকারি করে দিত। নেহাৎ দেড় ঘণ্টা ভগবানের প্রেমের আরকে সবাই বিভোর হয়েছিলেন। সেই অবস্থায় বাড়িওলা-ভাড়াটেও কিছুক্ষণের জন্য আয় ভাই কানাই। ট্র্যাফিক পুলিস লরির ড্রাইভারকে বলত, যাঃ, কি করছিস, টাকা পকেটে রাখ, লজেঞ্চুস কিনে খাস রামুয়া।

মেয়েটি কেবল বললে, 'কি হচ্ছে অসভ্যতা। নেমে বসুন, কাতুকুতু লাগছে যে!'

এতকাল কাঠের চেয়ারে বসেছি। সদ্যযুবতীর নরম কোল যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ধর্ম, সন্ন্যাস, বৈরাগ্য, গুহ্য, কাঁকড়া বিছে, মাধুকরী, ব্রহ্ম, ব্রহ্মা সব বরবাদ। অসহায় শিশুর মতো বললুম, 'আমাকে ঝেড়ে চটের ওপর ফেলে দিন, নড়ার ক্ষমতা নেই, আমি ইচ্ছে করে পড়িনি, কোল্যাপস করেছি।'

এত পাজি মেয়ে! পাশেই পিসিমা। কোলের ওপর আমি, ডিক্লেয়ার করে দিলে চিৎকার করে, আমার ভাব হয়েছে। আর আমার কানে কানে বললে, 'বক্তৃতায় তো বৃন্দাবন দেখা গেল না, এইবার পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখাবে, ভাল চাও তো ভাবে চলে যাও, আমিও তোমাতে পড়ে গেছি।'

'পড়ে গেছি', শুনে সত্যিই আমার ভাব এসে গেল। ভগবানের পাওয়ার জানি না, তবে যুবতী যে 'পাওয়ার প্যাক' তৎক্ষণাৎ মালুম। ভগবান হোমিও, বরবর্ণিনী কড়া পেনিসিলিন। তাকেই জিজ্ঞেস করলুম, ফিসফিস করে, 'ভাব কি করে করতে হয়!'

সে বললে, 'উল্টো ভাব!'

'উল্টো মানে? উল্টে গিয়ে ভাব প্রকাশ করব?'

সে বলল, 'গর্দভ।'

কোনও কোনও পরিস্থিতিতে, কোনও কোনও কণ্ঠে এই প্রাণীটি এত মহৎ ও মহনীয়! পনেরো মিনিট আমি তার ক্রোড়াসীন গর্দভ! কোল তো নয়, বেশ জমাট একটি বার্থডে কেক! কে বলেছে, স্প্রিং শুধু সোফাতেই থাকে, এইসব কোলেও থাকে।

সে বললে, 'উল্টো মানে, নিজেকে মেয়ে ভাব। যে সে মেয়ে নয়, স্বয়ং শ্রীরাধিকা। আমাকে ভাব কৃষ্ণ। কৃষ্ণের কোলে রাধিকা, রাধিকার কোলে কৃষ্ণ নয়। চোখ দুটো আধবোজা, সর্বাঙ্গ শিথিল। বিড়বিড় করতে থাক, হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ।'

সবাই বলতে লাগলেন, 'ভাই রে! সনাতন ব্রহ্মচারীর বক্তৃতা। সে কি বিফলে যাবার। চোখের সামনে সব দেখ, সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তারা তা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী

লোকদের টানবার জন্য গৌর-নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন।'

একজন প্রবীণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কি ব্যবস্থা?'

বক্তা বললেন, 'এই যে সামনে, মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল।'

প্রবীণ আশান্বিত হয়ে বললেন, 'আমাদের জন্যেও তো একই প্রেসক্রিপশান!'

বক্তা বললেন, 'একই, তবে সামান্য পরিবর্তন, যুবতী মেয়ের জায়গায় বৃদ্ধা নারীর কোল।'

এক জ্ঞানী বললেন, 'ওই প্রবচনটির রূপক আপনারা ভেদ করতে পারেননি ভাই, মাগুরমাছের ঝোল আর কিছুই নয়, হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই, যুবতী মেয়ে কিনা—পৃথিবী। যুবতী মেয়ের কোল কিনা—ধুলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।'

এক মহিলা, এক একজন মহিলা থাকেন না, সব ব্যাপারে কত্তাত্তি, এত বড় বড় ঢ্যালা ঢ্যালা চোখ বের করে বললেন, 'মেয়েটার কোল থেকে তো এটাকে তুলতে হয়, তা না হলে তো সারা জীবন কোলের খোকাটি হয়ে বসেই থাকবে!'

ওপাশ থেকে এক মহা শয়তান বললে, 'মাইকম্যানকে বল না, কে আর রহমানের বন্দে মাতরম্‌টা চালাতে, আপনি উঠে দাঁড়াবে।'

একগাদা লোকের সামনে আমারও খুব অস্বস্তি হচ্ছে। উঠলেই ওঠা যায়, কিন্তু জানি না, ভাব কি করে ভাঙে! সে কি ঘুম-ভাঙা! হাই তুলে উঠে বসা! হঠাৎ মনে হল, সন্ন্যাসীরাজার উত্তমকুমার। শেষ দৃশ্যটা নকল করলেই তো হয়। ভাবের ঘোরে বলতে হবে, কি বলব! সনাতন ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেছিলেন এই ভাবে, জগতের কল্যাণ হোক, বিশ্বের কল্যাণ হোক, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করুক, অন্ধ ছুঁচে সুতো পরাক। শান্তি, শান্তি, শান্তি।

না, ওভাবে না, আমার থিয়েটারের প্রতিভাটা কাজে লাগাই। একটা কীর্তনের দু'চার লাইন মাথায় আসছে। তেড়ে উঠি, হাউই যে ভাবে হুস্‌ করে ওঠে, তারপর যা হয় হবে। কোলের গরমে মরে যাওয়ার অবস্থা। তড়াক করে লাফিয়ে এই বলতে বলতে সামনে ষাঁড়ের মত ছুট—'ঐ যে, সুরধুনীতীরে ও কে হরি বলে নেচে যায়।' আমি যেন ধরতে ছুটছি। ওঠার সময় পরিষ্কার শুনলুম, মেয়েটি বললে, 'যাঃ শালা, লে হালুয়া!'

কেউ ল্যাং মারল কি না কি হল বুঝতে পারলুম না, ধপাস্‌ করে পড়ে গেলুম। গায়ের ওপর ঠকাস-ঠকাস করে কি সব পড়তে লাগল। প্রথমে ভাবলুম, কোয়ার্টার ডাউন স্টোন চিপস্‌ কেউ মুঠো মুঠো ছুঁড়ছে। মুখের সামনে একটা এসে পড়ল। বাতাসা। হরির লুঠ দিচ্ছে।

পড়ে যাওয়াটা পাবলিক খুব নিলে। ওটা জেনুইন, অভিনয় ছিল না তো। তাই। সেই মেয়েটি ছুটে এসে আমার মাথাটা কোলে তুলে নিতে নিতে বলল,

'মাল'। আমি গানের শেষ দু'লাইনের আগের লাইনটা কান্নার সুরে বললুম, 'সে তো এমনি করে বাঁশি ধরে মজাইত গোপিকায়।'

ওই সমাবেশের মধ্যে থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন ছিটকে। একেবারে কাটা কলাগাছের মতো সপাটে আমার পায়ে! পুরাকালে স্বামীর মৃত্যুর পর যে-নাটক দেখা যেত। সতীলক্ষ্মী আছাড় খাইয়া পতিদেবতার পদযুগলে। আধবোজা চোখে ভাবছি, এইবার লেবড়ে আলতা মাখিয়ে পায়ের ছাপ না তুলে নেয়!

আধঘণ্টার মধ্যে আমি প্রভুতে পরিণত হলুম। ধোলাইয়ের বদলে গলায় গোটা কয়েক গোড়ের মালা। আমাদের রমণীরা বাস্তবিকই কি ভক্তিপরায়ণা। দু-হাত দূরে শালোয়ার-কামিজ পরা এক যৌবনবতী হাঁটু গেড়ে বসে আঝোরে কেঁদে চলেছে। আমার কোলদাত্রী, সর্বাভিজ্ঞা, কানে কানে বললে, 'পিট পিট করে ওর বুকের দিকে তাকাবে না, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।'

ধরেছিল ঠিক। মেয়েদের কি ভগবানদত্ত ক্ষমতা! একবার তাকিয়েই চোখ-সাঁট। রাধাভাব চটকে গিয়ে কৃষ্ণভাব। নারীদের ভয়ঙ্কর অধিকার বোধের পরিচয় তখুনই পেয়ে গেলুম, যখন কানে আবার সতর্কবাণী হল, 'চোখ গেলে দোবো শালা!'

এই শালাটা যে কি মধুর! প্রেম আর আত্মীয়তায় চুর হয়ে থাকা মাতালের মতো! কতরকমের শালা আছে। দাদু আমাকে ছেলেবেলায় আদর করে শালা বলতেন। 'এই শ্যালা এদিকে আয়।' মুখে একটা ডিম-সন্দেশ পুরে দিলেন, সেকালের বিখ্যাত। এটি হল দাদুর শালা। সন্দেশের চেয়েও মধুর। এর সম্পূর্ণ বিপরীত, রাস্তার শালা। 'শালা, মেরে থোবনা ফাটিয়ে দোবো।' শ্বশুরবাড়ির শালা। দুর্গাপুজো আর ভাইফোঁটায় এঁদের সংখ্যা ও অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। লাউ, শশা, কুমড়ো, কাঁঠালের যেমন বিচি, বউয়েব তেমনি শালা। আতার বিচির মতো। সবটাই মুখে পুরতে হয়। সিডলেস আতা হয় না। তবে হ্যাঁ, কাশীর পেয়ারার বিচি কম। সল্টলেকে বিশাল বাড়ির মালিক, উচ্চপদাসীন, পাইপ ঠোঁটে, শালা, শালা নয় শ্যালক। তিনি বোনের খবর অবশ্যই রাখবেন না। এঁরা বউ-অন্ত প্রাণ। তিনি প্রভুর সমান। এঁর যত রোমান্স জাম্পার পরা শালীদের সঙ্গে। চোখে বাদামী রঙের নিকলসন সানগ্লাস পরে কাঁধে কাঁধ ঠেসে ছবি তোলেন। পেছনে মানালির চালচিত্র। মাথার সামনে ইঁদুরের পিঠে খাওয়া টাক, পেছন থেকে চুল টেনে এনে ঢাকার চেষ্টা। বউয়ের কাছে স্বামী ফাংশনাল! ত্রেতায় হাতপাখা, দ্বাপরে ফ্যান, কলিতে কুলার। স্বামী আর টাকা সমার্থ। টাকার টাক থাকলে কিচ্ছু যায় আসে না। সেই একই মানুষ শালীসঙ্গে ডেকরেটিভ। এই হল নরপ্রকৃতি। স্বর্গে স্বর্গবাসী মার্কিনীরা ফোর্ডের টাকায় হিউম্যান স্টাডি-সেন্টার খুলেছে। পৃথিবীর মানুষের নেচার স্টাডি করছে। সে এক এলাহি ব্যাপার।

ভিড়ের মধ্যে এক সাংবাদিক ছিলেন, এক বিদেশী কাগজের স্পিরিচ্যুয়াল রিপোর্টার বা কালামনিস্ট। দিশি কাগজ স্পিরিচ্যুয়াল ব্যাপার ঘৃণায় ত্যাগ করেছে। বোতলের স্পিরিট ছাড়া অন্য স্পিরিটে বিশ্বাস করে না। সাংবাদিক এগিয়ে এসে বিনীতভাবে বললেন, 'জাস্ট টেন মিনিটস সময় দেবেন?'

বিখ্যাত মানুষরা যেভাবে ইন্টারভিউ দেন সেইভাবেই শুরু হল :

প্রশ্ন : আচ্ছা, একসকিউজ মি, আপনি ইচ্ছে করে পড়ে গেলেন, না আপনাকে কেউ ফেলে দিলে?

উত্তর : না, কেউ ফেলে দেয়নি, আমি পড়ে গেছি।

প্রশ্ন : তার মানে ইচ্ছে করে!

উত্তর : আজ্ঞে না, স্বেচ্ছায়।

প্রশ্ন : ইচ্ছা আর স্বেচ্ছায় কি তফাৎ।

উত্তর : ইচ্ছাব মধ্যে একটা মতলব থাকে, একটা পরিকল্পনা থাকে। একটা উদাহরণ দি, ধরুন আমি একটা ইট ছুঁড়ে মারলুম, মাথা ফেটে গেল, ছ'টা স্টিচ। আবার একটা থান ইট ছাতের আলসেতে ছিল, নিচে রাস্তা দিয়ে একটি লোক যাচ্ছিল, হঠাৎ ইটটা তার মাথায় পড়ল, হাসপাতাল। একটায় আমার অসৎ ইচ্ছা, আর একটায় তাঁর ইচ্ছা।

প্রশ্ন : হোয়াট ইউ মিন বাই তাঁর?

উত্তর : সেই বড়কর্তা, যিনি লাট্টুর মতো পৃথিবীটাকে ঘোরাচ্ছেন। চাঁদ, তারা, সূর্য ওঠাচ্ছেন, নামাচ্ছেন।

প্রশ্ন : অর্থাৎ, আপনি এই বলতে চাইছেন, ইটটা যেভাবে আলসে থেকে মাথায় পড়েছিল, আপনি সেইভাবে কোলে পড়েছিলেন। ওই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে ওই ইটটার কোনও পার্থক্য ছিল না!

উত্তর : অবশ্যই ছিল। ইট অচেতন, জড় পদার্থ, আমি জীবন্ত সচেতন প্রাণী। ওই মুহূর্তে আমার মন দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল আর আমার দেহটা মনের হ্যাঙার (hanger) থেকে জামা খুলে পড়ে যাওয়ার মতো ঝপাৎ করে কোলে গিয়ে পড়েছিল। এই দেহ আত্মা পোশাক ভিন্ন আর কিছু নয়। ইংরেজিতে লিখুন, Soul with a body।

প্রশ্ন : যাক, ব্যাপারটা ক্রমশই জটিল হয়ে যাচ্ছে। আমি আপনাকে অন্য প্রশ্ন করছি, কোলে বসে থাকতে আপনার কেমন লাগছিল?

উত্তর : আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন অকেজো। তখন আমার কোনও বোধ ছিল না। আমি বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে, কি ভাসমান—বোঝার উপায় ছিল না।

প্রশ্ন : মেন্টাল প্যারালিসিস! আপনার কি মৃগী আছে?

উত্তর : আজ্ঞে না।

প্রশ্ন : ব্লাড প্রেশার?

উত্তর : নর্মাল।

প্রশ্ন : আগে কখনও এমন হয়েছে?

উত্তর : ভগবানের কথা শুনলেই অল্পস্বল্প আমার হত, আজ একেবারে ভয়ঙ্কর রকমের।

সাংবাদিক বললেন, 'আপনার অনুমতি নিয়ে এঁকে একটি মাত্র প্রশ্ন করব, কোলে নিয়ে আপনার কেমন লাগছিল!'

মেয়েটির সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'মনে হচ্ছিল, ভগবানকে কোলে নিয়ে বসে আছি। অনন্তকাল ওইভাবেই বসে থাকি।'

সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারলুম না। ভগবান ওপর থেকে চিনে লণ্ঠনের মতো পূর্ণিমার চাঁদ ঝুলিয়ে দিয়েছেন। হবি তো হ, বসন্তকাল। একটা কোকিলেরও আমার অবস্থা। ডেকে ডেকে শেষ হয়ে গেল। এমন একটা ছোঁয়াচে বাতাস বইছে, মনে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত কবরের ঢাকনা খুলে প্রেমিক-প্রেমিকারা বেরিয়ে এসেছে। কলকাতার রাস্তা দিয়ে মিছিল করে কেওড়াতলার দিকে চলেছে। শুচ্ছি, উঠছি, বসছি। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। নিচে, নির্জন চওড়া রাস্তা। ওপারে একটা পার্ক। বট্‌ল পাম গাছের ফাঁকে ফাঁকে সরোবরের চাঁদ চিক্‌চিকে জল। মন্থর পায়ে জীবনানন্দের কবিতা হাঁটছে, 'রাতারাতি ঘুম ফেঁসে যায়/আমারো চোখের ঘুম খসেছিল, হায়,/বসন্তের দেশে/জীবনের-যৌবনের! —আমি জেগে, —ঘুমন্ত শুয়ে সে!'

বালিশ থেকে মাথা তুলে মা বললেন, 'কালই তুলিয়ে আয়, এ কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। লবঙ্গতেল নেই?'

'আছে মা।'

'তুলোয় করে একটু গুঁজে দে না। হবে না কিছুই, তবু। দন্তশূলের দাওয়াই উৎপাটন!'

মা ভেবেছেন, আমার সেই পুরনো দাঁতের যন্ত্রণা আবার শুরু হয়েছে। কোনও যন্ত্রণাই আমার সহ্য হয় না। দাঁতের যন্ত্রণা একেবারেই নয়। মায়ের কাছেই শুনেছি, আর একটি অনুরূপ যন্ত্রণা—গর্ভযন্ত্রণা। আমারই কারণে মা যা পেয়েছিলেন।

একই বড় ঘরে এপাশে, ওপাশে দুটো বিছানা। একটাতে আমি, একটাতে মা। এই ঘরটা ছিল বাবার। নামী ডাক্তার ছিলেন। শল্য চিকিৎসক। হঠাৎ একদিন সকালে চা খেতে খেতে, আমাদের সঙ্গে রসিকতা করতে করতে হঠাৎ চলে গেলেন। শেষ কথাটা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। শব্দটা ছিল, 'ব্যা'। ওটা আজও আমার কাছে একটা ধাঁধা। অনেককে জিজ্ঞেস করেছি। পণ্ডিতরা বলেছিলেন, তোমাকে ব্যাকরণ পড়তে বলেছিলেন। আর একদল বললেন, মৃত্যুর চোখে সব মানুষই ছাগল। ধরলেই ব্যা ব্যা। তোমার বাবা একটা মাত্র ব্যা বলে বেরিয়ে গেলেন। আমি একটা ফার্মে আর্টিকল ক্লার্ক। সেখানে নিত্য শিল্পপতি আর

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা হত। তাঁরা বলেছিলেন, তোমার বাবা বলে গেলেন, ব্যবসা কর। অনেকদিন পরে মাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। মা বলেছিলেন, ওটা আমাকে বলে গেছেন, সুধাময়ী ব্যবহারটা ভাল কর। এই বহুতল স্বর্গের কোথায় তিনি আছেন, অনুসন্ধানেই অনেকটা সময় গেল। স্বর্গের অনুসন্ধান বিভাগেও বিশাল বিশাল কম্পিউটার। একটি আমেরিকান মেয়ে আমাকে খুব সাহায্য করেছিল। মেয়েটি রজনীশের আশ্রমে দীর্ঘকাল ঈশ্বরের অনুসন্ধানে ছিল। প্রাণায়ামে বসে কুম্ভক করে দম নিতে ভুলে গিয়েছিল। ভীষণ ভুলো স্বভাবের মেয়ে। সেই কুম্ভক আটকে সোজা স্বর্গে। কয়েকদিন আগেই স্বর্গের সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরিয়েছে। পাপ-পুণ্য খতিয়ে দেখে স্বয়ং ভোলা মহেশ্বর রায় দিয়েছেন, ও ওঙ্কারে চেপে স্বর্গে এসেছে। ওর আর পুনর্জন্ম হবে না। সেই মেয়েটি কম্পিউটার ঘাঁটাঘাঁটি করে বললে, আই অ্যাম সরি। ইওর এক্সফাদার জাস্ট নাও আয়ারল্যান্ডে এক বিপ্লবীর ঘরে জন্মালেন, স্ক্রিনে ছবিটা দেখ। হেসে ফেললুম, বাবার কি অবস্থা! অতবড় একজন শল্য চিকিৎসক! সদ্যোজাত শিশুটি। লাল একটা পোকার মতো শরীর। এক সুন্দরী সিস্টার এক হাতে দুটো পা ধরে শিশুটিকে ঝুলিয়ে দোলাচ্ছেন আর ছোট্ট নিতম্বে চাপড় মারছেন। মাতৃগর্ভে শিশুর ফুসফুস দুটো তো বেলুনের মতো চুপসে থাকে, সে দুটোকে এইভাবে ফোলাতে হয়। ওঁয়া ওঁয়া করে না-কাঁদা পর্যন্ত নিস্তার নেই। বাবার এ-পক্ষের মা'টি ভারি সুন্দরী। এক মাথা সোনালি চুল, মিষ্টি মুখ।

ব্যা বলতে ঠিক কি বুঝিয়েছিলেন জানা হল না। স্বর্গে এসে একটা মজা হয়েছে, ইচ্ছে মাত্রই অতীতে চলে যেতে পারছি। আম থেকে আঁটি বেরিয়ে যাওয়ার মতো আমাব বেঁচে থাকাটা বেরিয়ে গেছে। মা জেগে আছেন দেখে বারান্দা থেকে ঘরে এসে মায়ের পাশে বিছানায় বসলুম। মা শুয়ে আছেন। শরীর খুব ভাল যাচ্ছে না। আমার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'লাগালি না। দে না একটু তুলো গুঁজে।'

ইতস্তত করে বললুম, 'মা, দাঁত নয়, আমি আজ পড়ে গেছি।'

মা ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, 'কোথায়! কখন পড়লি? খুব লেগেছে?'

'ভীষণ যন্ত্রণা মা!'

'কি করে পড়লি?'

'দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেলুম!'

'শক্ত জায়গায়?'

'না, স্পঞ্জের মতো নরম, কোলে।'

'কার কোলে?'

মা'কে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা গুঁজে বললুম, 'মা, আমি প্রেমে পড়ে গেছি।'

মা নীরবে গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। বেশ বুঝলুম আমার বৃদ্ধা মায়ের হাত কাঁপছে। মা আর ছেলের সংসারে তৃতীয় চরিত্রের প্রবেশে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, এই হয়তো ভাবছেন। কর্তৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। ছেলে পর হয়ে যাবে।

জিজ্ঞেস করলেন, 'বিয়ে করবি?'

'তুমি যদি অনুমতি দাও!'

'মেয়েটি কেমন, আধুনিকা?'

'না, দেখলে তোমার ভালই লাগবে।'

ফোন বেজে উঠল। এই গভীর রাতে কার আবার কি হল! ফোনটা বাবার নামে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে এক-একটা ফোন আসে, ডাক্তারবাবু কি ঘুমোচ্ছেন? রিসিভার তুললুম—হ্যালো! সাড়াশব্দ নেই, লাইনে কেউ একজন আছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের দীর্ঘ শব্দ। —হ্যালো! কোনও সাড়া নেই। —হ্যালো! এইবার ভারি মিষ্টি একটি নারীকণ্ঠ—ঘুমোতে পারছি না। আমার কাছে চলে এস। বিছানায় চাঁদের আলো।

লাইন ছেড়ে দিল। ডায়াল টোনে কুলকুচোর শব্দ। ভালই করেছে। মায়ের সামনে কথা বলতে পারতুম না। এইটুকু শুনেই শরীরে পিপারমিন্টের স্রোত।

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

'ঘোস্ট কল।'

মা বললেন, 'মেয়েটি যদি ভাল হয়, তাহলে বিয়েটা তাড়াতাড়ি করে ফেল! বাড়িটা খুব ফাঁকা হয়ে গেছে।'

আমার বাবার গাড়িটা গ্যারেজে রয়েছে। একবার ভাবা হয়েছিল বিক্রি করে দেওয়া হোক। পরে মা বললেন, গাড়িটা রাখার মতো রোজগার বাড়াও। আমার মা যেমন বাবাকে চালাতেন, সেইরকম আমাকেও চালাতেন। মায়ের অভিধানে 'হার' শব্দটা নেই। শেষ রাত। মা গভীর ঘুমে। পা টিপে টিপে টেলিফোনের কাছে গেলুম।

সে-ই ধরেছে। বোধহয় আশা করেছিল ফোন আসবে।

'শোনো, চাঁদ এখনও রয়েছে আকাশে। বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাক। দশ থেকে পনের মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।' রোজই আমি মর্নিং-ওয়াকে যাই, আজ না হয় এক ঘণ্টা আগে মর্নিং-ড্রাইভে যাচ্ছি। প্রতিদিনই মা আমার পরে ওঠেন। বেড়িয়ে এসে দু'জনে একসঙ্গে চা খাই গল্প করতে করতে। ছেড়ে আসা জীবনটা আমার খুব সুখেরই ছিল। সবই আমার মায়ের কৃপা!

শেষ রাতে প্রস্ফুটিত যুবতীদের কুঞ্জ থেকে নির্গত শ্রীরাধিকার মতো দেখায়। বিরহমাখা, রাতলাগা মুখ। ভাবতেই পারেনি, আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে আসব। ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে উৎকণ্ঠিত মুখে সে দাঁড়িয়ে আছে। একবার এদিকে

তাকাচ্ছে, একবার ওদিকে। ল্যাম্পপোস্টের বাসি আলোয় চূর্ণ চুল চিকচিক করছে। রাজপথে কোনও পথচারী নেই। দর্জির ফিতের মতো লম্বা পড়ে আছে। হঠাৎ গাড়িটা থামায় চমকে গেছে। একটা হাত বাড়িয়ে খপ্ করে ডানহাতটা চেপে ধরতেই ভেবেছে কোনও বদমাইশ। যেই দেখেছে, আমি, সঙ্গে সঙ্গে সেই উক্তি, 'শালা'!

গাড়ি চলেছে প্রিন্সেপ-এর দিকে। ভোরের গোলাপি আকাশের গায়ে গেরুয়া গঙ্গা দেখব। একা নয়। দু'জনে দেখব। হাতে হাত রাখব। আঙুল নিয়ে খেলা করব। কাঁধে শিথিল হাত রাখব! খোঁপার ঘর্ষণ। মণিবন্ধে ঘড়ির টিক্-টিক্। সময় চলিয়া যায়।

জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার এই অনবদ্য শালাটি কোথা থেকে পেলে!'

গম্ভীর গলায় বললে, 'নিজস্ব।'

আমার পৃথিবী, আমার আকাশ, গঙ্গা, আমার প্রেমিকা, আমার ঘড়ি—সব পড়ে আছে ওই সবুজ গ্রহে। এখান থেকে কিছুই দেখা যায় না। শেষ রাতের স্বপ্নের মতো। কিছু মনে পড়ে, কিছু মনে পড়ে না। আমার ঘুম ভেঙে গেছে। আমার হাতঘড়ি খুলে পড়ে গেছে।

সাধু-সমাবেশে বোকার মতো দাঁড়িয়ে। বোকা বললে ঠিক হবে না। পৃথিবীর বাংলা অভিধানে একটি শব্দ আছে, বিমূঢ়। আমার সেই অবস্থা। সেখানে আমার সুখ ছিল, দুঃখ ছিল। খেলনা নিয়ে খেলা ছিল। থালা-বাটি-জামা-জুতো। মার্কেটিং, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন। আমাদের একটা ছেলে হল। হয়েই মারা গেল। আমার বউ স্বাগতার সেই মুহূর্তটা স্বপ্ন হলেও যেন চিরবাস্তব। জলভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'যাঃ শালা, হয়েই মরে গেল'! যেন দেশলাই কাঠি, জ্বলেই নিভে গেল।

কাঁচের চার চৌকো। ভেতরে কেউ নেই। ঘর আছে বাসিন্দা নেই। অথচ লেখা রয়েছে ব্রহ্মানিলয়। তিনি কোথায়! মহিলা জাপানি টেকনোলজিস্ট দুঃখের গলায় বললেন, ভারত থেকে এলে, অথচ শূন্যের ধারণা নেই তোমার! ব্রহ্ম ইজ জিরো। একটা গোল শূন্য। একের পরে পরে শূন্য বসাও, লক্ষ, কোটি, কোটি কোটি। একটা মুছে দাও সব শূন্য। একটা বসিয়ে দাও আবার সব পরিপূর্ণ।

প্রশ্ন করলুম, 'একটা কোথা থেকে পাচ্ছেন মশাই?'

পেছন থেকে খুব পরিচিত গলায় কে বললে, 'গর্দভ শালা! ওই একটাই তো ভগবান! ভগবানকে তুলে নাও, সব শূন্য, ভগবানকে বসিয়ে দাও, সব পরিপূর্ণ।'

আনন্দে আমার চিৎকার, 'তুমি!!'

স্বাগতা বললে, 'আরে এই মাত্র এলুম।'

'কিসে করে এলে?'

'বি হেপাটাইটিসে এলুম।'

'ক'দিন লাগল?'

'পৃথিবীর হিসেবে দিন পনের।'

'আমার বাহনটা দ্রুত ছিল। বারো ঘণ্টায় এসে গেছি।'

স্বাগতা হাসতে হাসতে বললে, 'তুমি আর কথা বোলো না। তুমি যেভাবে এলে, ওর চেয়ে অগৌরবের আসা আর কি হতে পাবে! ওটা একটা মৃত্যু! ওটাকে বলে, কেলেঙ্কারি!'

জাপানি মেয়েটি হাসি-হাসি মুখে আমাদের উচ্ছ্বাস দেখছিল, প্রশ্ন করলে, 'লাভার্স?'

উত্তর দিলুম, 'লাভার্স তো বটেই, হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। স্বামী-স্ত্রী।'

সে অবাক হয়ে বললে, 'বিয়ের পরেও এত প্রেম!'

স্বাগতা বললে, 'ওইটাই যে আমরা সেধেছি ম্যাডাম।'

ম্যাডাম বললে, 'তাহলে তোমরা এই ব্রহ্ম ডিভিসানে বেশিক্ষণ থেকো না। দেখেছ, এখানে কারা ধ্যানে বসে আছেন, কপিল, শঙ্করাচার্য, গৌতম বুদ্ধ। তোমরা প্রেম ডিভিসানে চলে যাও। ওটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ডিপার্টমেন্ট। ওখানে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রয়েছেন, রয়েছেন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য, বৃন্দাবনের গোপীরা রয়েছে।'

আমি বললুম, 'আর তো এদিকে আসা হবে না, সুযোগ যখন এসেছে ব্রহ্মটা বুঝেই যাই। পৃথিবীতে এইরকম বলে, সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে একমাত্র ব্রহ্মই বাদ। ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না। বর্ণনাতীত। আদি, অন্তহীন একটা বিশ্রী, ভীতিপ্রদ ব্যাপার।'

জাপানী এক্সপার্ট বললেন, 'কম্পিউটার আসার আগে পর্যন্ত সেইরকমই ছিল। এখন কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, এই হেডফোনটা কানে দাও।'

অদ্ভুত একটা শব্দ। মনে হচ্ছে, মেঘের নাক ডাকছে, অথবা নাকে মেঘ ডাকছে! এইটাই হল প্রণব, এইটাই সেই ওঙ্কার। বিশ্বব্যাপী যে-ধ্বনি অনবরত উঠছে। সিদ্ধ সাধক যন্ত্র ছাড়াই শুনতে পান। পৃথিবীতে এইরকমই শুনে এসেছি। সাধারণ মানুষের নাক ডাকে। ব্রহ্মবিদ সিদ্ধ হলে নাকের বদলে নাভি ডাকে। সেখান থেকে অনবরত ওঙ্কার ধ্বনি উঠতে থাকে। একে বলে, কসমিক সাউন্ড, মিউজিক অফ দি স্ফিয়ারস। বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের অস্তিত্বের এইটি একটি নির্ভুল প্রমাণ। সামনের একটা স্ক্রিনে আলোর বিন্দু, আলোর ঝরনা, আলোর ছোট-বড় ঢেউ, আলোর সরলরেখা, আলোর বিস্ফোরণ। একটা তাণ্ডব চলেছে। এইটা হল ইচ্ছার তরঙ্গ। সৃষ্টির পেছনে কাজ করছে এই ইচ্ছা আর চৈতন্য। এর কোনও শরীর নেই। এর উপস্থিতি সর্বত্র। দৃশ্য, অদৃশ্য জগৎ এর মধ্যেই রয়েছে। জার আছে। এই যে আলোর বিন্দু, ফুটছে, নিভছে, এ হল জন্ম-মৃত্যু। এর সব কিছুর মধ্যে একটা করে কোড আছে, আমরা সেগুলো ডিকোড করার চেষ্টা করছি।'

'তাহলে আমরা প্রেমের দিকে যাই।'

'যাওয়ার আগে আমার জানতে ইচ্ছে করছে, তুমি কি ভাবে এলে! তোমার

বউ হাসাহাসি করছিল। এটা নারীর চিরকালীন কৌতূহল!'

'ও তো হাসবেই। ওর জন্যেই তো আমাকে মরতে হল। আমরা দু'জনে মাকে নিয়ে কাশী গেছি। চলে আসার আগের দিন ওনার ইচ্ছে হল, কাশীর বিখ্যাত মালাই খাবেন। বেশ খাও, নিয়ে এলুম মালাই।'

স্বাগতা হই হই করে বললে, 'এবার তুমি চুপ কর, আমাকে বলতে দাও।'

'বেশ, বল।'

স্বাগতা বলতে লাগল, 'দিদি, আমি বারবার সাবধান করছি, দেখ বাঙালির পেট, অসাধারণ অপূর্ব করতে করতে অতটা খেয়ো না, সহ্য হবে না। বিজ্ঞের মতো বলল, আমি তো পশ্চিমবাংলায় বসে খাচ্ছি না, খাচ্ছি কাশীতে। জলের গুণে সব হজম হয়ে যাবে। সত্যিই তাই, মানুষটাই হজম হয়ে গেল। রাত বারোটা থেকে শুরু হল। ভোরবেলা অক্কা। বারাণসী থেকে সোজা বাবার বাহনের লেজ ধরে এখানে।'

'তুমি হাসছ! তোমার দুঃখ হয়নি?'

'আমি তো গাধাটাকে এখানে দেখে হাসছি। সরি!'

'ও তোমার ভালবাসার গাধা।'

'আমার জীবনটা শেষ করে দিয়ে এখানে চলে এসেছে, আবার দাঁত বের করে হাসি হচ্ছে!'

জাপানি এক্সপার্ট হাসতে হাসতে বললে, 'সো সুইট! আমি ভাবছি, তোমাদের দুজনের নাম স্পনসর করব।'

'কোথায়?'

'আমাদের ডিভাইন ক্লাবে, আদর্শ দম্পতি হিসেবে!'

স্বাগতা উৎসাহিত হয়ে বললে, 'কি কি দেবে? কালার টিভি! দু'হাজার পি এম পি-ও জাপানি মিউজিক সিস্টেম! টুইন টাব ওয়াশিং মেশিন। মরিসাসে ভ্রমণের ফ্রি ব্যবস্থা।'

ভদ্রমহিলা হা-হা করে হেসে বললে, 'সবে এসেছ তো! তাই এখনও পৃথিবীতেই পড়ে আছ। পুরোটা গুটিয়ে আনতে পারনি! ডিভাইন ক্লাবের সদস্য হলে তোমরা ভগবানের পার্ষদ হতে পারবে, দু-বেলা তাঁর দেখা পাবে। ওই কাউন্সিলের এক্সজিকিউটিভ কমিটিতে কারা আছেন জান—জেসাস ক্রাইস্ট, শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, সন্ততুকারাম, মীরাবাঈ।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা নদীর তীরে এসে হাজির। একজন লাল একটা গামছা দিয়ে মাছ ধরছিলেন। খুব চেনা চেনা মনে হল। স্বাগতা বললে, 'কি গো, চিনতে পারছ না। আমাদের ঠাকুর। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।'

'নদীটার নাম কী?'

'এই তো সেই বৈতরণী। এইটা পেরিয়ে স্বর্গে আসতে হয়। লেখাপড়া কিসুই

করনি।'

'আরে, আমি তো জানি, পঞ্চপাণ্ডবরা যে পথে মহাপ্রস্থান করেছিলেন সেইটাই পথ!'

'তোমার মাথা। ওঁরা পথ ভুল করে কাবুলে চলে গিয়েছিলেন, ওই জন্যে দেখছ না কাবুলে চির কুরুক্ষেত্র।'

'তা বটে! শোনো স্বাগতা, আমার অনেকদিনের ইচ্ছে, ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলব।'

'বল না।'

'কি বলব?'

'বল, স্বামীজির বাড়ি মঠ নিয়েছে। শুনলে খুশি হবেন।'

আমি খুব কাছে গিয়ে ভক্তি করে বললুম, 'ঠাকুর প্রণাম নেবেন। স্বামীজির বাড়ি...।'

আমাদের দিকে তাকিয়ে অমলিন হেসে বললেন, 'নরেনের বাড়ি তো মানুষের হৃদয়! দশ-বিশ কাঠা জমির ওপর ইটের পাঁজা নরেনের বাড়ি হতে যাবে কোন্ দুঃখে। দূর শালা! তোদের আসল প্রশ্ন, আমি কি ধরছি! শোন, আমি ধরছি না, ধরে ছাড়ছি। দুঃখ ছেঁকে তুলে নিয়ে আনন্দ ঢুকিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি। বদ্ধগুলোকে মুক্ত করে দিচ্ছি। আমার এই গামছাটা দিয়ে রগড়ে রগড়ে চান করিয়ে দিচ্ছি। পৃথিবীতেও আমার এই কাজই ছিল, এখানে রামপ্রসাদকেও সঙ্গে পেয়েছি। গিরিশ ডিরেক্টর।'

আমরা প্রণাম করে সরে এলুম!

স্বর্গে একটাই অসুবিধে, এখানে অন্ধকার নেই, দুঃখ নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, রাজনীতি নেই, সংসার নেই, ডেলি-প্যাসেঞ্জার নেই, নার্সিং হোম, হাসপাতাল নেই! পৃথিবীর মানুষগুলো এপারে আসামাত্রই রামকৃষ্ণ গামছা দিয়ে রগড়ে পারে তুলে দিচ্ছেন।

আমরা একটা গাছতলায় বসেছি। এখানে শ্রম নেই, বিশ্রামও নেই। এমনি বসে আছি। হঠাৎ দেখি, সেই অপ্সরা, হাতে বিশাল একটা ব্যাগ। পাশে এসে বসল পা ছড়িয়ে। ঝোলাতে প্রচুর চিনেবাদাম। সেই যে সকালে বলেছিলুম, চিনেবাদাম খাওয়ার কথা। এখানে অবশ্য সবসময়েই সকাল। দিন-রাতের হিসেব এলেই জ্যোতিষ, জ্যোতিষী, গ্রহরত্নম এসে পড়বে। কাগজে 'আজকের দিনটি কেমন যাবে', পড়তে ইচ্ছে করবে।

স্বাগতা বললে, 'তোমাকে ভীষণ চেনা লাগছে, কোথায় দেখেছি বল তো!'

'পৃথিবীতে আমার অনেক ছবি আছে। ওখানে আমার নাম ছিল, সেন্ট মেরি।'

আমার চোখ প্রায় কপালে ওঠে আর কি! কাকে কি বলেছি তখন। একটাই বাঁচোয়া, এখানে কাম নেই। এখানে আছে প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান। স্বর্গটা যেন মলাট-

খোলা গীতা! সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করলুম। প্রণাম করা মাত্রই গির্জার ঘণ্টা, অরগ্যান সব বেজে উঠল। কোথায় বাজছে!

সেন্ট আমাদের বিস্ময় দেখে বললেন, 'আমার ভেতরে বাজছে। আমিই চার্চ। মহাপ্রভুকে প্রণাম করলে, খোল, করতাল, কীর্তন শুনতে পাবে। রামপ্রসাদকে প্রণাম করলেই রামপ্রসাদী।'

স্বাগতা সেন্ট মেরির হাত দুটো ধরে বললে, 'মাতাজী! আমার ছেলেটাকে এখানে খুঁজে দিতে পার মা! জন্মাল আর কোল খালি করে চলে এল। আমার একমাত্র ছেলে।'

সেন্ট বললেন, 'তুমি কাঁদার চেষ্টা করছ! পারবে না, আমাদের কান্নাটা পৃথিবীতেই পড়ে আছে। যীশুর যন্ত্রণা পৃথিবীতেই পড়ে আছে ক্রুশ হয়ে। গৌতমের দুঃখ পৃথিবীতেই পড়ে আছে স্তূপ হয়ে। তোমার ছেলে! আচ্ছা, চলো গাছের কাছে যাই, কল্পবৃক্ষ। যা চাইবে, তাই পাবে। তার তলায় তোমরা বসে শুধু ইচ্ছা করবে। সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে তোমাদের ছেলে।'

মোটা গুঁড়িওলা সুন্দর একটা গাছ। অদ্ভুত ধরনের পাতা, যেন হাসি-হাসি এক দেবতা, শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে রয়েছেন। আমরা ভয়ে ভয়ে তার তলায় বসে যেই ইচ্ছে করেছি :

সুন্দর চেহারার এক যুবক, পরিধানে দামী পোশাক, হাতে বিলিতি ব্রিফ কেস, সামনে দাঁড়িয়ে। আমরা ঘাবড়ে গিয়ে দুজনে একইসঙ্গে প্রশ্ন করলুম, 'কোথা থেকে এলে বাবা!'

'ফ্রম ন্যুইয়র্ক।'

'অ্যাঁ, সে কি, তোমার তো এখানে থাকার কথা।'

'সো আই ওয়াজ দেয়ার। নাও আই অ্যাম হিয়ার। হোয়্যার ইজ দিস প্লেস!'

'দিস ইজ ইন হেভন বাবা।'

'মাই গড! আমি স্টক এক্সচেঞ্জে যাব বলে ড্রাইভ করছিলুম অ্যান্ড এ ক্র্যাশ, অ্যান্ড আই অ্যাম ইন হেভেন। দ্যাট ইজ আই এম ডেড দেয়ার!'

স্বাগতার সেই বিখ্যাত উক্তি, 'যাঃ শালা!'

সেন্ট মেরির মুখে অপূর্ব সেই হাসি, যা আমরা পৃথিবীর ছবিতে দেখি। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'ছেলে কোথায় হয়েছিল?'

'কলকাতায়।'

'ওখানে এইরকম ম্যাজিক হতে পারে, মরা ছেলে দেখিয়ে জ্যান্ত ছেলে অন্যহাতে পাচার!'

স্বাগতা বললে, 'যাঃ শালা, নিজের জ্যান্ত ছেলেটাকে এবার সত্যি-সত্যিই মেরে ফেললুম।'

মেরি মাতা বললেন, 'উঠে এস, উঠে এস, সাংঘাতিক গাছ। যা ইচ্ছে করবে

তাই হবে।'

আমি বললুম, 'স্বাগতা ওরা একা একা পৃথিবীতে পড়ে আছে, আমার মা, তোমার বাবা, তুলে আনলে হয় না!'

স্বাগতা দুষ্টু-দুষ্টু হেসে বললে, 'তাঁরা ভীষণ আনন্দে আছে। আমি দুজনের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।'

এইবার আমার বলার পালা, 'যাঃ শালা!!'

হাতের প্যাঁচ

ছোট, মাঝারি, বড়, কি গল্প আপনি চান বলুন, পেশাদাব কলম ঠিক নামিয়ে দেবে। কত স্লিপ? আজকাল তো আর সাহিত্য নেই, আছে স্লিপ। সম্পাদক মহাশয়রা আজকাল আর লেখা চান না। লেখা আজকাল আবার একসঙ্গে আসে না। বড় বড় লেখকরা স্লিপ দিতে থাকেন। সম্পাদক মহাশয়রা প্রশ্ন করেন, 'কাল ক'স্লিপ দিচ্ছেন! অন্তত পাঁচ স্লিপ দিন।' সাহিত্যের জগতে আর ফলপাকড়ের জগতে বিপ্লব ঘটে গেছে। আগে আম বিক্রি হত টাকায় পাঁচটা হিসেবে। এখন পনের টাকা কিলো। লিচু বিক্রি হত শ' দরে। লিচুরও এখন কিলো। যুগ পালটে গেছে।

আমি একটা বড় গল্প লেখার বায়না পেয়েছি। চল্লিশ স্লিপ। তার কম বা বেশি নয়। সেদিন সরকারি অফিসে লিফটে উঠেছিলুম। দেখি লেখা রয়েছে সিকস্টিন পার্সনস। প্রশ্ন জাগল, হাতির মতো চেহারার ষোল জন উঠলে কি হবে! নির্দেশ অনুসারে তো ষোলজনই হল। চল্লিশ স্লিপে যদি চল্লিশ হাজার শব্দ হয়ে যায়। সে তো তাহলে উপন্যাসই হয়ে গেল!

বড় গল্প কাকে বলে আমি জানি না। ছোট গল্পকে টেনে বাড়ালেই মনে হয় বড় গল্প হয়। আউর থোরা হেঁইয়ো, বড় গল্প হইল। উপন্যাস-উপন্যাস একটা ভাব থাকবে। যেমন শীত-শীত ভাব। ছুঁচো আর হাতি। ছুঁচো দেখে এক পণ্ডিত বলেছিলেন, এ হল রাজার হাতি, না খেয়ে খেয়ে এই রকম হয়ে গেছে। আর হাতি দেখে বলেছিলেন, এ ব্যাটা রাজার ছুঁচো, খেয়ে খেয়ে অমন হয়েছে। ছোট গল্প আর বড় গল্প। একই ব্যাপার।

কি গল্প লেখা হবে! প্রেমের গল্প। বিচ্ছিন্নতার গল্প! হতাশার গল্প! রাজনৈতিক গল্প! নাকি ভূতের গল্প! প্রেমের গল্পই চেষ্টা করা যাক। গল্প আর রান্না একেবারে এক জিনিস। নানা উপাদান। নানা মশলা। তারপর আগুনে চাপিয়ে নাড়াচাড়া। যাকে বলে হেলুনি মারা। বা কষা। মাংস যত কষবে ততই তার প্রাণমাতানো গন্ধ বেরোবে। এক-এক রান্নার এক-এক উপাদান। প্রেমের গল্পের প্রধান উপাদান হল, একজন প্রেমিক আর একজন প্রেমিকা। যেমন ডিমের কারির প্রধান উপাদান হল, ডিম আর পেঁয়াজ। মাংসের কালিয়ার প্রধান উপাদান হল, মাংস আর আলু।

একজন প্রেমিক আর একজন প্রেমিকা। যেন আলু আর পটল, ভাসছে জলে। জল হল সমাজ। এরপর মশলা চাই। তেল চাই, নুন চাই। তা না হলে, তরকারি না হয়ে হয়ে যাবে আলু সেদ্ধ, পটল সেদ্ধ। শুধু প্রেমিক প্রেমিকাকে নিয়ে কত দূর যাওয়া যায়। কত কথাই বা বলানো যায়। মিতালি, আমি তোমাকে ভালবাসি। সোমেন, আমি তোমাকে ভালবাসি। এ ভাবে বেশিক্ষণ চালানো যায় না। তা ছাড়া একালের প্রেমে ভালবাসা শব্দটাই উচ্চারিত হয় না। ন্যাকা ন্যাকা শোনায়। অ্যাকশনের যুগ। ধর তক্তা, মার পেরেকের যুগ।

মধ্যযুগের প্রেমে, অনেক হিলি হিলি বিলি বিলি কাণ্ড হত। পাতার পর পাতা কবিতা। ফুল। কোকিলের ডাক। চাঁদ। সরোবর। বাতাস। দীর্ঘশ্বাস। মধ্যযুগের প্রেমে বিরহের ভাগ ছিল বেশি। কারণ, তখন ফ্রি মিক্সিং ছিল না। প্রেমিক আর প্রেমিকায় মুখোমুখি দেখা হওয়ার উপায় ছিল না। বারান্দায় প্রেমিকা, ল্যাম্পপোস্টের তলায় প্রেমিক। যমুনায় জল ভরতে চলেছেন প্রেমিকা, গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন প্রেমিক। নিশি জাগছেন রাই, কবি গাইছেন, তুমি যার আসার আশায় আছো, তার আসার আশা নাই। নট-ঘট শ্যামরায় চলিল আজ মথুরায়। প্রেমের এই ফোঁসফোঁসানি একালে অচল। দেহাতীত প্রেম কেউ বিশ্বাস করবে না। সমালোচকরা তুলো ধুনে দেবেন। প্রেমের সঙ্গে সেক্স চাই-ই চাই! রূপ বর্ণনায় এখন কবিতাও হয় না। গদ্য-সাহিত্য তো দূরের কথা। 'চুল তার কবেকার'—একটা সময় পর্যন্ত বেশ ছিল। এখন খোলাখুলির যুগ। একালের সিনেমায় জোড়া ঠোঁটের মাঝখানে আর যোজন তিনেকের ব্যবধান থাকে না। চুম্বক আর লোহা-সম কাছাকাছি হওয়া মাত্রই টানাটানি। জোড়াজুড়ি।

আমার উপাদান আমি গুছিয়ে ফেলি। বেকার প্রেমিক, বেকার প্রেমিকা। প্রেমিকের পিতার কারখানায় চলেছে লাগাতার ধর্মঘট। মা বাতের রুগী। যত না কাজ করেন, কোঁত পাড়েন তার চেয়ে বেশি। আর সূর্য ওঠা থেকে, মশারিতে ঢোকা পর্যন্ত ঝগড়া করেন প্রাণ খুলে। প্রেমিকের একজন অবিবাহিতা বোন থাকবে। যুবতী। ম্যাগনাম স্বাস্থ্যের অধিকারী। পথে বেরনোমাত্রই দশ-বিশটা নানা চেহারার, নানা পোশাকের ছেলে পেছন পেছন চলতে থাকে। লেজের বদলে রুমাল নাড়ে। প্রেমিক ভাড়া থাকবে দু-কামরার একটি বাড়িতে। একটি ঘর বড়। একটি ঘর ছোট। বাথরুম কমন। সব লেখকই আশা করেন, তাঁর গল্প নিয়ে সিনেমা হোক। কোনও ভাল পরিচালকের হাতে পড়ুক। কাহিনীটিকে প্রথম থেকেই সেই কারণে ক্যামেরার চোখে দেখতে হবে। সিনারিয়ো করতে করতে এগোতে হবে। সামান্য বাম-বাম ভাব থাকা চাই। ক্যাপিট্যালিস্ট প্রেম নিয়ে হিন্দি বাণিজ্যিক ছায়াছবি হতে পারে। তাতে পয়সা আছে, সম্মান নেই।

আমার এই কাহিনী যখন মুভি-ক্যামেরা ধরবে, তখন শুরুর শটটা হবে এইরকম :

ধোঁয়া। ভলকে ভলকে ধোঁয়া। আকাশে উঠে এলো। চুলের মতো খুলে খুলে যাচ্ছে। নরম ধোঁয়া। মধ্যবিত্ত ধোঁয়া। মারোয়াড়ির বেআইনি গুদামে আগুন-লাগা ধোঁয়া নয়। কয়েক জোড়া উনুনের ধোঁয়া একসঙ্গে আকাশে উঠছে। সেই আকাশে উড়ছে বাবু-কলকাতার পায়রা। পায়রা ছাড়া ভাল ছবি হয় না। পায়রা হল প্রতীক। ভালভাবে লাগদাঁই করে লাগাতে পারলে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়ে যায়। পায়রা দিয়ে মৃত্যু খুব সুন্দর বোঝানো যায়। সিনেমার মৃত্যু বড় হাস্যকর। না মরলে মরা কেমন করে মরার মতো হবে? সব কিছুর অভিনয় সম্ভব, মৃত্যুর অভিনয় অসম্ভব। অভিনেতাদের কাছে মৃত্যু একটা কঠিন সাবজেক্ট। মারছি না;

অথচ মরতে হচ্ছে। ক্যামেরা সরে গেলেই উঠে বসে, কই রে সিগারেট নিয়ে আয়, নিয়ে আয় জোড়া ওমলেট, ডবল হাফ চা। যে মৃত্যুর পর মানুষকে শ্মশানে গিয়ে চিতায় শুতে হয়, এ মৃত্যু সে মৃত্যু নয়। এ হল গিয়ে পরিচালকের নির্দেশিত মৃত্যু। ক'জন আর মৃত্যুকে সে-ভাবে দেখার সুযোগ পান। মৃত্যু ঘটে নিভৃতে, একান্তে। মৃত্যু মানুষের বড় ব্যক্তিগত ব্যাপার। একান্ত আপনজন শিয়রে বসে থেকেও বুঝতে পারে না, মানুষটা কখন কিভাবে হঠাৎ চলে গেল, তার দেহ-জামাজোড়া ছেড়ে। সেই শ্বাসকষ্ট, সামান্য এক চিলতে বাতাসের জন্যে ভেতরের আকুলি-বিকুলি। দুটো চোখের ঠেলে বেরিয়ে আসা। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ঊর্ধ্বনেত্র হলেই কি আর মৃত্যু হল। সেই কারণে সিনেমার মৃত্যু সব একই ধরনের। মাথাটা বালিশ থেকে উঠতে উঠতে ধপাস করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবহ সংগীত। বেহালায় প্যাথসের টান। ক্যামেরা ক্লোজ-আপে অভিনেতার মুখ ধরছে। অভিনেতার তখন অগ্নি-পরীক্ষা। তারস্বরে চিৎকার— 'চোখের পাতা পিটপিট করে না যেন, ড্যাবা ড্যাবা ঊর্ধ্বনেত্র।' এই একটা শটই যে কতবার রি-টেক করতে হয়। কখনও পাতা পড়ে যায়, কখনও ড্যাবা কমে আসে, কখনও মৃতের চোখে জল এসে পড়ে। সেই কারণে মৃত্যুর আজকাল একটা পেটেন্ট চেহারা হয়েছে সিনেমার পর্দায়। সেকেন্ড-গ্রেড পরিচালকরা তার বাইরে আসতে পারছেন না। প্রথম সারির পরিচালকরা মৃত্যুকে নিয়ে গেছেন আর্টের পর্যায়ে। তাঁরা করেন কি, ক্যামেরাকে ক্লোজ-আপে এনে মৃত্যুপথযাত্রীর মুখটা ধরেন। ছটফট, ছটফট, বালিশে মাথা চালাচালি। দু' হাত কোনওরকমে ওপরে তুলে কারোকে ধরার বা খোঁজার চেষ্টা। অস্ফুটে কারো নাম ধরে ডাকা, 'সুধা! সুধা!' তারপর একপাশে ঘাড় কাত করে এলিয়ে পড়া। কাট্। পরের শট, ফড়ফড়, ফড়ফড় এক ঝাঁক পায়রা যেন কারোর তাড়া খেয়ে আকাশে উড়ে গিয়ে, বিশাল বৃত্ত রচনা করে উড়তে লাগল। এরপর এক রাউন্ড আন্তরিক কান্না। কান্নার দৃশ্যে আমাদের অভিনেত্রীদের কোনও জুড়ি নেই। একেবারে ফাটিযে দিতে পারেন। যাকে বলে কেঁদে মাত করা; অনেক পরিচালক আবার রেলগাড়ির সাহায্য নেন। সিটি বাজিয়ে হু হু করে ট্রেন চলে গেল দূর থেকে দূরে। বুক কাঁপিয়ে। লোহার রেলে চাকার শব্দ। মন হু হু-করানো সিটি। সব মিলিয়ে এমন একটা এফেক্ট। আত্মা রেলে চেপে পরবাস থেকে চলেছে স্ববাসে। পায়রা দিয়ে জমিদারের লাম্পট্য বোঝানো যায়। চকমিলান বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে পায়রাদের দানা খাওয়াতে খাওয়াতে বয়স্যকে বলছে, ওই অমুকের স্ত্রীকে তাহলে আজ রাতেই তোলার ব্যবস্থা কর। আবার জোতদারের অত্যাচার বোঝাবার জন্যে বেড়াল আর পায়রা একসঙ্গে ব্যবহাব করা হয়। বাড়ির চালে লাউ ফলে আছে। তার আড়াল থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে আসছে পাঁশুটে রঙের একটা বেড়াল। ইয়া এক হুলো। আর অদূরে নিশ্চিন্ত মনে ঠোঁট দিয়ে ডানা পরিষ্কার করছে নিরীহ এক পায়রা। দর্শকের আসনে বসে আতঙ্কে আমাদের

শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মানুষের সামগ্রিক নিপীড়ন বোঝাতে ক্রুশবিদ্ধ যিশু তো হামেশাই পর্দায় আসেন।

এখন হল প্রতীকের যুগ। লোগোর যুগ। অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, এক-একবার, এক-একরকম লোগো। কোনওবার হাতি, কোনওবার ভাল্লুক। কোনওবার গোল গোল চাকা। তা আমার কাহিনীর চিত্ররূপে প্রথমেই থাকবে পর্দাজোড়া নরম, মিষ্টি, ধোঁয়া। তার ওপর দুলতে থাকবে টাইটেল। আবহ হিসেবে ব্যবহৃত হবে দমকা কাশির শব্দ, কাকের কর্কশ চিৎকার। ব্যাটারি ডাউন গাড়ির বারে বারে স্টার্ট নেবার চেষ্টায় সেলফ্ মারার শব্দ। দু'পক্ষের কদর্য ঝগড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ। বেতারে প্রভাতী সংগীত। কলতলায় বাসন ফেলার আচমকা শব্দ। কোনও যন্ত্র ব্যবহার করা হবে না। স্রেফ শব্দ। বাজারের কোলাহল। কলের বাঁশি। সব মিলিয়ে তৈরি হবে টাইট্‌ল্ মিউজিক। আজকাল বিদেশী বইতে এই কায়দাই চলেছে।

এইবার ক্যামেরা ছাদের ভাঙা আলসে বেয়ে, বারান্দার ভাঙা রেলিং বেয়ে নেমে আসবে, শ্যাওলা ধরা চৌকো উঠানে। ক্লোজ আপে তিনটে তোলা উনুন। এই ভাঙা সাবেক বাড়িতে তিনটি পরিবার বাস করে। এখন সমস্যা হল, বাড়ি তৈরির মতো গল্পটাকে আমি কিভাবে খাড়া করব। কুস্তির মতো গল্প লেখারও দুটো ধরন আছে—একটা হল ফ্রি স্টাইল। অর্থাৎ শুরু করে দাও, তারপর যেখানে যায় যাক। লিখতে লিখতে ভাব, ভাবতে ভাবতে লেখ। শেষ পর্যন্ত গল্পের চরিত্ররাই লেখকের গলায় দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যায়। দিল্লিতে এক বিখ্যাত নামী লেখক বসবাস করতেন। খুব সায়েবী-ভাবাপন্ন। তাঁর একটা বিশাল বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিল। রোজ সকালে সেই দুর্বল বুদ্ধিজীবী তাঁর সবল কুকুরটিকে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন। প্রায়ই দেখা যেত, ব্যাপারটা উল্টে গেছে। কুকুরই বাবুকে নিয়ে বেড়াচ্ছে। টানতে টানতে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই দিকেই যেতে হচ্ছে। চরিত্র নিয়ে লেখক বেড়াতে বেরিয়েছেন, শেষে চরিত্ররাই লেখককে টানতে থাকে।

আর একটা হল কুস্তি। নিয়ম মেনে। প্রথা মেনে। কম্পোজ করে। স্টাইল রেস্টলিং। প্ল্যান করে লেখা। কার সঙ্গে কী হবে। গল্পর কাঠামোটা পুরো ভেবে নিয়ে, খড় বেঁধে মাটি চড়িয়ে যাও। সাহিত্যে আমরা যাকে গল্প বলি সিনেমায় সেইটাকেই বলে স্টোরি। আমার এই স্টোরি ফ্রি-স্টাইলেই চলুক। আঁতেল গল্প সেইভাবেই এগোয়। আমার যখন যা মনে হবে, তাই নামিয়ে যাব, তারপর ফিনিশ করে, মেজে-ঘষে ছেড়ে দেব। যেমন এখন আমার মনে হচ্ছে, গল্পের প্রেমিক, প্রেমিকা এই একই বাড়িতে বসবাস করবে। একটা তোলা উনুন প্রেমিক-পরিবারের, আর একটা তোলা উনুন প্রেমিকা-পরিবারের। এই দুটো উনুনই জীবনের প্রতীক। জীবন জ্বলছে গুমরে গুমরে। যত না পুড়ছে তার চেয়ে বেশি ধোঁয়া ছাড়ছে। এইবার তৃতীয় উনুনটি কার। তৃতীয় উনুনটা অবশ্যই আর

একটি পরিবারের, কিন্তু এই কাহিনীতে সেই পরিবারটির কি ভূমিকা হবে?

এই পরিবারটিকেই আগে প্রতিষ্ঠিত করা যাক। বড় বড় সাহিত্যিক আর বাঘা বাঘা সমালোচক ও সমালোচিকাদের সঙ্গে সামান্য মেলামেশা করে একটা কথা শিখেছি—চরিত্রকে, ঘটনাকে 'এসট্যাবলিশ' করা। আধ্যাত্মিক জগতের ভাষায় বলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। প্রথমত, চরিত্রকে এমনভাবে আঁকতে হবে, যেন বইয়ের পাতা থেকে তার শ্বাসপ্রশ্বাস আমাদের গায়ে এসে লাগে। যেন চিমটি কাটলে, উঃ করে ওঠে। জনৈক প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিককে প্রশ্ন করেছিলুম, আপনার একটি চরিত্র আর-একটি চরিত্রকে বলবে, 'সুধা আমার ভীষণ মাথা ধরেছে।' তা সেই কথাটা বলে ফেললেই হয়; তা না, সুধাময় আসছে রাস্তার একপাশ দিয়ে। কেন একপাশ দিয়ে আসছে, প্রায় এক প্যারা জুড়ে তার ব্যাখ্যা। সুধাময় সাবধানী। তার পিতাও খুব সাবধানী ছিলেন। সুধাময়ের এক বন্ধু বড়দিনে, পার্ক স্ট্রিটে কথা বলতে বলতে হাঁটতে হাঁটতে, অন্যমনস্ক হয়ে পাশে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রানওভার হয়ে গিয়েছিল। সে-দৃশ্য সুধাময় আজও ভুলতে পারেনি। রক্তাক্ত, থ্যাঁতলানো একটা দেহ। সুধাময়ের একটা প্রশ্নের পুরো জবাব সমাপ্ত করে যেতে পারেনি। সে হাসছিল। হাসতে হাসতে নিমেষে মারা গেল। ওই একটা ঘটনায় সুধাময়ের পাকাপাকিভাবে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে গেছে। পেছন থেকে গাড়ির শব্দ এলেই সে লাফিয়ে পাশে সরে যায়। এত পাশে, যে একবার নর্দমায় পড়ে পা ভেঙে তিন মাস বিছানায় পড়েছিল। এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে সুধাময় চলতে চলতে বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল। দেখলে, দূর থেকে একটা হলদে ট্যাক্সি আসছে। পেছনের আসনে প্রশান্তর বোন বসে আছে। এয়ার হস্টেস। ভীষণ অহঙ্কারী। এক সময় সুধাময়ের ছাত্রী ছিল। মেয়েটির খোঁপার দিকে সুধাময়ের দৃষ্টি চলে গেল। সে নিজেকে তিরস্কার করল। মেয়েদের খোঁপা, তাও আবার ছাত্রী, সেই খোঁপার দিকে এই বয়সে নজর চলে যাওয়া খুবই অন্যায়। ট্যাক্সিটা চলে যাবার পর সুধাময় রাস্তার দিকে তাকাল। একটা শালপাতার ঠোঙা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এই প্লাস্টিক আর কাগজের যুগে এই বস্তু এখনও আছে। সুধাময় নিজের সঙ্গে তুলনা করল। তার মতো মিসফিট মানুষের তুল্য এই ঠোঙা এখনও দু'একটা উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। ঠোঙাটাকে একটা লাথি মেরে সুধাময় বেশ তৃপ্তি পেল। এইরকম একটা লাথি নিজের নিতম্বে মারতে পারলে সুধাময় খুব খুশি হত। নিজেকে নিজে লাথি মারা যায় না। এইটাই এক দুঃখ। সেই বেড়ালছানাটা একইভাবে বসে আছে দরজার বাইরে, একপাশে। বাড়ি থেকে ভোরবেলা বেরোবার সময় যে-অবস্থায় দেখে গিয়েছিল, ঠিক সেই একই অবস্থায় বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে। দাঁতাল শূকরের মতো ভয়ঙ্কর এই পৃথিবীতে হঠাৎ এসে পড়ে ক্ষুদ্র এই প্রাণীটি যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সুধাময়ের খুব ইচ্ছে করছিল অসহায়, ভীত প্রাণীটিকে তুলে ভেতরে নিয়ে যায়। ভয়ে পারল না।

পৃথিবীর ভয়ে নয়। ভয় সুধাকে। যে কোনও রোমশ প্রাণীর কাছাকাছি এলেই সুধার অ্যালার্জি হয়। রাতে হাঁপানির মতো হয়। নিঃসঙ্গ, ভীত বেড়ালটার কথা চিন্তা করতে করতে সুধাময় দোতলায় উঠতে লাগল। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপের আগা ভেঙে ভেঙে গেছে। মেরামত অবশ্যই করা উচিত। একটু অন্যমনস্ক হলেই পতন অবধারিত। বহুবার পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। সারাবার সঙ্গতি নেই। সুধাময় সিঁড়িটার নাম রেখেছে সচেতনতা। সুধাময় যৌবনে কবিতা লিখত। অভ্যাসটা ধরে রাখতে পারলে কবি হিসেবে এতদিনে তার খুব নাম হত। সংসার তার এই প্রতিভাকে জাগাবার বদলে, জল ঢেলে দিল। সুধাময় বারান্দা পেরিয়ে ঘরে এল। বারান্দায় শেষ বেলার ছায়া নেমে এসেছে। সুধা শুয়েছিল খাটে। কপালে হাত রেখে। সুধাময় সেইদিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার আজও কি জ্বর আসবে?'

'ওই একই প্রশ্ন নিয়ে, আসার আগেই, জ্বরকে বিছানায় বরণ করব বলে শুয়ে পড়েছি।'

'আমি তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, মন থেকে জোর করে অসুখটাকে তাড়াও। তোমার একটা ম্যানিয়া এসে গেছে।' কপাল থেকে হাত সরিয়ে সুধা করুণ চোখে সুধাময়ের দিকে তাকাল। এই ম্যানিয়া শব্দটা শুনলে তার ভেতরে একটা চাপা ক্রোধ ধিকিয়ে ওঠে। ক্ষতবিক্ষত সুধাময়ের দিকে তাকালে সেই ক্রোধ পরিণত হয় চাপা অভিমানে। দু'চোখের পাশ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে আসে মাত্র। তার ভেতরের জলও শুকিয়ে আসছে ক্রমশ। সুধা আধবোজা চোখে দেখতে লাগল, সুধাময় পাঞ্জাবিটা খুলে হ্যাঙারে রেখে বারান্দার চেয়ারে গিয়ে বসল। সুধাময় ঠোঁটে একটা সিগারেট লাগাল। সিগারেটের কাগজটা জড়িয়ে গেল ঠোঁটের সঙ্গে। বেশ বুঝতে পারল শরীর শুকিয়ে আসছে। সিগারেট খুলে নিতে গিয়ে অল্প একটু কাগজ ছিঁড়ে ঠোঁটেই লেগে রইল। সুধাময় দু'তিনবার থু থু করেও কাগজটা ছাড়াতে পারল না। তখন আঙুল দিয়ে ঠোঁট পরিষ্কার করে, জিভ বুলিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে সিগারেট লাগাল। ছেঁড়া অংশ দিয়ে কয়েক কুঁচি তামাক জিভে এসে গেল। সিগারেট খুলে সুধাময় আবার থু থু করল।

সুধা খাট থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি আবার গা গুলোচ্ছে। আমি কিন্তু তোমাকে বারে বারে বলেছি, খালি পেটে থেকো না। তোমার পুরনো আলসার। এই সময় তুমি দয়া করে বিছানায় পড়ে যেও না। একটু কিছু মুখে দাও। কিছু না পারো তো, একটা বাতাসা, এক গেলাস জল।'

পর পর তিনটে দেশলাই কাঠি জ্বলল না। একটার বারুদ ঘষতে ঘষতে ক্ষয়ে গেল। একটা ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেল। আর একটার বারুদ খুলে জ্বলতে জ্বলতে বারান্দার বাইরে ছিটকে চলে গেল। সুধাময় অবাক হয়ে দেশলাইটার দিকে তাকাল। এই রকম তো হয় না কখনো। সুধাময় সিগারেটটা

ছুঁড়ে ফেলে দিল বারান্দার বাইরে। ঘরে এসে খাটের পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। ভুরুর মাঝখানের কপালটা দু-আঙুলে টিপে ধরে বললে, 'সুধা, মাথাটা আজ ভীষণ ধরেছে। কপালের কাছটা একেবারে ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

সেই প্রখ্যাত সাহিত্যিককে প্রশ্ন করেছিলুম, 'এই একটা কথা বলাতে আপনি কত কাণ্ড করলেন, তাই না?'

'তুমি একটা আকাট মূর্খ! এইটুকু বোধ তোমার এল না, একে বলে বিল্ড-আপ করা। ওয়ার্মিং-আপও বলা যায়। একই সঙ্গে কত কি বোঝানো হল। এইটাই হল ক্ল্যাসিক্যাল স্টাইল। টমাস মান, আঁদ্রে জিদ, এই কায়দায় লিখতেন। গল্পের চরিত্রকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তার ম্যানারস, ম্যানারিজম। চেহারার কোনও বর্ণনা নেই; কিন্তু যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, একহারা, সাধারণ উচ্চতার একটি লোক। এক সময় রঙ ফর্সা ছিল, এখন তামাটে। সামনের চুল পাতলা হয়ে এসেছে। হাতের শিরা জেগে আছে। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। লোকটি সামান্য পরিশ্রমেই ঘেমে যায়। চোখ দুটো কোটরগত হলেও অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। চেহারায় একটা আভিজাত্যের ভাব এখনও ফুটে আছে। এই সমাজে লোকটি মিসফিট হলেও, অলস নয়, সংগ্রামী।'

কত কি শেখার আছে, তাই না! আমি তৃতীয় উনুনটিকে আগে এসট্যাবলিস করি। ক্ল্যাসিক্যাল জার্মান-সাহিত্যিকদের কায়দায়। উনুন দিয়ে যেন মানুষ চেনা যায়। যেমন ছড়ি দিয়ে বাবু। দরজার পাল্লায় একটা ছড়ি ঝুলছে। লোকটির আর ঘরে ঢোকা হল না। বেরিয়ে গেল। অনেকটা পরে ফিরে এল একটা কুড়ুল নিয়ে। বউয়ের বিছানায় মহাজনের মুণ্ডু খুলে পড়ে গেল। সেই রকম অ্যাশট্রেতে পোড়া সিগারেট। স্ত্রীর প্রেমিকের সিগারেট অবৈধ ধোঁয়া ছাড়ে। শ্বশুর মহাশয়ের সিগারেট ছাড়ে তিরিক্ষি ধোঁয়া। বন্ধুর সিগারেটের মজলিশি ধোঁয়া। দারোগার সিগারেটের ধোঁয়ায় রুলের গুঁতো। ছেলের বন্ধুর সিগারেটের ধোঁয়া কেয়ার ফ্রি। পিতার সিগারেটের ধোঁয়ায় চাপা আতঙ্ক, এরপর জীবনমঞ্চে কোন দৃশ্য আসছে।

তৃতীয় উনুনটা ঢালাই লোহার। মাটির উনুন ধরে মায়ের বুকের স্নেহের আগুন। এই লোহার উনুনে যেন বউ পোড়ানো আগুন। উনুনটার চেহারা যেন গেস্টাপোর মতো। সলিড লোহা। গা'টা খসখসে। ভেতরের চাপা নিষ্ঠুরতা যেন ফুস্কুড়ির মতো ফুটে উঠেছে। অন্য দুটো উনুনের চেয়ে এই উনুনের আগুন যেন বেশি লাল। প্রথম উনুনটি তুলে নিয়ে গেল সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী এক যুবক। প্রখ্যাত সাহিত্যিকের জার্মান কায়দায় যুবকটিকে একটু এসট্যাবলিশ করা যাক।

ছোট একটি ঘর। সেই ঘরে ইটের পর ইট দিয়ে উঁচু করা একটি চৌপায়া। আধময়লা একটি মশারি। সেই মশারির ভেতর যুবকটি শুয়ে ছিল। সাদা পাজামা আর কাঁধকাটা গেঞ্জি পরে। ছোট একটা মাথার বালিস। গামছা জড়ানো। গামছা জড়াবার কারণ, বালিশের খোলে দুটো ফুটো তৈরি হয়েছে। ফুটো হবার কারণ,

এই পরিবারে একটা আদুরে বেড়াল আছে। সাদার ওপর হলদে। মুখটা ভারি মিষ্টি। পোখরাজের মতো জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। লেজটা চামরের মতো মোটা। লোভে ভর্তি থুপথুপে একটা বেড়াল। বেড়ালটার পেট কোনও সময় ঢুকে থাকে না। সব সময় ভরভর্তি! সব সময় হাসিখুশি। হয় খাচ্ছে, না হয় ঘুমোচ্ছে। না হয় দুর্দান্ত খেলায় মেতে আছে আপনমনে। নানারকম খেলা আবিষ্কার করার অসাধারণ প্রতিভা আছে বেড়ালটার। চাদরের ঝোলা অংশে ঝুলে ঝুলে খেলে। দেশলাইয়ের খালি প্যাকেটে দু' পায়ে পাকা ফুটবলারের মতো ড্রিবল করে। হাওয়াই চটি চারপায়ে আঁকড়ে ধরে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ে। কামড়াতে থাকে। কখনও লেজটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে অকারণে ঘরময় ছোটাছুটি করে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে পেছনে তাকায়। তারপর আবার দৌড়োয়। তড়াং করে বিছানায় লাফিয়ে উঠে খচমচ, খচমচ এ-পাশে ও-পাশে দৌড়ে চাদরের ঝোলা অংশ বেয়ে ধুপ করে মাটিতে পড়ে। এই বেড়ালটাই বালিশটা ছিঁড়েছে। তার এই অপরাধের জন্যে কেউ অসন্তুষ্ট হয়নি, বরং বেশ গর্বিত। ফুটো দিয়ে তুলো বেরিয়ে আসছিল,তাই যুবকটির মা নতুন একটা গামছা দিয়ে বালিশটা বেঁধে দিয়েছেন। মেয়েকে বলেছেন, বালিশে দুটো তাপ্পি মেরে দিস। তার আর সময় হচ্ছে না। এটা তার অবহেলা নয়; সত্যিই সময়ের বড় অভাব। সৃষ্টি সংসারের কাজ, তিন বাড়িতে টিউশানি, রবীন্দ্রসংগীত শিখতে যাওয়া আর ছোট্ট একটা প্রেম। তার দোষ নেই। সত্যিই সময়ের অভাব।

সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করা উচিত! বেড়ালের অংশটাকে এত বড় করার কারণ, বেড়াল আর বিছানা একটা সংসারকে প্রকাশ করে। উচ্চবিত্ত, ভোগী, স্বার্থপরের সংসারে বিছানা খুব টিপটপ থাকে। বালিশের খুব বাহার। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ঘর। কলেজের কমন-রুমের মতো একটা লিভিং-রুম। আলাদা খাবার ঘর। সেই সব বাড়িতে বিছানার ওপর চাঁদের হাটবাজার বসে না। সেই সব বাড়িতে বেড়াল ঢোকার উপায় নেই। ঢুকলেই দেখমার। রাতের বেলায় টানটান বিছানায় শয্যাগ্রহণকারী আলতো করে শরীরটা ছেড়ে দেন। চাদর কুঁচকে শয্যার সৌন্দর্য নষ্ট হবার ভয়ে সাবধানে শরীর তুলে পাশ ফেরেন। এই ধরনের অধিকাংশ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তেমন ভাল থাকে না। বিয়ের তিন বছরের মধ্যে ডিভোর্স না হলে 'সোস্যাল প্রেস্টিজ' বাড়ে না। যে মহিলা যতবার ডিভোর্স করতে পারবেন ততই তাঁর সম্মান আর ব্যক্তিত্ব বেড়ে যাবে। সোসাইটির ওপর তাঁর একটা গ্রিপ এসে যাবে। তাঁর চুল তত ছোট হবে। জীবনে আর কুলিয়ে উঠতে পারেন না তাই নেড়ার আগের স্তরে এসে থেমে যান। যে পুরুষ যতবার ডিভোর্স করতে পারবেন, ডিভোর্সি মহলে তাঁর আকর্ষণ তত বেড়ে যাবে। মুখে একটা উদাসীনতা। কঠিন একটা পাকাপাকা ভাব। অর্থাৎ স্টিল থেকে টেম্পারড স্টিল। সোনা থেকে পাকা সোনা। আনাড়ি স্বামী আর কি। মেয়েরা নেড়ে চেড়ে একটু ফ্রাই করে ছেড়ে দেয়। ফ্রায়েড হতে হতে ডিপ

ফ্রাই হয়ে ঈশ্বরের কাটলেট। ডিভোর্সিদের একটা বৃত্ত থাকে। বৃত্তাকারে নৃত্য।

এ ছাড়ছে, সে ধরছে। সে আবার ছাড়ছে তো ও ধরছে। এই ধরাধরি আর ছাড়াছাড়ি হতে হতে দেখা গেল, সাত-আট বছর পরে প্রথমটি আবার প্রথমের কাছে ফিরে এসেছেন। তখন দুজনেই বলছেন, 'কি আশ্চর্য মাইরি, শুধু ওয়ার্লড ইজ রাউন্ড নয়, ম্যারেজ ইজ অলসো রাউন্ড। চলো দাঁত বাঁধিয়ে আসি।'

আর বেড়াল। এরই মধ্যে এই কাহিনীতে দুটো বেড়াল এসে গেছে। প্রথম বেড়ালটি এসেছে উদাহরণে। সেই প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সুধাময়কে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অসহায় একটি বেড়ালছানা এনেছেন। পৃথিবী হল গেস্টাপোর পায়ের বুটজুতো আর বেড়াল হল অসহায় জীবন। এ কাহিনীর বেড়াল এই পরিবারের জীবনদর্শন। অভাবের কুমির পরিবারটিকে চিউইংগামের মতো চিবোলেও, মানুষগুলো ফ্যান-ফোন-ফ্রিজ মারুতিঅলা পরিবারের সদস্যদের মতো নীচ আর সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়নি। ঐশ্বর্যশালীর নাস্তিকতা অথবা ভীত-আস্তিকতা নয়, মেঠো মানুষের সহজ সরল ঈশ্বর-বিশ্বাসে পরিবারটি চালিত। গৃহকর্ত্রীর চিৎকার-চেঁচামেচি, তাঁর বাইরের দিক, ভেতরে তুলতুলে সাদা ভাল্লুকের মতো, স্নেহ-ভালবাসা-মমতা-উদারতা ঘাপটি মেরে বসে আছে।

পাজামা আর গেঞ্জি-পরা যুবকটি যদি আমাদের এই কাহিনীর নায়ক হয় তাহলে তার কিছু গুণ থাকা চাই। ছেলেটি সম্প্রতি বাংলায় এম এ করেছে। ভীষণ সরল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সন্দেহবাদী নয়। বাঁচতে ভালবাসে। মানুষের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। অতীতের গল্প তাকে টানে। তার ভবিষ্যৎ হতাশায় ভরা নয়। বয়সের তুলনায় বুদ্ধি পাকেনি। সকলের সব কথাই সে বিশ্বাস করে। ঠকলেও তার জ্ঞান হয় না। ক্ষমাশীল। 'যাক-গে, একটা দুটো লোক ওরকম করতেই পারে'—বলে হেসে উড়িয়ে দেয়। বাবা, মা, বোন—তিনজনকেই সে খুব ভালবাসে। তিনজনের জন্যেই সে জীবন দিতে পারে। তার মৃত্যুভয় নেই। নিজে অসম্ভব কষ্ট করতে পারে। সাজ-পোশাকের কাপ্তেনি তার অসহ্য লাগে, কিন্তু অতিমাত্রায় পরিচ্ছন্ন। সে অলস নয়, কিন্তু ঠেলে না তুললে, ভোরবেলা সে কিছুতেই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। ঘুম থেকে ওঠার পরও নিজেকে ক্লান্ত মনে হয়। মনে হয়, সারা রাত সে যেন লড়াই করে উঠল। সে নিজেই বলে 'ডিংডং-ব্যাটল'।

এইবার ছেলেটির একটা সুন্দর নাম রাখা যাক। এমন একটি ছেলের নাম শঙ্কর ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। 'নিউমারোলজি' বলে একটা শাস্ত্র আছে। বিজ্ঞানের বাইরে। সেই শাস্ত্র অনুসারে শঙ্কর নামের ছেলেরা ভাল হতে বাধ্য। এই যে শঙ্করের চরিত্রটা এইরকম হয়ে গেল, এরপর আর প্রেমের গল্প হয় না। এই ছেলে কখনও প্রেম করতে পারে না। কারণ শঙ্কর নিজের জামার বুক পকেটে উদ্বোধন থেকে কেনা স্বামী বিবেকানন্দের ছোট্ট একটি ছবি রাখে। সত্যি রাখে। এটা গল্প নয়। মুভি ক্যামেরার বদলে এবার আমি নিজে আসরে নেমে

পড়লুম। সেই ঘটনাটির মতো, শঙ্কর আমার গলায় চেন দিয়ে টানছে।

শঙ্করকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'তুমি স্বামীজির ছবি সব সময় বুক পকেটে রাখ কেন? ভণ্ডামি! গলায় গুরুদেবের লকেট ঝুলিয়ে অনেক পরমার্থী দেহার্থী হয়ে বেশ্যালয়ে যায়।'

'সে কে কি করে আমি জানি না। আমার জানার দরকার নেই। আমি একটা শক্তির স্পর্শ পাই বলে রাখি। একটা আদর্শ আমার হাত ধরে রাখে সব সময়। আমার হতাশা কেটে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ হতে পারবো না কোনওদিন; কিন্তু তাঁর ত্যাগ, বিবেক বৈরাগ্য যদি সামান্য স্পর্শ দিতে পারে আমাকে, এ জীবনে আমার কোনও দুঃখ থাকবে না, হতাশা থাকবে না।'

'কেন তুমি তো ফোর্ড অথবা গেটি কি ওনাসিসের ছবি রাখতে পারো। তুমি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কিংডম গড়ে তুলতে পারো। ত্যাগ তো নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। তুমি জীবনের পজিটিভ-সাইডটা নিচ্ছ না কেন; তার কারণ তোমার অক্ষমতা। ভাবে যা করা যায়, কাজে তা করা যায় না। ধরতে গেলে শক্তি চাই, ছাড়তে গেলে শক্তির প্রয়োজন হয় না। দুর্বলের আলগা হাত থেকে তো সবই খুলে পড়ে যায়। সেইটাকেই ত্যাগ বলা হোক। উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।'

'ভোগের একটা ব্যাকরণ আছে। সিঁড়ি আছে। ধাপ আছে। ত্যাগের কোনও ব্যাকরণ নেই। ত্যাগ করতে গেলে কি ভীষণ শক্তির প্রয়োজন আপনার ধারণা নেই। ছেঁড়া, তালি মারা একটা জামা গা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হলেও মন টেনে ধরে। ভোগ বসে আছে মনের ভেতরে, কাঠকয়লার আগুন জ্বেলে। অহরহ ফুঁ মেরে চলেছে বিষয়ের ব্লোয়ার। আরো চাই, আরো চাই, সদাসর্বদা এই সংকীর্তন চলেছে। এই যা পেলুম, পরমুহূর্তেই তাতে আর মন ভরে না, অন্য কিছু চাই। চাওয়া, পাওয়া না পাওয়া, পুড়ে যাওয়া ছাই। এ এস এইচ। এ এস... এস।'

'আমার কি মনে হয় জান, ধর্ম, ধার্মিকতা, আধ্যাত্মিকতা, আদর্শ, সংযম, ত্যাগ, বৈরাগ্য—সবই হল দুর্বলের বলিষ্ঠতা। এক ধরনের আত্মতৃপ্তি। তুমি বাংলার এম এ, তোমার দ্বারা তো আর কিছু করা সম্ভব নয়। স্কুল মাস্টারি জোটানও শক্ত। তুমি এখন সন্ন্যাসীও হয়ে যেতে পার। আবার কেউ যদি তোমাকে বলে, আমার অসুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে কর, তোমাকে আমি আমার কোম্পানির বিরাট একজন একজিকিউটিভ করে দেব, তাহলেই তোমার মতিগতি বদলে যাবে। ব্যাঙ্গালোরে সাজানো অফিসে গিয়ে বসবে। সাজানো কোয়ার্টার। লাল গাড়ি। স্যুট, টাই, পার্টি, ড্রিংকস। সোসাইটি। কলগার্লস।'

শঙ্কর বললে, 'ঠিক হচ্ছে না। গতানুগতিক হয়ে যাচ্ছে। দার্শনিক তর্কবিতর্কে না গিয়ে, একপাশে বসে নিরাসক্ত হয়ে দেখুন, আমি কি করি। কি ভাবে আমি ফুটে উঠি। ভাল, ক্ষমতাশালী লেখকরা পাকামো না করে জীবনকে অনুসরণ করেন। জীবন সৃষ্টি করেন স্বয়ং ঈশ্বর। এক-এক জীবন এক-এক রকম। জন্মানোমাত্রই জীবন-ঘড়ির টিকটিক শুরু হয়ে গেল। সব মানুষেরই ভেতরে

একটা ঘড়ি আছে। সেই ঘড়ি ঠিক করে একজন মানুষ মুহূর্তে মুহূর্তে কেমন থাকবে, তার শরীর, তার মানসিক অবস্থা, তার অনুভূতি তার কর্মতৎপরতা। রোজ সূর্য উঠছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। জোয়ার আসছে নদীতে ভাঁটা পড়ছে। বিভিন্ন গতিতে গ্রহ ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। কোনও ব্যতিক্রম নেই। সূর্যের গতি, সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে জীবনের অনেক কিছুর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। ভূমিকম্পের সাইক্‌ল্ আছে, ঋতুচক্র আছে, আবহাওয়ার পরিবর্তনেরও একটা সাইক্‌ল আছে। মানুষের মন, মগজ, ভালো লাগা, না-লাগা, কাজ করার ইচ্ছা-অনিচ্ছা সবই এই ঘড়ির নিয়ন্ত্রণে। যদি পারেন ডক্টর হেরম্যান সোবোদার, দি পিরিয়ডস অফ হিউম্যান লাইফ বইটা পড়ে নেবেন। মানুষ যা ভাবে তাই করে, যা ভাবে না, তা করে না, করলেও জোর করে করে। আর এই ভাবনাটা নিয়ন্ত্রণ করে তার জন্মকালীন ঘড়ি।'

আমার চরিত্রের হাতে মার খেয়ে আমি থেবড়ে বসে পড়লুম।

শঙ্কর যে জায়গাটায় শোয়, তার মাথার কাছে একটা কুলুঙ্গি। সেইখানে একটা টেবিল ঘড়ি। মরচে ধরা। তবে অ্যালার্মের শব্দটা ভারি সাংঘাতিক। সেই শব্দে পুরো বাড়ি জেগে ওঠে। শঙ্করের একটা হিসেব আছে। অ্যালার্মটা যখন বাজে তখন উনুনটা ধরে আসে। শঙ্কর চৌকি থেকে নেমে, ঘুম চোখে সোজা এগিয়ে যায় বাইরে, যেখানে উনুনটা অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়ছে। উনুনটাকে সোজা তুলে এনে রান্নাঘরে বসিয়ে দেয়। একটু দেরি করলেই তার অধৈর্য মা তুলে আনবেন। মা বাতে ক্রমশ বেঁকে আসছেন। কোমরে স্পন্ডিলোসিস। শঙ্কর মাকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা করে, আর বোনকে ভালবাসে ফুলের মতো। সমস্ত কায়িক পরিশ্রম থেকে দূরে রাখতে চায়। শঙ্করের মানসিকতা হল সংসারের সমস্ত ঝড়ঝাপ্টা তার ওপর দিয়েই যাক। অনাহার, অসুখ, অপমান— যা কিছু অশুভ সব বহে যাক তার ওপর দিয়ে, বাকি সকলে ওরই মধ্যে একটু আড়ালে, একটু সুখে থাকুক। দুঃখটাকে শঙ্কর ভীষণ ভালবাসে। 'কষ্টে মানুষ পবিত্র হয়, চরিত্রবান হয়। প্রাচুর্যে মানুষ চরিত্রহীন হয়। জীবন একঘেয়ে হয়ে যায়। শঙ্কর নিজের কাজ নিজেই করে নিতে ভালবাসে। গরম, জ্বলন্ত উনুনটাকে রান্নাঘরে পাচার করে দিয়ে, শঙ্কর বিছানা তুলবে। বোন শ্যামলী তাকে সাহায্য করতে চাইলেও শঙ্কর সাহায্য নেবে না। ছেলেবেলায় তার আদর্শবাদী শিক্ষক তার মনে একটি মন্ত্র লিখে দিয়ে গেছেন চিরতরে, সেল্‌ফ্ হেলপ ইজ বেস্ট হেলপ। বিছানা তোলার পর শঙ্কর মুখ ধোবে।

উঠান। কল। জল পড়ছে সরু সুতোর মতো। উঠানটা শ্যাওলা ধরাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পরিষ্কার। ঝকঝকে পরিষ্কার। এর জন্যে সমস্ত কৃতিত্বই শঙ্করেব পাওনা। শঙ্করের মা একবার পা হড়কে পড়ে গিয়েছিলেন টিনের বালতির ওপর। ঈশ্বরের অসীম কৃপা। কোমরটা ভাঙেনি। সামনের একটা দাঁত খুলে পড়ে গিয়েছিল। দাঁতটা একটু নড়বড়েই ছিল। সেই দিন থেকে শঙ্করের

কাজ হয়েছে, পাথর মেবে উঠান পরিষ্কার। বাঙালির মজা হল, নিজেরা ভাল কিছু করবে না। অন্যে কেউ কিছু করলে হাসাহাসি হবে। এই উঠান পরিষ্কার নিয়ে নানা কথা শঙ্করের কানে আসে। বেকার ছেলে অফুরন্ত সময় কি আর করবে। একটা কিছু তো করতে হবে! এ-কথাও কানে এসেছে, শরীরটা পুরুষের হলেও মন আর স্বভাবটা মেয়ে মানুষের। উনুনে কয়লা দিচ্ছে, দুপুরে গুল দিচ্ছে। কলতলায় চাল ধুচ্ছে। শঙ্কর মনে মনে ভাবে—মুখ দিয়েছেন যিনি, বাত দিয়েছেন তিনি।

কলতলায় যাবার সময় শঙ্কর খড়ম পরে। চিৎপুর থেকে খুঁজে খুঁজে এক জোড়া খড়ম কিনে এনেছে। পায়ের তলাটা নোঙরা হয়ে গেলে তার বিশ্রী লাগে। খড়মের খটাস্ খটাস্ শব্দে সকলকে সচকিত করে শঙ্কর কলতলায় গিয়ে দাঁড়াল। শঙ্কর গামছার বদলে ব্যবহার করে একটুকরো সাদা কাপড়। গামছা জিনিসটাকে সে অপছন্দ করে। তোয়ালে বড়লোকের এবং অস্বাস্থ্যকর। শঙ্কর এক মিটার মার্কিন কিনে এনে নিজেই মেশিন চালিয়ে ধার দুটো সেলাই করে নেয়। তার সেই শিক্ষাগুরু বলতেন, লিভ ইন স্টাইল। বাঁচাটা যেন রুচিসম্মত হয়। অঢেল খরচ না-করেও রুচিসম্মত বাঁচা যায়।

বাঙালির জীবন হল, জল আর কল। কলতলা খালি যাবার উপায় নেই। কেউ না কেউ থাকবেই। শঙ্কর খড়ম পায়ে কলতলায় গিয়ে দাঁতে বুরুশ ঘষতে লাগল। আর সেই সময় দ্বিতীয় উনুনটি তুলতে এল আরতি। তীব্র চেহারা। যেমন রঙ, তেমনি ধারালো চোখ-মুখ। চোখ দুটো যেন ছুরি ছোলা। খুব নাম করা ভাস্কর কেটেছেন। পটলচেরা। মণি দুটো জ্বলজ্বল করছে। শঙ্করের কলতলায় আসার আর আরতির উনুন তুলতে আসা রোজই এক সময় হয়। এই নিয়ে তৃতীয় পরিবারটিতে নানা আলাপ-আলোচনা। আরতিদের উনুনটা আকারে বেশ বড়। এক একবারে সের পাঁচেক কয়লা ধরে। আগুনও হয় তেমনি গনগনে। আরতি একহারা, লম্বা। শঙ্কর রোজই দেখে, আরতি নানাভাবে চেষ্টা করছে উনুনটাকে কায়দা করার। পারছে না। তখন শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে বলে, 'দেখি সরুন'। তারপর উনুনটাকে অক্লেশে তুলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয় তাদের রান্নাঘরে। এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে ফিরে আসে কলতলায়। রোজই আরতি কিছু বলতে চায়। বলা আর হয় না, কারণ শঙ্কর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। কোনও দিকে তাকায় না। তার মুখে ব্রাশ। গায়ের ওপর সাদা মার্কিনের টুকরো। আরতির জীবনের ঘোরালো একটা ইতিহাস আছে। কে বলেছে বাঙালি ইতিহাস বিমুখ। পারিবারিক ইতিহাস কারোর অজানা থাকে না। কোনওভাবেই চেপে রাখার উপায় নেই। কোথা দিয়ে ঠিক বেরোবেই বেরোবে। আরতির বাবার আর্থিক অবস্থা একসময় খুবই ভাল ছিল। মধ্য কলকাতায় সুন্দর একটা বাড়ি ছিল। বাড়ির পেছনে লন ছিল, ফুলগাছ ছিল, দোলনা ছিল। একটা গোমড়ামুখো ভকসহল গাড়ি ছিল। আরতিকে দেখলেই বোঝা যায়, আরতির মা খুব সুন্দরী

ছিলেন। বিদূষী মহিলা; একটু বিলিতিভাবাপন্ন। আরতির বাবার বিশাল এক ব্যবসা ছিল। দুই পুরুষের ব্যবসা। পিতামহ ফেঁদেছিলেন, পিতা বাড়িয়েছিলেন। আরতির বাবা আধুনিক করেছিলেন। কারবারটা ছিল এনামেলিং-এর। এনামেলের হাজাররকম জিনিসপত্র তৈরি হত। রপ্তানি হত বিদেশে! বিশাল কারখানা ছিল ওপারে। গঙ্গার ওই কূলে। রপ্তানির সূত্রে আরতির বাবা বহুবার বিদেশে গেছেন। বিবাহ করেছিলেন এক অতি সম্পন্ন স্টিভেডারের সুন্দরী মেয়েকে। মেয়েটি ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিল। শিক্ষিতা, সুন্দরী মেয়ে অনেকটা মৌচাকের মতো। সব সময়ই সে চাকে মৌমাছি বিড়বিড় করে। আরতির রাসায়নিক পিতা জীবন আর জগতকে কর্মযোগীর দৃষ্টিতে নিয়েছিলেন। খাটবেন, খুটবেন, অর্থ উপার্জন করবেন, কিছু মানুষের কর্ম-সংস্থান করবেন। দিনের শেষে ফিরে আসবেন সুখী গৃহকোণে। সেই গৃহকোণ অবাঞ্ছিত উপদ্রবে আর সুখী রইল না। তিনি ভেবেছিলেন বাঙালি মেয়ে এক স্বামীতেই সন্তুষ্ট থাকবে। তা আর হল কই! বাড়ি, গাড়ি, বিত্ত, আদর্শবাদী স্বামী, স্বাভাবিক এইসব পাওনার ঊর্ধ্বে একটু হিং-এর গন্ধ। একটু পাপ। একটু বিশ্বাসঘাতকতা। একটু লুকোচুরিব আকর্ষণ কারো কারো কাছে অনেক বেশি। থ্রম্বোসিস শুধু মানুষের হয় না, ভাগ্যেরও হয়। আরতির যখন তিন-চার বছর বয়েস, আরতির মা গৃহত্যাগ করলেন এক তরুণ পাঞ্জাবী শিল্পপতির সঙ্গে। দিল্লিতে তাঁর বিশাল এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের ব্যবসা। কে জানে ভদ্রমহিলা এখন কেমন আছেন। যৌবন কি ধরা আছে দেহে। থ্রম্বোসিসের প্রথম আক্রমণ। আরতির বাবা করুণাকেতন প্রথম ধাক্কাটা কাটালেন। এল দ্বিতীয় আঘাত। কারখানায় শুরু হল ধর্মঘট। ভাঙচুর, খুনোখুনি। হল লকআউট। কারখানার ভেতরে জঙ্গল তৈরি হয়ে গেল। যন্ত্রে মরচে ধরে গেল। করোগেটের চাল খুলে খুলে পড়ে গেল। ঝড়ে চিমনি দুমড়ে গেল। পেছনের পাঁচিল ভেঙে মালপত্র চুরি হয়ে গেল। করুণাকেতন বেধড়ক ধোলাই খেয়ে হাসপাতালে পড়ে রইলেন তিনমাস। এদিকে এনামেলের জায়গায় এসে গেল স্টেনলেস স্টিল, প্লাস্টিক, হিট রেজিসটেন্ট গ্লাস। পুরো ব্যবসা চৌপাট হয়ে গেল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো। বাড়ি গেল, লন গেল, দোলনা গেল, টেনিস কোর্ট গেল। এইবার তিন নম্বর স্ট্রোক। ভাগ্য আর দেহ দুটোই সেই আঘাতে টাইসনের ঘুষি খাওয়া বক্সারের মতো লুটিয়ে পড়ল রিং-এ। এক থেকে দশ গুণে গেলেন রেফারি। করুণাকেতন উঠতে পারলেন না। মায়ের দেনা শোধ করছে আরতি। মাসের রোজগার সাতশো টাকা। ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিটের ইন্টারেস্ট। আরতির দিকে অনেকেরই নজর আছে। সেই সর্বনাশ আর পৌষ মাসের গল্প। মা যার চরিত্রহীনা, সেই মেয়ে ক'দিন আর ঠিক থাকতে পারে। তিমির বাচ্চা, তিমিই হবে। অনেকেই দাঁতে দাঁত মিশমিশ করে বলে, আঃ, একবার বাগে পেলে হয়। পৃথিবীতে বেশ কিছু মানুষ আছে, যাদের দিবারাত্র এক চিন্তা, কখন একটা মেয়েকে ক্যাঁক করে ধরবো। সামনে দিয়ে কোনও মেয়ে চলে গেলে ভাবে, এই

যাঃ, চলে গেল। চোখে শিকারী বেড়ালের ঘুটঘুটে দৃষ্টি। এদিকে তাকাচ্ছে, ওদিকে তাকাচ্ছে। বন্ধুর বাড়িতে গেছে, বন্ধুর স্ত্রী চা দিতে এসেছে। সেন্টার টেবিলে চা রাখার জন্যে নিচু হয়েছে, অমনি, খপ করে উঠল। বন্ধু জিজ্ঞেস করল, 'কি হল ভাই সন্তু, চা পড়ল গায়ে?' বন্ধুর স্ত্রী জানে কি হয়েছে। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বুকে আঁচল টেনে দিল। আর মুহূর্তমাত্র দাঁড়াল না। চলে গেল ভেতরে। চলে যাবার পর স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'জিনিসটা তোমার কোথাকার আমদানি! চোখে আবার খাবো দৃষ্টি! অসভ্য।'

না, এইবার তৃতীয় উনুনটাকে এশট্যাবলিশ করা যাক। রোগা, পাতলা, অ্যানিমিক এক মহিলা, চেহারা দেখে বয়েস বোঝার উপায় নেই। কুড়িও হতে পারে, চল্লিশও হতে পারে। ঢালাই উনুন, কয়লাটয়লা পড়ে বিশ, ত্রিশ কেজি ওজন হয়েছে। অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে উনুনটাকে ভেতরে নিয়ে গেল। পরক্ষণেই, বাইরের রকে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে একপাশে বসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে দামড়াপানা একটা লোক বেরিয়ে এসে, আকাটের মতো বললে, 'কি, আজ চা-টা হবে? চাঁটা না খেলে তোমার দেখি গতর আর নড়েই না। যে পুজোর যা নৈবেদ্য। বাবু এখানে বসে হাওয়া খাচ্ছেন; ওদিকে আমার দোকান লাটে উঠুক।'

শঙ্কর এই দৃশ্য রোজই দেখে। দেখে, একটা পেটমোটা যমদূতের মতো লোক, অসুস্থ, ক্ষীণজীবী এক মহিলাকে ক্রীতদাসীর মতো ব্যবহার করছে। কে বলেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, মানুষ স্বাধীন হয়েছে, শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রসার হিন্দুসভ্যতা এক সুপ্রাচীন সভ্যতা। বিশ্বের গৌরব। দামড়া লোকটা কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে। হাতিবাগানে স্টল আছে। অনেক রাতে বাড়ি ফেরে, নেশা করে। রোজই বৌটাকে ঘরে খিল দিয়ে পেটায়। অন্যেরা প্রতিবাদ করেছিল, ভদ্রলোকের পাড়ায় এ কি ছোটলোকমি। রোজ রাতে চিৎকার, চেঁচামেচি। দামড়া এখন পলিসি পাল্টেছে। বউয়ের মুখে গামছা পুরে পেটায়। আবার রোজ সকালে টেরিকটনের পাঞ্জাবি, চুস্ত পাজামা পরে, মশলা চিবোতে চিবোতে ব্যবসায় যায়। তখন বোঝাই দায়, লোকটা ইতর না লোকটা ভদ্রলোক। তখন সে রতনবাবু। দুটো পয়সার মুখ দেখেছে। রতনবাবু আবার পার্টি করেন। বলা যায় না, দেশের যা অবস্থা হচ্ছে, এই মালই হয় তো মন্ত্রী হয়ে বসবেন। হয় তো শিক্ষামন্ত্রী হবেন।

শঙ্কর ব্রহ্মদৈত্যের মতো খড়ম খট্‌খটিয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে। তার সেই ছোট ঘরে চারখানা থান ইট আছে। সেই ইট চারটে সরিয়ে প্রাণ ভরে ডন মারে। পঞ্চাশটার কম নয়। শ'খানেক বৈঠক। জানালার গরাদ ধরে ঝুলে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। ব্যায়াম হয়ে যাবার পর, পুরো দু-মুঠো ছোলা খায়। চারটে বাতাসা দিয়ে। তারপর এক লোটা জল। এরপর সে একটা ব্যাগ বগলে বাজারে যায়। শঙ্কর বেশ গুছিয়ে বাজার করতে পারে। সাতটাকা হল তার বাজেট। মাসে দুশো দশ টাকা। মাছ, মাংস, ডিম খাওয়ার পয়সা নেই। এক প্যাকেট দুধ আসে।

দু'বার চা হয়। সকালে একবার, বিকেলে একবার। একটু বেড়াল খায়। যে-টুকু বাঁচে, সেইটুকু সে জোর করে মাকে খাইয়ে দেয়। শঙ্করের বাবার, প্যাকেটের দুধ খাওয়ায় ভীষণ আপত্তি। সংসারের খরচ শঙ্করই কন্ট্রোল করে। মাসে সাতশো টাকার এক পয়সা বেশি খরচ করলে চলবে না। বরং কিছু বাঁচলে ভাল হয়। তিনশো টাকার মতো বাড়ি ভাড়া। শঙ্করদের অবস্থাও এক সময় বেশ ভাল ছিল। বাবা হঠাৎ বসে যাওয়ায় সংসারটা দমে গেছে। শঙ্কর ভাবে, তা যাকগে। চিরকাল মানুষের সমান যায় না। জন্মেছি, জলে পড়েছি। সাঁতার কাটতেই হবে। স্রোতের অনুকূলে, স্রোতের বিপরীতে। যখন, যেমন! হাত-পা সর্বক্ষণ ছুঁড়তেই হবে। তা না হলেই ভুস। অতল তলে। শঙ্কর যেভাবে বেঁচে আছে, সেই বাঁচাটাই তার ভীষণ ভাল লাগে। সকালে ছোলার বদলে ডিম আর টোস্ট হলে তার খুব খারাপ লাগবে। ডাল, ভাত আর যে-কোনও একটা তরকারির বেশি অন্য কিছু হলে সে খেতেই পারবে না।

শঙ্কর যেমন শঙ্করদের সংসার চালায়, আরতি সেইরকম চালায় আরতিদের সংসার। শঙ্কর ছেলে, আরতি মেয়ে। শঙ্কর আর আরতি প্রায় একই সময়ে রাস্তায় নামল। দু'জনেরই হাতে ব্যাগ। আরতির ব্যাগটা সুন্দর, শঙ্করের ব্যাগটা সাদামাটা। আরতির রুচিটা একটু অন্যরকম। তাদের ঘরদোর ওরই মধ্যে বেশ সাজানো-গোছানো। প্রতি মাসে কোনও একটা জায়গা থেকে বেশ কিছু টাকা আসে। আমি জানি, কোথা থেকে আসে! আরতির বাবার কিছু টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড করা আছে। সেই সুদে কোনওরকমে চলে যায়। দুজনের সংসার। ঝামেলা তেমন নেই। আরতি জীবনের সুদিন দেখেছে; তাই এই দুর্দিনে সে একটু বিষণ্ণ। রাস্তায় বেরোলে তার বিষণ্ণতা বেশি বোঝা যায়। উদাস দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাতে তাকাতে চলে। যেন সে হেঁটে চলেছে জগৎ-সংসারের বাইরে দিয়ে।

শঙ্কর রাস্তায় বেরোলেই পাড়ার কয়েকটা বাচ্চা তাকে ঘিরে ধরে। ওরা সব শঙ্করের বন্ধু। বাচ্চাগুলোকে শঙ্কর ভীষণ ভালবাসে। তাদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন সমবয়সী। খেলার কথা, পড়ার কথা, খাওয়ার কথা। বাড়িতে কিছু তৈরি হলে শঙ্করের জন্যে নিয়ে আসে পকেটে করে। ঠোঙায় করে। এই বাচ্চাদের সঙ্গে শঙ্কর মাঝে মাঝে চড়ুইভাতি করে। সে বেশ মজা। কেউ নিয়ে এল আলু। কেউ নিয়ে এল ময়দা। কেউ তেল। বনস্পতি। শঙ্করেরও সমান ভাগ থাকে। একটা কেরোসিন কুকার আছে। অপুদের বাড়ির ছাদে, জমে গেল বনভোজন। শঙ্কর রাঁধে, বাচ্চারা জোগাড়ে। কখনও কখনও শ্যামলী এসে যোগ দেয়, সেদিন রান্নাটা বেশ খোলতাই হয়। শালপাতা। লুচি, আলুরদম, শুকনো শুকনো। শঙ্কর সন্ধেবেলা বাচ্চাগুলোকে এক জায়গায় করে পড়তে বসায়। তখন তার ভূমিকা শিক্ষকের। এদের কারোরই অবস্থা তেমন ভাল নয়। শঙ্করের একটাই ভয়, পৃথিবীর প্রতিযোগিতায় ওরা যেন বড়লোকদের কাছে হেরে না যায়। যত সুযোগ ওরাই তো গ্রাস করে নিচ্ছে। ভাল বাড়ি। ভাল স্কুল, ভাল

খাওয়া, ভাল পরা। রাস্তা দিয়ে যখন গাড়ি হাঁকিয়ে যায়, তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এদের সঙ্গে ট্রেনের এক কামরায় ভ্রমণ করা যায় না। সিনেমা, থিয়েটারে বসা যায় না। রেস্তোরাঁয় ঢোকা যায় না। এদের অর্থের উৎস হল ব্যবসার দুনম্বরী পয়সা। চাকরি হলে বাঁ হাতের কামাই। পয়সার জোরে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, বিলেত, সুন্দরী স্ত্রী। পৃথিবীর সমস্ত ঝোল এরা নিজেদের কোলেই টানছে। একটা বাচ্চা একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তার চিকিৎসার জন্যে শঙ্কর সাহায্য সংগ্রহে বেরিয়েছিল। পাড়ার সকলেই সামর্থ্য অনুসারে যে যা পারলেন, দিলেন। পাড়ার বড়লোক শিল্পপতি মানিক ব্রহ্ম বললেন, 'চাঁদা তুলে তুমি ক'জনের চিকিৎসা করাবে? সারা দেশটাই তো অসুস্থ। এই সব দায়িত্ব হল স্টেটের।' ভুরু কুঁচকে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'আমাদের দেশের সমস্যাটা কি বল তো, এই রকেটের যুগে আমরা এখনও পড়ে আছি পল্লীমঙ্গলের আইডিয়া নিয়ে। ও-সব বাজে কাজ ছেড়ে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর। কিছু মরবে, কিছু বাঁচবে। যাদের বাঁচার অধিকার নেই, তাদের মরতে দাও। একটা গাছে যত ফল ধরে সবই কি আর বাঁচে, পাকে? কিছু পাখিতে ফেলে দেয় ঠুকরে। কিছু পড়ে যায় ঝড়ে। কিছুতে পোকা লেগে যায়। জীবজগতের এই হল নিয়ম। তুমি কি করবে, আমিই বা কি করব!' মানিক ব্রহ্ম আচ্ছা করে উপদেশ পাম্প করে শঙ্করকে ছেড়ে দিলেন। এদেশে তিনটে জিনিস খুব সহজে পাওয়া যায় বিনা পয়সায়। কলের জল, উপদেশ আর গণধোলাই।

অপুটাকে দেখতে ভারি সুন্দর; কিন্তু ভাগ্যটা ভীষণ অসুন্দর। তিনবছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছে। ভদ্রলোক হাওড়ার এক ঢালাই কারখানায় কাজ করতেন। সেইখানে এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। স্ত্রী, ছেলে, বৃদ্ধা মা আর সাবেককালের একটা একতলা বাড়ি রেখে গেছেন। অপুর মা যে কীভাবে সংসার চালান, শঙ্কর তা জানে না। সবাই আশা করেছিলেন, অপুর মা বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে বেড়াবে। অন্তত পাড়ার লোক একজন সুন্দরী, যুবতী ঝি পাবে। সে গুড়ে বালি। অপুর মা আজ সাত-সাতটা বছর ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছেন, ভদ্রঘরের বউদের যেমন চালানো উচিত। এই নিয়েও গবেষণার শেষ নেই। একটা সিদ্ধান্তে এসে এখন সবাই বেশ সন্তুষ্ট, অপুর মা লুকিয়ে দেহ-ব্যবসা করে। আরে ছিঃ ছিঃ। এই ছি-ছি শব্দটা বলতে পারায় সকলেরই বেশ কোষ্ঠ-সাফ।

অপু শঙ্করের হাতে একটা কাগজের মোড়ক দিয়ে বললে, 'মা তিলের নাড়ু করেছিল, তোমার জন্যে নিয়ে এলুম। জিনিসটা কেমন হয়েছে, খেয়ে বল তো। তুমি তো তিলের নাড়ু ভালবাস।'

'ভালবাসি মানে! তিলের নাড়ু আমার জীবন। গোলাপের গন্ধ আছে?'

'না গো, গোলাপ আমরা পাবো কোথায়! শোনো না, আমি অনেক অনেক

বড় হয়ে, যখন তোমার মতো বড় হয়ে যাব, তখন তো আমি চাকরি করব, তখন তোমাকে আমি গোলাপ দিয়ে তিলের নাড়ু খাওয়াব, প্যাঁড়া খাওয়াব।'

'বড় হলেই কি আর চাকরি পাওয়া যায় রে অপু। এই তো দেখ না, আমি বড় হয়ে বসে আছি।'

'তুমি চাকরি পাওনি তো, সে বেশ হয়েছে। কেন বল তো, তুমি চাকরি পেলে, রোজ ন'টার সময় বেরিয়ে যাবে, আর রাত ন'টায় ফিরে আসবে, তাহলে আমাদের কি হবে, বল। তুমি শঙ্করদা চাকরি কোরো না। তুমি একটা দোকান দাও। আমার মা বলছিল, আমাদের রাস্তার দিকের ঘরের দেয়ালটা ভাঙলে সুন্দর একটা দোকানঘর হবে। সেখানে একটা দর্জির দোকান করলে কেমন হয়! তা মা বললে, আমি তো ছাঁটকাট বেশ ভালই জানি, সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষ থাকলে করা যেত। তুমি আজ মায়ের সঙ্গে কথা বল না শঙ্করদা। আমার তাহলে টেবিফিক আনন্দ হয়।'

'তোর না অপু কোনও বুদ্ধি নেই, একেবারে গবেট মেরে যাচ্ছিস। অঙ্কে তুই রসগোল্লা পাবি। দোকান করতে গেলে টাকা চাই! অ্যাতো, অ্যাতো টাকা। সেই টাকাটা কোথা থেকে আসবে পাঁঠা!'

'টাকা?' কথা হচ্ছিল রকে বসে। অপু গালে হাত রাখল। শঙ্কর অপুর সেই ভঙ্গিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মোড়ক খুলে একটা তিলের নাড়ু মুখে ফেলল। বেশ মুচমুচে। পাকটা বেশ ভালই হয়েছে।

অপু হঠাৎ যেন আশার আলো দেখতে পেল। গাল থেকে হাত সরিয়ে শঙ্করের হাঁটুতে একটা চাপড় মেরে বললে, 'নো প্রবলেম! আমরা এ বছর মা দুর্গার পুজো করবো। বারোয়ারি।'

'হচ্ছে দোকানের কথা, তুই চলে গেলি দুর্গাপুজোয়। তুই কেমন করে ফার্স্ট-সেকেন্ড হোস। আয়, তোর মাথাটা ওপেন করে দেখি।'

'শোনো না, আমার প্ল্যানটা। তারপর তুমি আমাকে গাধা বলো গাধা, পাঁঠা বল পাঁঠা। আমরা ঘুরে ঘুরে, ঘুরে ঘুরে অনেক টাকা চাঁদা তুলবো; তারপর ছোট্ট এতটুকু একটা মূর্তি এনে পুজো করে, বাকি টাকায় দোকান।'

শঙ্কর অপুর মাথায় টাক করে একটা গাট্টা মেরে বললে, 'ওরে আমার চাঁদুরে! তারপর গণধোলাই। হাতে হাতকড়া। কোমরে দড়ি। কি প্ল্যানই বের করলে।'

'তা হলেও তুমি একবার আমার মায়ের সঙ্গে কথা বল। জান তো, তোমাদের বাড়ির ওই রতনবাবু মাকে খুব জপাচ্ছে। লেডিজ টেলারিং করবে। লোকটা একেবারে দু-নম্বরী। যখন তখন আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। কাল রাতে চুল্লু খেয়ে এসেছিল। আমি কিন্তু একদিন পেছন থেকে ঝেড়ে দোবো, লোকটা কাল রাতে আমার মায়ের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করেছিল। শঙ্করদা তুমি আমার মাকে ভালবাস তো?'

'ভীষণ! যারা সৎপথে থেকে লড়াই করে, আমি তাদের সকলকেই ভালবাসি।'

'মা-ও তোমাকে ভীষণ ভালবাসে। তুমি একটা কিছু কর শঙ্করদা।'

'দাঁড়া, ব্যাপারটা সিরিয়াসলি ভেবে দেখি। আজ দুপুরে তুই আমাকে মিট কর। তারপর দু'জনে মিলে লড়ে যাব। তুই ভাইরাস কাকে বলে জানিস?'

'না গো।'

'ভাইরাস এমন রোগ জীবাণু, যা কোনও ওষুধে মরে না। এই রতন-টতন হল সেই ভাইরাস।'

'তিলের নাড়ু কেমন খেলে?'

'জমে গেছে।'

'মাকে গিয়ে বলতে হবে। মা তোমাকে ভীষণ খাওয়াতে ভালবাসে। বলে, আমার যদি সেরকম অবস্থা হত, তাহলে তোর শঙ্করদাকে আমি রোজ রোজ নানারকম করে করে খাওয়াতুম। আমার মা কত কি যে করতে জানে।'

'সে আর কি হবে। বেশি বাজে বাজে খাবি না। পেলেও না। ডাল, ভাত, একটা যে কোনও তরকারি, বাকি সব বোগাস। এই নে, এই দুটো নাড়ু তুই খা।'

'আমি তো খেয়েছি।'

'তবু খা। আমি দিচ্ছি।'

শঙ্কর শিশুমহল ছেড়ে উঠে পড়ল। শঙ্করের কড়া নিয়ম, এইবার সব পড়তে বসবে। সবাই জানে, ঠিক মতো লেখাপড়া না করলে শঙ্করদা আর ভালবাসবে না। তা ছাড়া শঙ্করদা ওই বড় বাড়ির ছেলেদের দেখিয়ে বলে দিয়েছে, ওদের হারাতে হবে। লেখাপড়ায়, খেলাধুলোয়, শরীর-স্বাস্থ্যে। ওই যে ছাইরঙের বাড়ির ছেলেরা খুব কেতা মেরে, সাদা প্যান্ট, স্পোর্টস গেঞ্জি পরে ক্রিকেট প্র্যাকটিস করতে বেরোয়। ব্যাট, লেগগার্ড, গ্লাভস, টুপি, ওয়াটার বটল, হটবক্সে লাঞ্চ। শঙ্করদা বলেছে, তোরা কাঠের বল আর দিশি ব্যাটে অনেক বড় খেলোয়াড় হবি। শরীরটাকে আগে ভাল করে পেটা। লোহা তৈরি কর। লোহা! শঙ্কর যা বলে, এরা তাই শোনে। শুধু শোনে না, প্রত্যেকে ভালভাবে গড়ে উঠছে।

শঙ্কর যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে তখন মনে হয় রাস্তার দু'ধারে আনন্দ ছড়াতে ছড়াতে চলেছে। এ-পাড়ার প্রতিটি মানুষ তাকে ভীষণ ভালবাসে, কারণ শঙ্কর সকলের। শঙ্করের সেই শিক্ষকমহাশয় অনেকদিন আগে শঙ্করকে বলেছিলেন, 'দেখ শঙ্কর, ভাগ্য কাকে বলে জান?'

'গ্রহ।'

'না, গ্রহ যাদের ভাগ্য, তারা হল দুর্বল, স্বার্থপর। একটা জিনিস চিরকালের জন্যে জেনে রাখ, সবলের জন্যে গ্রহ, নক্ষত্র, ঠিকুজী, কোষ্ঠী, পাথর নয়। তুমি আর তোমার পৃথিবী। মাঝখানে কেউ নেই, মাথার ওপরেও কেউ নেই। এই

পৃথিবীর সঙ্গে যে-সম্পর্ক তুমি গড়ে তুলবে সেইটাই তোমার ভাগ্য। পৃথিবীর সঙ্গে যদি ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পার, তাহলেই তুমি সফল মানুষ। কৃতী পুরুষ। পৃথিবী মানে শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু, প্রকৃতি। আর পৃথিবীর সঙ্গে যদি তোমার ঘৃণার সম্পর্ক হয়, তাহলে অন্যভাবে তুমি যত সফলই হও, পৃথিবী তোমার কাছে আর স্বর্গ থাকে না, হয়ে যাবে নরক।' শিক্ষকমহাশয় বারে বারে ইংরেজি করে বলেছিলেন, 'ইউ অ্যান্ড ইওর ওয়ালর্ড।'

শঙ্কর সেই শিক্ষাটিই মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে। প্রথম প্রথম অভ্যাস করতে হয়েছে। এখন স্বভাবে এসে গেছে। এখন সে চেষ্টা না করেও ভালবাসতে পারে। কোনও কারণ ছাড়াই আনন্দে থাকতে পারে, আনন্দ বিলোতে পারে। শঙ্কর যে বাজারে বাজার করে সেই বাজারের বাইরে চাষীরা এসে বসে। তারা কিছু সস্তায় আনাজপাতি দেয়। শঙ্কর তাই অকারণে ভেতরের বাজারে ঢোকে না। ভেতরে সব পয়সাওলা লোকের তাণ্ডব। কেউ অসময়ের কপি কিনছে, কেউ কিনছে টোম্যাটো। কারোর আবার বিট-গাজর না হলে চলে না। বইয়ে পড়েছে, বিট-গাজরে হেলথ ভাল হয়, আর যায় কোথায়। পুলিসের আস্তাবলে ঘোড়া গাজর খাচ্ছে, এদিকে গুপীবাবুও খাবার টেবিলে বসে গাজরের স্যুপ খাচ্ছেন। মুখ-চোখ দেখলে করুণা হয়, মনে হয় সতীদাহর বদলে পতি-দাহ হচ্ছে।

শঙ্কর দূর থেকে দেখলে, ফুলের দোকানের সামনে বেশ যেন একটা গণ্ডগোল মতো হচ্ছে। ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। শঙ্কর দোকানটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখল, গোলমালটা হচ্ছে আরতির সঙ্গে। ফুলওলার গলাই বেশি কানে আসছে। শঙ্কর প্রথমে ভেবেছিল নাক গলাবে না। মেয়েদের ব্যাপারে সে মাথা ঘামাতে চায় না। কখন কি হয়ে যায়! মন নয় তো মতিভ্রম। কোনওভাবে একবার খপ্পরে পড়ে গেলেই সংসার। তখন কামিনী-কাঞ্চনের দাসত্ব। মেয়েরা মানুষের সত্তা হরণ করে। নাকে দড়ি বেঁধে সংসারের ঘানিতে জুতে দেয়। এত ভেবেও শঙ্কর না এগিয়ে পারল না। পাশ থেকে সে আরতির মুখটা দেখতে পেল। ধারাল, অভিজাত একটি মুখ। টিকলো নাক। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা রেশমের মত চুল। আরতিকে বাইরের আলোয় আরও ফর্সা দেখায়। টান টান পাতলা দেহত্বকের ভেতর থেকে রক্তের আভা বেরিয়ে আসে। সাধারণ বাঙালি মেয়ের চেয়ে দীর্ঘকায়। শরীরের কোথাও অপ্রয়োজনীয় মেদ নেই। শঙ্করের মনে হচ্ছিল, সে যেন শাড়ি পরা একটা জিপসী মেয়েকে পাশ থেকে দেখছে। মুখে ফুটে আছে অসহায় একটা বিরক্তির ভাব। আরতি কথা বলছে খুবই নিচু স্বরে, ফুলওলা চিৎকার করছে গাঁক গাঁক করে। আরতির বিব্রত আর বিরক্ত মুখ দেখে শঙ্করের খুব করুণা হল। এই শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে শঙ্কর সরে থাকতেই চায়। অবস্থা থেকে পতন হলেও, আরতিরা ক্যাপিটালিস্ট মনোবৃত্তির মানুষ। বাবা ছিলেন শিল্পপতি। বহুলোক কাজ করত তাঁর কারখানায়। তিনি ডাণ্ডা ঘোরাতেন। দুর্ব্যবহার করতেন। ন্যায্য দাবি থেকে তাদের বঞ্চিত করতেন। আজ জার্মানি,

কাল প্যারিস করে বেড়াতেন। বিলিতি সুরার সঙ্গে মোলায়েম চিকেন খেতেন। শ্রমিকের রক্ত শোষণ করতেন।

এই অবধি শুনে চিত্র পরিচালক আর প্রয়োজক দু'জনেই চিৎকার করে উঠলেন, 'মারো ফ্ল্যাশব্যাক। লোকটাকে তুলুন বিছানা থেকে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা চরিত্র বিছানায় শুয়ে থাকলে চলে। এখ শুয়ে শুয়ে আর কোঁত পেড়ে পয়সা নিয়ে যাবে। তা ছাড়া স্টোরির এই জায়গায় একটা অবৈধ প্রণয়ের স্কোপ আছে।'

কথা বলছিলেন প্রযোজক। দশটা কোল্ড স্টোরেজের মালিক। চারটে পশ্চিমবাংলায়। সেখানে পা থেকে মাথা পর্যন্ত হরিপাল আর তারকেশ্বরের আলু। আলুর একেবারে এক্সপার্ট। কোন আলু কখন পচবে, একবার উঁকি মেরেই বলতে পারেন। এম পি-তে দুটো কোল্ড স্টোর। সেখানে শুধু ডিম। ইউ পি-তে আপেল। একসময় উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা ছিল, শিরা কেটে খানিক রক্ত বের করে দেওয়া। প্রযোজক ভদ্রলোকের তহবিলে কিছু কালো রক্ত জমেছে। সেই রক্ত কিঞ্চিৎ ঝরাবেন। নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে একটু গা ঘষাঘষি করবেন। প্রতিষ্ঠিতরা তেমন পাত্তা দেবেন না। নতুন মুখ আনবেন।

ঠিক তাই। প্রযোজক পরিচালককে বললেন, 'আরতির ক্যারেকটারটা বেশ ফুটছে। আপনি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিন—আমাদের নতুন বাংলা ছবির জন্যে নতুন নায়িকা চাই। যাঁদের চেহারা জিপসীদের মতো। কোমর সরু, পেছন ভারি, বুক উঁচু, ছবি-সহ আবেদন করুন। ফুল সাইজ। সামনে থেকে, পেছন থেকে, পাশ থেকে।

পরিচালক বললেন, 'তারপর আমি প্যাঁদানি খেয়ে মরি। দমদম সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে লপসি আর ধোলাই দুটোই একসঙ্গে খাই। নতুন মুখ আজকাল আর পেপার পাবলিসিটি দিয়ে হয় না। দিনকাল বিগড়ে গেছে। ট্যালেন্ট সার্চ করতে হয়। বড় বড় হোটেল-রেস্তোরাঁয় রোজ দুপুর থেকে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত গিয়ে বসে থাকতে হয়। বিশ-তিরিশ হাজার খরচ হয় হোক, কিন্তু উঠে আসবে একটা নতুন মুখ।'

'আপনার মশাই সবেতেই টাকা ওড়াবার ধান্দা।'

'এই লাইনটাই যে ওড়বার আর ওড়াবার।'

পরিচালক আমাকে বললেন, 'আমার একটা সাজেশান আছে। আপনি ফুলের দোকানের বদলে ওটাকে তরমুজের দোকান করে দিন। আমার একটু সুবিধে হয়।'

'কি আশ্চর্য! আপনার সুবিধে! আরতির আজ একটা ফুলের মালার প্রয়োজন যে। তার বাবার আজ জন্মদিন। তাছাড়া, এটা কি তরমুজের সময়। আম চলে গেছে। আপেল ঢুকছে! আঙুর আসছে। কমলালেবু পাকছে।'

'আপনাকে সে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আই সে তরমুজ, অ্যান্ড দেয়ার শুড

বি তরমুজ। লাল, লাল অজস্র গোল গোল তরমুজ ডাঁই হয়ে আছে। তরমুজ হল সেক্স-সিম্বল। আমি আমার ক্যামেরার অ্যাঙ্গল থেকে ভাবছি: একটা সাইড থেকে ধরছি। কিছু তরমুজ ফোকাসে, কিছু অফ ফোকাসে। কাঁধকাটা গেঞ্জি-পরা তরমুজওলার চকচকে পুরুষ্ট কাঁধ, বাহু, ঘাড়, গলায় একটা লকেট। চোখ দুটো কমলাভোগের মতো। ক্যামেরা ধীরে ধীরে প্যান করছে। তরমুজওলার ছাপকা ছাপকা নীল লুঙ্গি। তার আড়ালে স্তম্ভের মতো উরু। ক্যামেরা ঘুরছে, সামনে দাঁড়িপাল্লা, তরমুজ, তরমুজ, আরতির বুক। ক্যামেরা আরতির গা চেটে চেটে উঠছে ওপর দিকে। ঘাড়, গলা, চিবুক, মুখ, চুল, ব্যাকলাইটে সিল্কের কেশরের মতো, চুল বেয়ে আবার নিচে, পিঠ, নিতম্ব, ক্যামেরা ব্যাক করছে, আরতির পুরো শরীর, সামনে তরমুজ, তার ওপাশে তরমুজওলার অশ্লীল মুখ। ক্যামেরা টপে। আরতির ব্রেস্টলাইন, বুকের কাছে মোমপালিশ করা লাল একটা তরমুজ, ফর্সা টুকটুকে হাতে ধরে আছে। শর্ট ডিজলভ। এক গেলাস লাল তরমুজের সরবত নিয়ে আরতি এগিয়ে আসছে, শঙ্কর বসে আছে সোফায়। আরতি স্লো-মোশানে আসছে। তার ম্যাকসি আর চুল বাতাসে উড়ছে। সে স্লো-মোশানে এসে তুলোর মেয়ের মতো শঙ্করের সোফার হাতলে শরীরে শরীর ঠেকিয়ে বসে পড়ল। বাঁ-হাত শঙ্করের কাঁধে, ডান হাতে পাতলা গেলাস। গেলাসে লাল তরমুজের সরবত। এইখানে একটা গানের স্কোপ। গজল টাইপের গান, ফুরোবার আগে পান করে নাও থ্যাতলানো যৌবন। আর ক'দিনই বা পৃথিবীতে আছি, বলো না আলাদিন। আলাদিন। আলাদিন। এইখানে ইকো লাগাবো। একেবারে ফেটে যাবে। এদিকে গান আর নাচ চলেছে। ওদিক থেকে মরা মাছের মতো তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ দুটো চোখ। ইনভ্যালিড বুড়ো বাপ দেখছে মেয়ের রঙ্গ। শরীর পড়ে গেছে। কথা সরে না মুখে; কিন্তু স্মৃতি আর চেতনা দুটোই কাজ করছে। ফের এগেন ফ্ল্যাশ-ব্যাক। আরতির মা বাতাসে উড়তে উড়তে আসছে, ব্যালে ড্যান্সারের পোশাক পরে। বাংলা ছবিতে ব্যালে আমিই প্রথম চালু করব। আরতির ডবল রোল। একবার মা, একবার মেয়ে। মেয়েকে দেখে বাপের মেয়ের মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এক ঢিলে দু'পাখি। কায়দা করে বুড়োর ললিতা কমপ্লেক্স দেখানো হয়ে গেল।'

প্রযোজক বললেন, 'আর শঙ্করকে দিয়ে অত ভাবিয়েছেন কেন? সিনেমায় ভাবনার কোনও স্কোপ নেই, কেবল অ্যাকসান, অ্যাকসান।'

'সে তো আপনার দিক। আমাকে তো গল্পটা আগে ছাপাতে হবে। সাহিত্যে একটু জীবনদর্শন, চিন্তাভাবনা, এসব চায়। প্রুস্ত-এর নাম শুনেছেন! সেই ভদ্রলোকের লেখায় শুধুই ভাবনা। ভাবতে ভাবতেই শেষ। আগে আমাকে সাহিত্যের কথা ভাবতে হবে। আপনারা তো প্রথমে আমাকে পাঁচশোটি টাকা ছুঁইয়ে সরে পড়বেন, তারপর তো আপনাদের আর টিকির দেখা পাওয়া যাবে না।'

'ওটা আমাদের লাইনের একটা রীতি। লেখককে বলি দিয়ে আমাদের শুভমহরত হয়। প্রাচীনকালে কি প্রথা ছিল জানেন, ব্রিজ তৈরির সময় নরবলি

দেওয়া হত। একটাকে মেরে আরও হাজারটা মৃত্যু ঠেকানো। ব্রিজও বড় কাজ, ফিল্মও বড় কাজ। বিশ, তিরিশ লাখ টাকা গলে যাবে।'

'আপনার বাজেট চল্লিশ, পঞ্চাশ লাখ, আর লেখক বেচারার পাওনা পাঁচশো! কি বিচার মাইরি আপনাদের!'

'না, পাঁচশো নয়। আপনাদেরও তো পয়সার খাঁকতি কম নয়। কচলাকচলি, ধস্তাধস্তি করে সেই হাজার পাঁচেকেই গিয়ে ঠেকে। সেকালের সাহিত্যিক তো আর নেই। তাঁরা সাহিত্যটাই বুঝতেন। আপনারা সাহিত্য বোঝেন না, কেবল বোঝেন টাকা আর পুরস্কার। শেম! শেম! সাহিত্য-সেবা করুন। সরস্বতীর সেবা। লক্ষ্মীর সেবা নয়। তিন পাতা কি লিখলেন তার ঠিক নেই, আধবোতল হুইস্কি উড়ে গেল।'

প্রযোজক বললেন, 'আমি আর একটা জায়গায় সাংঘাতিক রকমের সেক্স, রেপ আর ভায়োলেন্স দেখতে পাচ্ছি। কড়া মশালা। অপুর মা। মধ্যবয়সী এক মহিলা। আট কি ন'বছর বয়সের একটা ছেলের মা। সাবেককালের একতলা একটা বাড়ি। গাঁথনির ইট সব ফাঁক ফাঁক হয়ে গেছে। সেই ইটের ফাঁকে আটকে ঝুলছে সাপের খোলস। তার মানে ভিটেতে বাস্তু সাপ বসে আছে ঘাপটি মেরে। সাপের খোলস দেখলেই গা সিরসির করে। সেই সিরসিরে ভাবটা এসট্যাবলিশ করতে হবে। খোলস দুলছে বাতাসে, বাতাসে দুলছে শাড়ি। প্রতীকী ব্যাপার। সাপ এখনও আছে। ছোবল এখনও মারতে পারে। সিনেমার প্রতীকী শট হল, আপনাদের সাহিত্যের ভাবনা। মহিলার ভরাট শরীর, যাকে বলে রাইপ যৌবন। সুন্দরী তো বটেই। ডিসপেপটিক নয়। স্বামীর মৃত্যুর পর অনেক বছর হয়ে গেছে। স্মৃতি ফেডআউট করেছে। শরীর শরীরের ধর্ম পালন করতে চায়। মন আনচান করে। সব শাসন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। যত রাত বাড়ে শ্বাস ততই দীর্ঘ হয়। জ্বর নয়, জ্বর-জ্বর লাগে।'

'এ তো আপনার সাহিত্য।'

'সাহিত্য তো বটেই। এক সময় আমিও লিখতুম মশাই। আলুতে আমাকে শেষ করে দিয়েছে।'

'সাহিত্য পর্দায় আসবে কি করে। পেছন থেকে কমেন্ট্রি হবে। ভারি গলায় কোনও শ্রেষ্ঠ আবৃত্তিকার পাঠ করে যাবেন, এঁর বগলে থার্মোমিটার দিলে জ্বর উঠবে না, কিন্তু সূর্য পশ্চিম আকাশে নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এঁর জ্বর-জ্বর লাগে। আড়মোড়া ভাঙতে ইচ্ছে করে।'

প্রযোজক চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মুখে হুইস্কির গন্ধ হালকা হয়ে এসেছে। বুকের কাছে বিলিতি গন্ধ ছুঁড়েছিলেন, সেই গন্ধে শরীরের গন্ধ মিলে, মানুষের জীবনের বেঁচে থাকার বিচিত্র এক সুবাস তৈরি হয়েছে।

'কি হল মশাই?'

'আপনাকে এখুনি আমি পাঁচশো টাকা অ্যাডভান্স করে যাব; এ স্টোরি আমার চাই।'

'আপনার এই আকস্মিক উত্তেজনার কারণ?'

'উঃ, অসাধারণ একটা কথা আপনি বললেন, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

'কি কথা মশাই?'

'ওই যে বগল আর থার্মোমিটার। সুন্দরী এক মহিলা নিজের বগলে নিজে থার্মোমিটার গুঁজছেন। ভাবতে পারেন দৃশ্যটা? আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। দৃশ্যটা সামনে করিয়ে এখুনি দেখতে ইচ্ছে করছে।'

প্রযোজক উত্তেজনায় চেয়ার মিস করে ধুপ করে মেঝেতে বসে পড়লেন। সেই অবস্থায় থেকেই বললেন, 'ডিরেক্টার, এই রোলটা কে নেবে? কাকে দেওয়া যায়। সেই যে সেই মহিলা, কি যেন একটা ছবিতে করলেন, বিবাহিতা হয়েও ফটোগ্রাফারের সঙ্গে লড়ালড়ি।'

'বুঝেছি। ভালই হবে।'

'তুমি তা হলে বুক করে ফেল। যত টাকা লাগে। যদ্দিন আমার আলু আছে, তদ্দিন আমার টাকার অভাব নেই। কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?'

'বোম্বাই।'

'তুমি আজই ফ্লাই কর।'

পরিচালক বললেন, 'ফুলটাকে তাহলে তরমুজ করে দিন। আমি একটা বিউটি অ্যান্ড দি বিস্ট ধরনের মারাত্মক শট নিয়ে বাংলার কেন, সারা বিশ্বের চিত্রজগৎকে স্তম্ভিত করে দেব।'

প্রযোজক বললেন, 'তরমুজের বদলে আলু করলে হয় না। আমার খরচ তাহলে কমে।'

'ধুর মশাই, আলুর কোনও গ্ল্যামার নেই। কালার ফিল্মে আলু যায় না। তরমুজ হল ইতালির জিনিস। ইতালি মানে সোফিয়া লোরেন, ব্রিজিৎবার্দো। ডিরেক্টার আমি না আপনি?'

'আমি প্রযোজনা না করলে তোমার পরিচালনা হয় কি করে?'

'আর আমি ভাল ছবি না করে দিলে, আপনার বিদেশ যাওয়া হয় কি করে? আলু করে তো আর ফরেন যাওয়া যায় না।' প্রযোজক একটু দমে গেলেন। ব্রিফকেস খুলে ময়লা ময়লা পাঁচটা একশো টাকার নোট বের করে আমার হাতে দিতে দিতে বললেন, 'আলুর আড়তের নোট এর চেয়ে পরিষ্কার হয় না। আপনি বগল আর থার্মোমিটারটা ঠিক করুন। আর একটা জায়গা আপনি কামাল করে দিয়েছেন, সেটা হল সেলাই মেশিন। উঃ, আপনার মাথা মশাই। মাথা না বলে হেড বলাই ভাল।'

'সেলাই মেশিন পেলেন কোথায়?'

'কি আশ্চর্য, এই আপনার হেডের প্রশংসা করলুম। অপুর মা টেলারিং করবে। শঙ্কর জয়েন করবে, এইরকমই তো ঠিক হল।'

'গল্প সেদিকে যায় কি না দেখি। এখনও তো ফুলের দোকানেই আটকে আছে।'

'যায় মানে। যাওয়াতেই হবে। অপুর মা জোরে জোরে সেলাইকল চালাচ্ছে, শঙ্কর ঠিক উল্টোদিকে মেঝেতে বসে আছে। এইখান থেকেই স্টোরিতে শঙ্করের পতনের শুরু। দুটো গোল গোল পা আর ভারি উরু মেশিনের তালে তালে নাচছে। শঙ্করের মনও নাচছে। নামছে, নিচের দিকে নামছে। ক্যাবারে ড্যান্সারের পোশাকের মতো আদর্শ খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে।'

পরিচালক বললেন, 'বাকিটা আমার হাতে ছেড়ে দিন। এই শটেও আমি ফ্র্যাকচার করে দেব। মেশিনের চাকা ঘুরছে, চাকা ঘুরছে। ক্যামেরা ক্লোজ ফোকাসে ঘুরন্ত চাকা ধরছে। চাকা ধীরে ধীরে নেমে আসছে, আর সেই চাকার ভেতর দিয়ে টাইট-ফোকাসে দু-জোড়া পা, মেঝেতে জড়াজড়ি, ঘষাঘষি, মহিলার কলাগাছের কাণ্ডের মতো পায়ের অনেকটা ওপরে শাড়ির কালো ফিতে পাড়। একটা হাত, মাথার পাশে মাথা, আর একটা হাত, একটা বড় কাঁচি, ক্লোজআপে।'

প্রযোজক বললেন, 'এইবার আমার হাতে ছেড়ে দাও। কাঁচিটাকে আরও ক্লোজ-আপে নিয়ে এস। উল্টোদিকের দরজাটা অল্প ফাঁক হল। একটি কিশোরের মুখ। বড় বড় চোখ। চোখ ভরা বিস্ময়। ছেলেটি আততায়ীর মতো ঢুকছে। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে কাঁচিটার দিকে। নিচু হয়ে তুলে নিল কাঁচিটা। তারপর ক্যামেরার ভিসানে একটা তালগোল পাকানো দৃশ্য। একটা হাত উঠল। একটা কাঁচি। ভীষণ একটা চিৎকার। সেলাই মেশিনটা উল্টে পড়ে গেল। শঙ্কর উপুড় হয়ে আছে। তলায় অপুর মা। শঙ্করের পিঠে বড় কাঁচিটার আধখানা ঢুকে আছে। আর রক্ত-ভেজা সেই পিঠে মুখ গুঁজে অপু হাপুস কাঁদছে আর বলছে, শঙ্করদা, শঙ্করদা তুমি আমার শঙ্করদা। আর শঙ্কর ওই অবস্থায় ফ্যাঁসফেসে গলায় বলছে, অপু, তুই ঠিক করেছিস, তুই ঠিক করেছিস, তোকে কেউ বুঝবে না, তুই পালা। তুই সোজা পালিয়ে যা। তা না হলে তোকে পুলিসে ধরবে। অপু উঠে দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে তাকাল এদিকে, ওদিকে। তারপর হঠাৎ দু'হাতে দরজাটা ঠেলে খুলে, পাগলের মতো ছুটতে লাগল, আর চিৎকার, 'আমি খুন করেছি, আমি খুন করেছি।'

পরিচালক বললেন, 'এইবার আমার হাতে ছেড়ে দিন। লম্বা, সোজা রাস্তা ধরে অপু ছুটছে, ছুটতে ছুটতে অপু হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল। বিশাল একটা লরি আসছিল স্পিডে। চাকার সামনে অপুর মাথা। ব্রেক। স্ত্রী-ই-ই-চ শব্দ। অপুর ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা। পাশে হাত রাখল। মা নেই। অপু বোঝার চেষ্টা করছে।'

প্রযোজক বললেন, 'আগের শটটাকে স্বপ্ন করে দিলে?'

'তা কি করব! মাঝ রাস্তায় হিরোকে মেরে দেব। তাহলে বই তো মার খেয়ে

ভূত হয়ে যাবে। চুপ করে শুনুন। এইবার রিয়েল খেল। অপুর কানে একটা শব্দ আসছে। যেন কোথাও দুটো সাপ ফোঁস ফোঁস করছে। অপু বিছানায় উঠে বসল। ঘর অন্ধকার। একটা মাত্র জানালা খোলা। সেই খোলা জানালায় রাতের আকাশ। দূরে কোথাও একটা কুকুর কাঁদছে। অপু বসে আছে চুপ করে। সেই ফোঁস ফোঁস শব্দটা এখনও কানে আসছে। ক্যামেরা একবার বাড়িটার বাইরে ঘুরে গেল। জনপদ নিদ্রিত। অনেক উঁচু একটা বাড়ির সর্বোচ্চ তলের একটি ঘরে, জোরালো আলো। একটা মানুষের সিল্যুয়েট। অপুদের বাড়ির ইটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসা হিলহিলে সেই সাপের খোলসটা বাতাসে দুলছে। পাশের বাড়ির টিভির অ্যান্টেনায় প্রায় টাটকা একটা ঘুড়ি বাতাসে বনবন ঘুরছে। তার পাশেই একটা বাড়ির কবজা ভাঙা জানালার পাল্লা যেন ভূতে দোলাচ্ছে। ক্যামেরা আবার ফিরে এল ঘরে। অপু বসে আছে মশারির ভেতরে। সেই ফোঁস ফোঁস শব্দ। অপু মশারি তুলে নেমে এল। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। খোলার চেষ্টা করল। বাইরে থেকে বন্ধ। তিন-চারবার টানাটানি করল। অপু কাঁদো কাঁদো গলায় ডাকল—মা, ওমা, তুমি কোথায়। অপু বন্ধ দরজার সামনে বসে পড়ল। ফোঁস ফোঁস শব্দটা থেমে গেল। ক্যামেরা চলে এল ঘরের বাইরে। অন্ধকার প্যাসেজে দানবের মতো একটা লোক অপুর মাকে ভাল্লুকের মতো জড়িয়ে ধরে আছে। অপুর মা প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেকে ছাড়াবার, ছাড়ুন, ছাড়ুন, ছেলেটা উঠে পড়েছে। লোকটা জড়ানো গলায় বলছে, শালাকে একদিন গলা টিপে শেষ করে দোবো, শয়তানের বাচ্চা। তোমাকে আমি এখন ছাড়তে পারব না। অপুর মা লোকটাকে ঠেলে সরাবার চেষ্টা করছে। লোকটা বলছে, তোমাকে আমি দোকান করার জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা দোবো অমনি অমনি। তুমিও মাল ছাড় আমিও মাল ছাড়ি। অপুর মা লোকটাকে কামড়ে দিল। লোকটা নেশার ঘোরে অপুর মায়ের গলাটা দু-হাতে চেপে ধরল। অপুর মা একটা শব্দ করল। অপু দরজা ঝাঁকাচ্ছে। চিৎকার করছে। লোকটা অন্ধকারে রাস্তায় নামল। টলতে টলতে এঁকে-বেঁকে চলেছে। তিনটে বাড়ি পরে, রকে একটা লোক শুয়েছিল। সে মাথার চাদর সরিয়ে লোকটাকে দেখে নিল। কানে আসছে কিশোরের গলার মা, মা ডাক। দরজা ঝাঁকাবার শব্দ। শব্দের পর শব্দ। দরজা, জানালা খোলার শব্দ। সারা পাড়া জেগে উঠেছে। অপুদের বাড়ির সামনে ভিড় জমে গেছে। তিনটি সাহসী ছেলে ভেতরে ঢুকছে। ক্যামেরা ফলো করছে। তিনধাপ সিঁড়ি। দালান। একজনের পায়ে লেগে একটা বোতল ছিটকে চলে গেল। সে বলে উঠল শালা। সে আরও দু-ধাপ এগিয়ে কিসে লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পড়ে পড়েই সে চিৎকার করতে লাগল, মার্ডার, মার্ডার। যে দু'জন পেছনে ছিল, তারা ওরে বাব্বারে বলে ছুটে বাইরে চলে গেল। অপু সমানে মা, মা করে যাচ্ছে। কাট! পুলিসের জিপ আসছে। শেষ রাত। তিন-চারজন লাফিয়ে নেমে পড়ল। টর্চের আলো। সকলে ঢুকে গেল ভেতরে। ক্যামেরা অনুসরণ

করছে। টর্চের আলো গিয়ে পড়ল অপুর মায়ের মুখে। মহিলাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। কিছু দূরে গড়াগড়ি যাচ্ছে একটা হুইস্কির বোতল। পড়ে আছে একটা গ্যাস-লাইটার। দালানের আলোটা জ্বালা হয়েছে। সঙ্গে আছে টর্চের আলো। পুলিস আতিপাতি করে জায়গাটা খুঁজছে। পড়ে আছে সিগারেটের টুকরো। একটা মিনিবাসের টিকিট। দলাপাকানো একটা রুমাল। নতুন, বড় একটা মোমবাতি। আরতির মায়ের হাতের মুঠোয় কয়েক গাছা চুল। পুলিসের অফিসার লাশ তুললেন না। খড়ির গুঁড়ো ছড়িয়ে গোটা জায়গাটা বেষ্টন করে দিলেন। একজন পাহারায় রইল। অফিসার জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ বাড়িতে আর কে আছে?'

'এর একটা ছোট ছেলে আছে স্যার, ওই ঘরে পুরে বাইরে থেকে চাবি বন্ধ করে দিয়েছে।' 'চাবি না স্যার, ছিটকিনি।' ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে দরজায়। সাবেককালের দরজা। বাঘের মুখ কোঁদা। রঙ চটে গেলেও বোঝাই যায়, ভীষণ পোক্ত। একটা জায়গায় খড়ি দিয়ে বড় বড় করে লেখা, অপু। দরজা খোলা হল। ক্যামেরা পুলিসের দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে নজর করল। জানালা দিয়ে ভোরের আলো আসছে। ফুলের মতো একটি কিশোর মেঝেতে বসে আছে হামাগুড়ি দিয়ে। কাট। পুলিস পেরিয়ে আসছে। তাদের মাঝখানে অপু। বাইরে অনেক লোক। তার মাঝে একটা দাড়ি-গোঁফ-অলা শক্ত-সমর্থ পাগল। সে হা হা করে হাসছে, তালি বাজাচ্ছে, আর বলছে, 'কে করেছে খুনখারাবি, সবই আমি বলতে পারি, কে করেছে খুনখারাবি।' সবাই তাকে দূর দূর করছে—'বেরো ব্যাটা পঞ্চা পাগলা।' পাগল ছাড়া বাংলা ছবি জমে না। মনে আছে, সেই পাগল ধীরাজ ভট্টাচার্য, আই ক্যান ফোরটেল ইওর ফিউচার। কি অসাধারণ অভিনয়! এক পাগলেই পয়সা উসুল।'

আমি সেই ময়লা ময়লা একশো টাকার নোট পাঁচটা বের করে প্রযোজক ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললুম, 'এই নিন আপনারা দু'জনে হাফাহাফি ভাগ করে নিন, স্টোরি তো আপনারাই করে ফেলেছেন।'

'আহা! রাগ করছেন কেন, একেই বলে তোমার আছে সুর, আর আমার আছে ভাষা। আপনাদের ওরিজিন্যাল স্টোরির তো শেষ পর্যন্ত ওই অবস্থাই হয়, মলাট আর ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে পর্দার গায়ে একটা নাম, এই তো শেষ পরিণতি। ফিল্ম সাহিত্য নয়, ফিল্ম হল ইন্ডাস্ট্রি। পয়সা ঢালেগা, পয়সা তোলেগা। আপনাদের সাহিত্য হল অক্ষর সাজাবেন আর নাম কিনবেন। মবলগ যা পাচ্ছেন পকেটে ভরে ফেলুন, কাজে লেগে যান। বাকিটা আমরা ফ্ল্যাশব্যাক করে ড্রিমে সেক্স ভরে নামিয়ে দেব। লিখতে বসার সময় স্লাইট একটু ঢুকু করে নেবেন, দেখবেন অটোমেটিক মাল বেরিয়ে আসবে। পেটে ডিজেল না ঢুকলে লেখার অটোমোবিল চলবে কিসে!'

দুই মাল বেরিয়ে গেলেন। আমি পয়মাল বসে রইলুম হাঁ করে। ফলের

দোকানের সামনে আমার শঙ্কর আর আরতি দাঁড়িয়ে। আমার স্বর্গীয় কিশোর অপু এইবার স্কুলে যাবে। তার মা পরিষ্কার সাদা হাফ প্যান্টের ভেতর গুঁজে দিচ্ছে সাদা জামা। অমন দেবীর মতো মায়ের দিকে আমি আর ভালভাবে তাকাতে পারছি না। বিশ্রী একটা পাপবোধ আসছে। সত্যিই কি শঙ্করকে তিনি দেহের ফাঁদে ফেলবেন? রতন হালদারের পক্ষে অবশ্য সবই সম্ভব। পৃথিবীতে বেশ কিছু গাছ আর প্রাণী আছে, যারা অকারণে গরল ছড়ায়। অনেক বিকল্প খাদ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিরীহ মুরগির পালক ছাড়ায় চড় চড় করে। নিজের সুন্দরী স্ত্রী ফেলে বেশ্যালয়ে গিয়ে ধুমসো মেয়েছেলের গোদা পায়ের লাথি খায় পয়সা খরচ করে। এই যেমন করণাসক্ত, ব্যবসাদার দু'জন, আমার চোখ দুটো ঘোলা করে দিয়ে গেল। যেন আমার জন্ডিস হয়ে গেল। শঙ্কর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাশ্রিত। পরোপকারী। প্রকৃতিপ্রেমী। বিশ্বপ্রেমী। যার জীবনের আদর্শই হল নিঃস্বার্থ সেবা, তাকে কেমন করে আমি অপুর মায়ের পায়ের সামনে বসাই! লোক দুটো কি সাংঘাতিক বদ! কি বিশ্রী রুচি-বিকৃতি নিয়ে সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেশিনের সামনে আমার শঙ্করের মতো ছেলেকে বসতে হবে। সে বসে বসে দেখবে, দুটো পৃথুল পা নাচছে। আমিও এক মহাপাপী। যে বই আমার পড়া উচিত নয়, সাইকোলজি, সেই বই পড়ে জেনেছি, সেলাই মেশিনে পা দিয়ে চালাতে চালাতে, মেয়েদের এক ধরনের দৈহিক উত্তেজনা হয়, তখন তাদের পা আরও দ্রুত চলতে থাকে। যে কারণে মেয়েদের পা-মেশিন চালানো বারণ। শঙ্করকে বসে বসে এই দৃশ্য দেখতে হবে। দেখতে দেখতে উত্তেজিত হতে হবে। তার উচ্চ মানস-ভূমি থেকে ধপাস করে পড়ে যেতে হবে। এক ভদ্রমহিলা খোলা গায়ে বগলে থার্মোমিটার লাগাচ্ছেন। সেখানেও সেক্স। এরপর কোনও মহিলা দাঁতে টুথব্রাশ ঘষছেন, সেখানেও সেক্স। দেখার কি দৃষ্টি! আমার নিজেরই ভয় লাগছে, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে।

শঙ্কর এগিয়ে গেল ভিড় সরিয়ে। ঝগড়া শুনতে অথবা মিটমাট করতে নয়, ভিড় জমেছে আরতিকে দেখতে। এমন রূপসী মেয়ে এ-তল্লাটে নেই। এই লোকগুলোকেই বা আমি কি বলব। সব বয়সেরই মানুষ আছে! আরতিকে চোখ দিয়ে গিলছে। কেউ চোখ দিয়ে কোমর ধরেছে, কেউ ধরেছে নিতম্ব, কেউ চেষ্টা করছে বুকটাকে ভাল করে দেখার, যেন কার্ডিয়োলজিস্ট। কেউ তার ফুরফুরে ঘাড় পর্যন্ত লম্বা, বাদামি চুলের দিক থেকে নজর সরাতে পারছে না।

ফুলওলা শঙ্করের পরিচিত। খুবই পরিচিত। একসময় দু'জনে জুভিনাইল ক্লাবে ফুটবল খেলত। শঙ্করকে সামনে দেখে ছেলেটা একটু থতমত খেয়ে গেল। শঙ্কর বললে, 'এ-সব কি হচ্ছে, মানিক? জানিস, তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস?'

'মাইরি বলছি শঙ্করদা, আমি দু'টাকা ফেরত দিয়েছি। মাইরি বলছি।'

আরতি তেজালো গলায় বললে, 'দু-টাকা ফেরত দিলে, টাকা দুটো আমার হাতেই থাকত। টাকা দুটো নিশ্চয় আমি গিলে ফেলিনি! সব কেনার পর আমার

হাতে শেষ একটা পাঁচ টাকার নোট ছিল। মালার দাম তিন টাকা। দুটো টাকা গেল কোথায়!'

শঙ্কর বললে, 'মানিক তোর ভুল হচ্ছে। এইরকম ভুল হতেই পারে। তোমাকে ঠকিয়ে দুটো টাকা নেবার মতো মহিলা ইনি নন।'

'ভুল তো ওনারও হতে পারে।'

'হলে টাকাটা ওঁর হাতেই থাকত; কারণ ওঁর বুক পকেট নেই।'

কথা বলতে বলতে শঙ্করের নজর চলে গেল ছোট একটা বালতির দিকে। ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের বালতি। সেই বালতিতে রয়েছে এক গুচ্ছ গোলাপ ফুল। সেই ফুলগুলোর পাশে, জলে একটা কি ভাসছে। শঙ্কর বললে, 'ওটা কি?' তারপর আরতির পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে নিজেই তুললে। আধভেজা একটা দু'টাকার নোট।

'মানিক এটা কি? দেখেছিস, কিভাবে ভুল বোঝাবুঝি হয়। টাকাটা এখানে পড়ে গেছে। তোর দেখা উচিত ছিল। তা না করে তুই সমানে গলাবাজি করে যাচ্ছিস।'

মানিক হাত জোড় করে বলল, 'দিদি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'আপনি আমাকে অনেক যা-তা কথা বলেছেন। শঙ্করদা এসে না পড়লে আপনি এই এতগুলো মানুষের সামনে জোচ্চর প্রমাণ করে ছাড়তেন। আমার টাকা আর মানসম্মান দুটোই যেত।'

'এই দেখুন দিদি, আমি কান মলছি। ব্যবসাদার জাতটাই বহত...।'

শঙ্কর বললে, 'মানিক, আর না।'

আর একটু হলেই মানিকের মুখ ফসকে একটা গালাগাল বেরিয়ে আসত।

শঙ্কর বললে, 'যান, এবার আপনি সোজা বাড়ি চলে যান।'

আরতির ভেতর সুন্দর একটা ছেলেমানুষী ভাব আছে। যখন হাসে, গালে একটা টোল পড়ে। ভুরুর কাছটা, ঠিক নাকের ওপরের জায়গায় অদ্ভুত একটা ভাঁজ পড়ে। যার কোনও তুলনা হয় না। আরতির এই হাসি দেখলে শঙ্কর অবশ হয়ে পড়ে। তার মনে একসঙ্গে অনেক দরজা খুলে যায়। অনেক আলো জ্বলে ওঠে। নানা রঙের কাঁচ বসানো জানালায় রোদ পড়লে যে বর্ণসুষমা হয়, তার মনেও সেইরকম একটা রঙ খেলা করে। সুন্দরী কোনও নর্তকী পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচতে থাকে। ভীষণ একটা টানাপোড়েন চলতে থাকে ভেতরে। এক মন বলে, ছিঃ ছিঃ, আর এক মন বলতে থাকে, এটাই তো স্বাভাবিক! শঙ্কর যখন নোট তোলার জন্যে হাত বাড়াচ্ছিল তখন আরতির অনাবৃত কোমরে হাত ছুঁয়ে গিয়েছিল। মসৃণ, ভিজেভিজে। সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল। সেই অনুভূতিটা শঙ্কর কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তার কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

আরতি সেই অদ্ভুত হাসি হেসে বললে, 'আপনি যাবেন না?'

'আমার তো সবে শুরু হল।'

'আমি যদি আপনার সঙ্গে থাকি, তাহলে রাগ করবেন?'

'আমাকে কোনও দিন রাগতে দেখেছেন! আপনার কষ্ট হবে।'

'আমাকে তুমি বলতে কি আপনার খুব কষ্ট হবে?'

শঙ্কর হেসে ফেলল। তার মনে হচ্ছে, নেশা হয়ে গেছে। কিছু আর ভাবতে পারছে না। শীতের সকালে স্নান করে রোদে দাঁড়ালে যে-রকম একটা সুখ সুখ ভাব হয়, সেইরকম একটা সুখ-বোধ হচ্ছে। শঙ্কর আর আপত্তি করতে পারল না। আরতিকে পাশে নিয়ে চাষীরা যেদিকে বসে সেদিকে যেতে যেতে বললে, 'চলো তোমাকে সস্তার বাজারটা চিনিয়ে দি। দাম কম, টাটকা জিনিস।'

'আমার না অনেক অনেক বাজার করতে ইচ্ছে করে একসঙ্গে। ব্যাগ ভর্তি, ঝুড়ি ভর্তি বাজার।'

'আমারও করে, তবে আমার বাজেট সাত টাকা। বেশ ভালই বাবা, বেশি বাজার মানে বেশি বোঝা।'

'আমার বাজেট মাত্র পাঁচ টাকা, তবে আমি একসঙ্গে তিনদিনের বাজার করি।'

'তোমার বেঁচে থাকতে কেমন লাগে, আরতি?'

'যখন আমাদের অনেক কিছু ছিল, তখন খুব একঘেয়ে লাগত; এখন কিন্তু বেশ উত্তেজনা পাই। এই মনে হচ্ছে, বাবার কি হবে! বাবার কিছু হলে আমার কি হবে। আজ গেলে কাল কি হবে, এই ফুরিয়ে গেল কেরোসিন তেল, কে লাইন দেবে। কে যাবে ব্যাঙ্কে ইন্টারেস্ট তুলতে। আপনি বোধহয় জানেন না, আমাদের আবার অনেকদিনের পুরনো একটা মামলা আছে। তার জন্যে প্রায়ই উকিলের বাড়ি ছুটতে হয়। মামলাটা বেশ মজার। আমাদের ছোট্ট একটা বাগানবাড়ি আছে বারাসতে। সেই বাড়ির কেয়ারটেকার ছিলেন বাবার এক বন্ধু। তিনি বাবার এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে বাড়িটার দখল ছাড়ছেন না। আমি কেস ঠুকে দিয়েছি। কেসটা যদি জিততে পারি তাহলে আমাদের কষ্ট অনেকটা কমবে। যেভাবে আছি সে ভাবে থাকা যায় না। তারপর ওই রতন হালদার। লোকটা এগজিবিসানিস্ট।'

'সে আবার কি?'

'সে আপনাকে আমি মুখে বলতে পারব না। যেদিন ধরে জুতোপেটা করব সেদিন বুঝতে পারবে। আচ্ছা, আপনি আমাকে দেখলে অমন মুখ ফিরিয়ে নিতেন কেন? কথা বললে হুঁ-হাঁ করে পালিয়ে যেতেন?'

'সত্যি কথা বলব, আমার মধ্যে একটু ভণ্ডামি আছে, পাকামিও বলতে পার। বেকার মানুষ তো, তাই কাজের কাজ না পেয়ে নানারকম স্বপ্ন দেখি। সন্ন্যাসী হব, বিরাট সমাজসেবক হব, বন্যাত্রাণে নৌকো নিয়ে ভেসে পড়বো, দণ্ড-কমণ্ডলু

নিয়ে চলে যাব কৈলাস। এই সব মাথায় ঢোকার ফলে মেয়েদের ভীষণ ভয় পাই। যদি কোনওভাবে আটকে যাই। নিজের খাবার যোগাড় নেই, তার ওপর সংসার!'

'মেয়েরা কি পুরুষ-জীবনের বাধা?'

'সংসারজীবনের নয়, সন্ন্যাসজীবনের বাধা তো বটেই!'

'সন্ন্যাসী কেন হবেন? সংসারে কোনও কাজ নেই। এই যে আপনি এক গাদা বাচ্চাকে মানুষ করছেন, সারা পাড়াটাকে আনন্দে মাতিয়ে রেখেছেন, এটা কাজ নয়?'

'কি বলব বল? আমার ভাল লাগে। এখন ধর, আমি যদি সেজেগুজে পক্ষীরাজ মার্কা হয়ে হয়ে প্রেম করি, আমার এই মনটা হারিয়ে যাবে। আর একটা সত্য কথা বলব, রাগ করবে না, বল?'

'নির্ভয়ে বলুন।'

'তোমাকে আমি ভয় পাই। তুমি এত সুন্দরী, আর তোমার এমন সুন্দর ভাব, তোমাকে দেখলেই আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করে, ভীষণ ভালবাসতে।'

আরতি শঙ্করের হাতটা মুঠোয় ধরেই ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিয়ে বললে, 'আমিও আপনাকে ভীষণ ভালবাসি আপনার গুণের জন্যে।'

কথায় কথায় বাজার হয়ে গেল। শঙ্কর আজ আর তার সাত টাকার সীমার মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ছিটকে বেরিয়ে গেল। অনেক দিন পরে বাজারে শোলাকচু এসেছে। শঙ্করের ভীষণ প্রিয়। ছাঁকা তেলে শোলাকচু ঝুরো করে কেটে ভাজলে ফুলে উঠে যা অসাধারণ স্বাদ হয়!

শঙ্কর বললে, 'তুমি তো একা! তাই ইচ্ছে থাকলেও অনেক কিছু রাঁধতে পার না। আমার মা আছে, আমার বোন আছে। ভীষণ ভাল রাঁধেন আমার মা। তোমাকে আজ আমি দুটো রান্না খাওয়াব। খাবে তো!'

'নিশ্চয় খাব। তাহলে আজ আমি বাবার স্যুপটা করব, আর কিছু করব না। আমার তৈরি স্যুপ খুব একটা খারাপ হয় না। আপনি একটু টেস্ট করবেন?'

'না গো! আমি তো একা কিছু খেতে পারি না। সকলকে দিতে গেলে তুমি কুলোতে পারবে না। আর একদিন হবে।'

দু'জনে বাড়ি ফিরে এসে অবাক। আরতিদের ঘরের সামনে ছোটখাট একটা জমায়েত। শঙ্করের মা ঘরের ভেতরে। শ্যামলী বাইরে যাবার জামাকাপড় পরেও বেরোতে পারেনি। আরতিদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। হাতে একটা ভিজে তোয়ালে। শঙ্কর মাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, মা?'

'ঘরে একটা শব্দ হল। এই তোরা আসার এক মুহূর্ত আগে। ছুটে এসে দেখি এই ব্যাপার।'

করুণাকেতন পড়ে আছেন মেঝেতে। চিৎ হয়ে। চোখ দুটো ঊর্ধ্বে স্থির।

শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কি না সন্দেহ। আরতি রোজ সকালে সাতটার মধ্যে বাবাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দেয়। এক মাথা পাকা চুল। ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছে, পাউডার ছড়িয়ে, সামনে সিঁথি করে আঁচড়ে দেয়। একদিন অন্তর আরতি নিজেই সুন্দর করে দাড়ি কামিয়ে দেয়। আজ ছিল দাড়ি কামাবার দিন। ফর্সা দুটো গাল চকচক করছে। করুণাকেতনের ঠোঁটের পাশ দিয়ে জলের মতো একটু কিছু গড়িয়েছে।

শঙ্কর করুণাকেতনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে বুকে কান পাতল। তারপর ডানহাতটা তুলে নিয়ে নাড়ি টিপে ধরল। একসময় হাতটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল। মুখ তুলে তাকাল। প্রথমেই চোখে পড়ল আরতির মুখ। অসাধারণ দুটো চোখ। একেই বলে কাজললতা চোখ। দুটো অপরাজিতা ফুলের পাপড়ি। শঙ্কর এমন চোখ কখনও দেখেনি। এমন নাক সে দেখেনি। যেন অ্যালফ্যানসো আমের আঁটি স্টেনসিলকার্টার দিয়ে কেটে তৈরি করেছেন ভগবান স্বয়ং।

শঙ্কর হাঁটু ভাঙা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াল মাথা নিচু করে। দু'হাত জোড় করে নমস্কার করল। বুঝিয়ে দিল, করুণাকেতন চলে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আরতি শঙ্করের চওড়া বুকে মাথা গুঁজে দিল। শঙ্করের মা এগিয়ে এসে আরতির মাথার পেছনে হাত রেখে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। শঙ্করের একটা হাত আরতির কাঁধে। আর একটা হাত মায়ের পিঠে। তার দু'হাতে দু'রকমের অনুভূতি।

করুণাকেতনকে ধরে বিছানায় তোলা হল। ভদ্রলোক পড়ে যাবার সময় বিছানার চাদরটা খামচে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। খাটের ধারে একটা বেড়া ছিল, দু'পাশে দুটো ছিটকিনি দিয়ে আটকান যায়। সেই বেড়াটা কি করে খুলে গেল কে জানে। আরতি জন্মদিনের মালাটা মৃত্যুদিনের মালা করে বাবার বুকে পেতে দিল। আরতি খুব শক্ত মেয়ে। ভেতরে ভাঙলেও বাইরে ভাঙেনি। তার চেহারা যেমন ধারাল, মন আর চরিত্রও সেইরকম ধারাল। শঙ্করের মা আর বোন যতটা ভেঙেছে আরতি ততটা বিচলিত হয়নি। সে জানে, আজ থেকে সে সম্পূর্ণ একা।

শঙ্কর পথে নেমে এল। তার শিশুবাহিনী স্কুলে। পাশে কেউ না থাকলে শঙ্কর তেমন জোর পায় না। বড় কেউ হলে চলবে না। ছোটরাই তার শক্তি। তাদের সঙ্গে বকবক করতে করতেই সে পথ খুঁজে পায়। শঙ্কর তার পরিচিত ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এল। করুণাকেতনকে যে ডাক্তারবাবু দেখতেন, তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্যে ফবেনে গেছেন।

করুণাকেতন যখন ঘরে ফেরার জন্যে পথে নামলেন, তখন দিন শেষ হয়ে এসেছে। শঙ্করের শিশুবাহিনী এসে গেছে। মানী লোকের যেভাবে যাওয়া উচিত শঙ্কর ঠিক সেইভাবেই ব্যবস্থা করেছে। ফুলে ফুলে সাজানো পালঙ্ক। শিশুবাহিনীকে সে এখন থেকেই মানুষের যাওয়াটা দেখাতে চায়। যাওয়ার পথ চেনা থাকলে হাঁটতে অসুবিধে হয় না। অপু ফিসফিস করে বললে, 'তুমি যে

বলেছিলে বড়লোকের কোনও সাহায্যে লাগবে না, তাহলে?'

'এরা বড়লোক নয়, মানীলোক, জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞানী। জিনিসটা বুঝতে শেখ। আর একমাস পরে তোর গোঁফ বেরোবে গবেট।'

অপুর হাতে খইয়ের ঠোঙা। অপু এই প্রথম শ্মশানে চলেছে। শ্যামল একবার ঘুরে এসেছে। তিন মাস আগে শ্যামলের বাবা আন্ত্রিকে মারা গেছেন। করুণাকেতন চোখে চশমা পরে, আরামে শুয়ে আছেন। মানুষের শেষ যাত্রাটা বেশ আরামেই হয়। রোগযন্ত্রণা চলে গেছে। এই মহানিদ্রায় যদি মহাস্বপ্ন থাকে, সে স্বপ্ন আর ভেঙে যাবার ভয় নেই। শঙ্করের ডাকে, শঙ্করের সমবয়সী আরও চার-পাঁচজন নেমে এসেছে করুণাকেতনকে কাঁধ দেবার জন্যে। মানুষটির জীবন যখন ধনেজনে ভরপুর ছিল তখন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের অভাব ছিল না। ফ্ল্যাশব্যাকে করুণাকেতনের জীবন আমি দেখতে পাচ্ছি। তাঁর ইন্ডাস্ট্রি, গাড়ি-বাড়ি, ঝাড়লণ্ঠন লাগান বিশাল খাওয়ার ঘর, খানা-টেবিল। দিন-রাত অতিথি-অভ্যাগতের আনাগোনা। সুন্দরী, শিক্ষিতা স্ত্রী। শিফনের শাড়ি। বিলিতি সুগন্ধ। অনেক রঙিন বেলুনের গুচ্ছ। তারপর সব একে একে ফাটতে শুরু করল। ঝুলে রইল নিজের জীবনের সরু একটি সুতো।

প্রায় ছ'ফুট লম্বা শঙ্কর। কোমরে কোঁচার গাঁট বেঁধে দিশি একটা ধুতি পরেছে একটু উঁচু করে। তার ওপর সাদা ধবধবে একটা গেঞ্জি। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রং। এক মাথা রেশমের মতো চুল। ডান কাঁধে লাল একটা গামছা পাট করা। তার ওপরে খাটের একটা দিক। শঙ্করের পাশে আরতি। সামনে, পেছনে শঙ্করের শিশুবাহিনী। কারোর হাতে এক গোছা জ্বলন্ত ধূপ। কেউ ছড়াচ্ছে ফুল। কেউ ছড়াচ্ছে খই আর পয়সা। শবযাত্রা সুগম্ভীর কবিতার মতো এগিয়ে চলেছে শ্মশানের দিকে। যে শাড়ি পরে আরতি সকালে বাজারে গিয়েছিল। সেই শাড়িটাই পরে আছে। আজ আর দুটি পরিবারেই হাঁড়ি চড়েনি। শঙ্কর আজ আরতিকে মায়ের হাতের ঝিঙে-পোস্ত আর শোলাকচু ভাজা খাওয়াতে চেয়েছিল। ভাগ্যের কি পরিহাস! প্রতিটি মানুষ এক একটি ঘড়ি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ঘড়ি চলতে থাকে টিকটিক করে। দমে ক'বছরের পাক মারা আছে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। আরতি পায়ে পায়ে সামনের দিকে এগোলেও, মনে মনে সে চলেছে পেছনদিকে। মাকে তার স্পষ্ট মনে আছে। বিচিত্র এক মহিলা। রূপটাই ছিল। গুণ বলে কিছুই ছিল না। ভীষণ অর্থলোভী, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্দান্ত এক মহিলা। রূপের গর্বে, বাপের বাড়ির ঐশ্বর্যের গর্বে একেবারে মটমট করত। কতদিন সে দেখেছে, বাবা গভীর রাতে, একা একটা আর্মচেয়ারে বাগানের দিকের বারান্দায় অফিসের জামাকাপড় পরেই বসে আছেন চুপচাপ। পাইপের ধোঁয়া আর নিভছে না। সারা বাড়ি তামাকের গন্ধে থমথম করছে। বসার ঘরে সাদা কাঁচের ডোমে একটি মাত্র দুঃখী দুঃখী আলো জ্বলছে। মা কোথায় কেউ জানে না। করুণাকেতনের সেই ছবিটাই লেগে আছে

আরতির মনে। নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত একটা মানুষ। বাবার টাকাতেই মা স্ফূর্তি করত। বাবার টাকাতেই হীরের আংটি, নাকছাবি, দুল। করুণাকেতন ছিলেন কাজ-পাগলা মানুষ। সত্যেন বোসের সেরা ছাত্র।

শ্মশান-চিতায় শোয়ানো হল করুণাকেতনকে। চেহারার এতকালের রুগ্ণভাব কেটে যেন ফুলের মতো ফুটে উঠেছেন। আমি শুধু শঙ্কর আর আরতিকে দেখছি। কে বলবে, এরা একই পরিবারের ভাইবোন নয়। দু'জনেই মাথায় প্রায় সমান সমান। শঙ্করের কিশোরবাহিনীর কিশোররা একটা বেদীতে পাশাপাশি বসে, বড় বড়, নিষ্পাপ চোখে সব দেখছে। দুটো চিতা জ্বলছে লাফিয়ে লাফিয়ে। একটাতে এক যুবক অন্যটায় একজন মহিলা। মহিলার দশ-বারো বছরের ছেলেটি হাতে একটা বাঁশের টুকরো ধরে উবু হয়ে বসে আছে জ্বলন্ত চিতার অদূরে। এক বৃদ্ধ বারে বারে ছেলেটিকে বলছেন, 'নিমু সরে বোস। চিতা থেকে কাঠ গড়িয়ে পড়লে পুড়ে যাবি।' ছেলেটি সেই কথায় বৃদ্ধের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু সরছে না। তার চোখের দৃষ্টি স্থির। যেন বরফের দু-ফালি চোখ।

শঙ্করই করুণাকেতনের অনাবৃত দেহ ঘৃত-মার্জনা করল। নিম্নাঙ্গের খণ্ড-বস্ত্রটি টেনে নেওয়া হল। এইবার মুখাগ্নি। কাঠের পরে কাঠ। তার ওপর করুণাকেতন। তার ওপর কাঠ। করুণাকেতনের মুখটি কেবল বেরিয়ে আছে। সেই মুখের ঠোঁট দুটিতে আগুন স্পর্শ করাতে হবে। আরতির হাতে ধরা জ্বলন্ত পাটকাঠি কাঁপছে। শঙ্করই মুখাগ্নি করল। আরতি শঙ্করের কনুইয়ের কাছটা স্পর্শ করে রইল। এইবার চিতার ডান পাশে আগুন ছোঁয়াতেই চিতা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। করুণাকেতনের দেহ কালো হয়ে উঠছে। আগুনের হাহা হাসি কাঠের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে। করুণাকেতনের মাথার তলায় জ্বলন্ত কাঠের বালিশ। মুখটা তখনও অবিকৃত। ওই নিটোল. গোল মাথাটিতে কত পরিকল্পনা ছিল, কত আশা ছিল, ছিল সুখের সন্ধান। একটু পরেই ফেটে যাবে ফটাস করে। তিন-চার ঘণ্টা পরে এক মুঠো ছাই। সেই ছাইয়ের নাম করুণাকেতন। কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে রইল, আকাশের তলায় একটা চিমনি। যার মাথাটা আশ্বিনের ঝড়ে মচকে গিয়ে বাতাসে দোল খায়। ভাঙা এক জোড়া গেট। অস্পষ্ট একটা নেমপ্লেট। একখণ্ড জংলা জমি। একটা মরচে ধরা বয়লার।

শঙ্কর, আরতি আর তার কিশোরদের নিয়ে গঙ্গার ধারে এসে বসল। আরতি এইবার ভাঙতে শুরু করেছে। শঙ্করের বুকে মাথা রেখে ভেতরে ভেতরে ফুলছে। সকালে আরতির কোমরে হাত ঘষে যাওয়ায় শঙ্করের ভেতরে একটা বেসুর বেজেছিল। এখনকার এই ঘনিষ্ঠতায় তার কিছুই মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, একই প্রাণ এই দেহে, আর ওই দেহে। এই দেহের নাম শঙ্কর বলে তার ভেতরের আগুন ততটা জ্বলছে না। মৃত্যুকে মৃত্যু বলে মনে হচ্ছে। ওই দেহের নাম আরতি, তাই চিতাটা ভেতরেও জ্বলছে। মৃত্যুকে মনে হচ্ছে বিয়োগ, শঙ্করের চিবুকটা ডুবে আছে আরতিব চুলে।

অন্ধকার জলধারা সামনে তরতর করছে। ওপারে মিটমিট করছে ঘুম-জড়ানো আলোর চোখ। স্লিক স্লিক করে ভেসে যাচ্ছে জেলে ডিঙি। কে একজন চিৎকার করে বললে, জোয়ার আসছে। তিনটে নৌকো সঙ্গে সঙ্গে তীর থেকে সরে গেল মাঝগঙ্গায়। বিশাল একটা জেটি এগিয়ে গেছে জলের দিকে। যেন নদীর বুকে স্টেথিস্কোপ বসাবে।

অপু হঠাৎ বললে, 'শঙ্করদা, ওই ওনার খুব কষ্ট হচ্ছে না?'

'না রে! ওটা তো দেহ, পুড়ছে। ওতে প্রাণ নেই। তোর জামা-প্যান্ট খুলে পুড়িয়ে দিলে কষ্ট হবে?'

'তাহলে সব কষ্ট প্রাণে?'

'ধরে নে তাই।'

'প্রাণটা কোথায় গেল? প্রাণ কেমন করে আসে, কেমন করে যায়?'

'তোদের ছাদের ঘুলঘুলিতে পাখি কেমন করে আসে, কেমন করে যায়।'

শঙ্কর হঠাৎ তার সুরেলা ভরাট গলায় গেয়ে উঠল, 'এসব পাখি এমনি করে উড়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে। একদিন উড়বে সাধের ময়না।' আরতির মাথা ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। ক্লান্তিতে, মানসিক বিপর্যয়ে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ল। আরতির মাথা নেমে এল শঙ্করের কোলে। শঙ্করের নাকে এসে লাগল আগুনের গন্ধ। শঙ্কর আবার গান ধরল। প্রায় শেষ রাতে এক পাত্র ছাই হাতে ফিরে এল শ্মশানযাত্রীরা। শেষ রাতে শ্মশানঘাটে গঙ্গাস্নান। আরতি জীবনে গঙ্গার জলে পা দেয়নি। জলে নামতে ভয় পাচ্ছিল। শঙ্কর বলেছিল, 'আমার কাঁধে হাত রাখ, তোমার কোনও ভয় নেই। আমি তোমাকে ধরছি।' আরতির কোমরের কাছটা সাবধানে ধরে পিছল পাড় বেয়ে দু'জনে নেমে গেল জলে। গেরুয়া রঙের গঙ্গার জল। কন্‌কনে শীতল। আরতি প্রথমটা ভয়ে শঙ্করকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছিল, যেন সে ডুবে যাচ্ছে। এইমাত্র এতগুলো মৃত্যু পাশাপাশি দেখেও আরতির প্রাণভয় গেল না। প্রাণভয় কারোরই যেতে চায় না। জলে ভিজে শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছিল। স্রোতের টানে খুলে যাচ্ছিল আঁচল। আরতির বুকের কাছে দুলছিল লাল পাথর বসানো একটা হার। শঙ্কর বলেছিল, 'হার সামলে। দেখো, খুলে চলে না যায়।' বলেই তার মনে হয়েছিল, পৃথিবীটা হল বিষয় আর বিষয়ীর। ছোটখাট লাভ-ক্ষতির চিন্তাটাই আগে আসে। শঙ্কর মনে মনে গেয়ে উঠেছিল, শ্যানপাগল বুঁচকি আগল কাজ হবে না অমন হলে। শঙ্কর বাচ্চাগুলোকে আর জলে নামতে দেয়নি। তাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিল। আশ্চর্য, একটা বাচ্চারও ঘুম পায়নি। সব ক'টা সমান উৎসাহে বড়দের সঙ্গে লেগে আছে। ঘটি ঘটি জল এনে চিতায় ঢেলেছে। কেবল সবক'টাকেই একটু বিষণ্ণ আর মনমরা দেখাচ্ছে। শঙ্কর এইটাই চেয়েছিল। শঙ্কর আরতি দু'জনে যখন পাশাপাশি ভিজে কাপড়ে হেঁটে চলেছে তখনই আমার মন বলছিল, এমনিভাবে বাকিটা জীবন তারা পাশাপাশিই হাঁটবে।

পরিচালক ভদ্রলোক এইবার একাই এলেন, 'শুনুন, আলুওলা টাকা দিচ্ছে বলে, তার কথাই বেদবাক্য হবে, এমন ভাববেন না। অর্থ দিয়ে সাহিত্য কেনা যায় না। আর আমি ডিরেক্টার, আমারও একটা ফিউচার আছে। আপনি শুধু একটা কাজ করুন, করুণাকেতনের চিতাটা আরও একটু পরে নেবান। সূর্যোদয় হয়েছে, চিতায় পড়ল প্রথম জল। হু হু ধোঁয়া। সূর্যের প্রথম আলো। বাচ্চাগুলো হাঁ করে, বিস্ময়-ভরা চোখে তাকিয়ে আছে ঊর্ধ্বগামী ধোঁয়ার কুণ্ডলির দিকে। তারপর শঙ্কর আর আরতির রোমান্টিক স্নানের দৃশ্য। সকালের রোদ। গঙ্গার জলে চুরচুর ঢেউ। দিনের প্রথম আলোর সুন্দরী আলেয়া...।'

'আজ্ঞে আলেয়া নয় আরতি।'

'আরে মশাই ওই হল। হোয়াট ইজ ইন এ নেম। আপনাদের বড় উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর নাম পাকা ক্রিমিন্যালদের মতো ছত্রিশবার পাল্টে যায়, মনে রাখতে পারেন না। শেষে নোট দিতে হয়, শঙ্কর ওরফে শোভন, ওরফে বরেন। ওরফে মিলন। আমার কথা হল, সব কাহিনীরই একজন নায়ক, একজন নায়িকা আর এক পিস ভিলেন থাকে। নায়ক শঙ্কর, নায়িকা নিশ্চয় আরতি আর ভিলেন হল গিয়ে ওই রতন হালদার। এখন ভিলেনের কাজ কী? সেটা অবশ্যই মনে আছে? ভিলেনের কাজ হল নায়ক-নায়িকার মিলনে বাধা দেওয়া। এখন আগেরটা বলি। শিফন পরা নায়িকাকে ভিজিয়েছেন। উত্তম করেছেন। তার আগে নায়কের কোলে শুইয়েছেন, অতি উত্তম। গানের সিকোয়েন্স এনেছেন। বেশ করেছেন। আমার মনের মতো হয়েছে। তবে ওসব ময়না মার্কা গান, একালে অচল। ওখানে একটা মডার্ন লোকসংগীত বসাতে হবে। সে অবশ্য আপনার কাজ নয়। গীতিকার করবেন। কথা হল, রাজকাপুরমশাই জলে-ভেজা নায়িকা পেলে কি করতেন? আপনি অমন একটা সিকোয়েন্স অমাবস্যার অন্ধকারে ফেলে দিলেন। ভিজে কাপড়ে আরতি উঠে আসছে। শঙ্কর তার কোমর ধরে আছে। আরতি উঠছে। সামনে। আরতি হাঁটছে, ক্যামেরা পেছনে। সূর্যের আলো সামনে থেকে চার্জ করছে, সানগান। এদিকে ব্যাকলাইট। শঙ্কর আর আরতি সামনে এগিয়ে চলেছে। আহীর ভাঁয়রোতে একটা গান জাগো, জীবন জাগো, যৌবন জাগো। নার্গিস, রাজকাপুর যেন নতুন করে ফিরে এল। চিত্রজগতের শুরু হল নতুন পুরনো যুগ।'

'শ্মশানে সেক্স? জিনিসটা বড় দৃষ্টিকটু।'

'ধুর্ মশাই। পাবলিক তো এইটাই চায়। তাছাড়া, সমালোচকরা এর ভেতর থেকে কত বড় একটা মিনিং পাবে জানেন! চিতা, মানে জীবনের শেষ পরিণতি। সেই চিতার সামনে মিলন। সামনে উদিত সূর্য। জীবনের পথ। পেছনে একদল কিশোর। নবজীবন। নবযুগের প্রতীক। তার মানে মৃত্যুর কাছে জীবন জয়ী। উল্টে গেল, কথাটা হবে জীবনের কাছে মৃত্যু পরাজিত। কত বড় ফিলজফি একবার ভাবুন। নেতারা যেমন বলেন, আমিও আপনাকে সেইরকম বলি, আপনাদের হাত

শক্ত করার জন্যে আমাদের হাত শক্ত করুন। এরপর আপনি ভিলেনটাকে একটু ফিল্ডে নামান। ভিলেন ছাড়া স্টোরি জমে! কে মশাই পয়সা খরচ করে শুধু চিতা জ্বলা দেখতে যাবে? একটা জিনিস নতুন এনেছেন, ভালই করেছেন, এগজিবিশানিজম। জিনিসটাকে কায়দা করে কাজে লাগান। আরে মশাই মহাভারতের সেই দৃশ্যটার কথা একবার চিন্তা করুন, ফ্যান্টাস্টিক। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হবে। দুর্যোধন বসে আছে, আরও সব বসে আছে কৌরবপক্ষীয়রা। দুর্যোধন সিল্কের লুঙ্গি তুলে উরু বের করে চাপড় মেরে বলছে, এসো সুন্দরী, এসো, বোসো এইখানে। মাই ডারলিং উঃ, এগজিবিশানিজমের কি অসাধারণ প্রয়োগ। শুনুন মশাই, এ-দেশে অরিজিন্যাল বলে কিছুই নেই, সবই কপি। স্টোরি কপি, মিউজিক কপি, বিজ্ঞাপন কপি। অরিজিন্যাল হয় বিলেতে। আপনি মহাভারত থেকে ঝট্ করে ঝেড়ে দিন। মেয়েটার বাপটাকে মেরেছেন। মেয়েটা এখন ওপেন টু অল। রতন ব্যাটাকে দু'পাত্তব গিলিয়ে ঠেলে দিন মেয়েটার ঘরে। পরনে লুঙ্গি, উদোম গা। মুখে সিগারেট। চেয়ারে গিয়ে বসল। মেয়েটা কিছু বলতে পারছে না। ভদ্র, শিক্ষিতা মেয়ে। রতন হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে এলিয়ে বসে আছে। চোখ নাচাচ্ছে। মিটিমিটি হাসছে। মুখে চুকচুক শব্দ করছে। যেন বেড়ালকে ডাকছে দুধ খেতে।'

'কোনও কারণ ছাড়া ঘরে ঢুকে পড়বে? মামার বাড়ি নাকি?'

'ফিল্মের গোটাটাই তো মামারবাড়ি। আমার ওই সিচুয়েশানটা চাই, আপনি এবার মাথা খাটান। সেদিনেই তো বলেছি, তোমার আছে সুর, আর আমার আছে ভাষা। মনের কোণে আছে যত দুষ্টুমির বাসা।'

ভদ্রলোক পুকুরে চার ফেলে বিদায় নিলেন। করুণাকেতন যে খাটে এতকাল শুয়েছিলেন সেই খাটটি শূন্য। যেন বিশাল একটি হাহাকারের মতো ঘর জুড়ে পড়ে আছে। ঘরের কোণে ওপাশে একটা প্রদীপ জ্বলছে। আরতি বসে আছে চেয়ারে। সামনে টেবিল। টেবিলে জ্বলছে ল্যাম্প। রাত প্রায় আটটা-সাড়ে আটটা হবে। প্রদীপটা জ্বেলে রেখে গেছেন শঙ্করের মা। করুণাকেতন যতদিন ছিলেন, শঙ্করের মা বড় একটা আসতেন না। পঙ্গু হয়ে মানুষটি পড়ে থাকলেও তাঁকে ঘিরে ছিল অহঙ্কারের একটা বলয়। সেই কথায় বলে, 'মরা হাতি লাখ টাকা।' এখন শঙ্করের মা অসহায় মেয়েটাকে অসম্ভব ভালবেসে ফেলেছেন। এমন জীবন তিনি দেখেননি, মৃত্যুর পর একজনও এল না পাশে দাঁড়াতে। আত্মীয়স্বজন অবশ্যই আছে। বড় বংশের ছেলে ছিলেন করুণাকেতন। বড়রা বোধহয় এইরকম নিঃসঙ্গই হয়। শঙ্করের মা সারাদিনে বহুবার এই ঘরে চলে আসেন। এসে খাটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন চুপ করে। এই বয়সে মৃত্যুর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক একটা কৌতূহল জন্মায়। কি অদ্ভুত, এই ছিল, এই নেই। শঙ্করের মা আরতিকে মেয়ের মতো গ্রহণ করেছেন।

আরতি আলো জ্বেলে তাকে লেখা বাবার পুরনো চিঠি পড়ছে। আরতি যখন

রাজস্থানের স্কুলে পড়ত, সেই সময়কার চিঠি। তখন বাড়ির অবস্থা রমরমা। রাজস্থানের সেই স্কুলে রাইডিং, শ্যুটিং সবই শেখাত। আবতি অতীতে চলে গেছে। এদিকে রতন হালদার গুটিগুটি ঢুকছে। সর্বনাশ করেছে! লুঙ্গি, গেঞ্জি পরেনি অবশ্য। বেশ ভদ্র সাজগোজ। আজ বৃহস্পতিবার। মদ মনে হয় খায়নি। আজ তো ড্রাই-ডে। পা অবশ্য টলছে না। রতন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একবার কাশল। আরতি চিঠিতে এত বিভোর, শুনতেই পেল না। তখন রতন বললে,

'আসতে পারি দিদি?'

'কে? চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল আরতি। দরজার সামনে এসে রতনকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। তবু ভদ্রতা। বললে, 'আসুন, আসুন।'

'দিদি, আমি খারাপ লোক। আমার খুব বদনাম। অশিক্ষিত। ছোট ব্যবসা করি। মাল খাই। বউ পেটাই। আমার ভেতরে যাওয়া উচিত হবে না। আপনার পিতা মারা গেছেন। আমি মাদ্রাজ গিয়েছিলুম। আজ ফিরেছি। খবরটা শুনে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেছে। আপনার মতো বয়সে আমিও আমার পিতাকে হারিয়েছিলুম। পিতার মৃত্যু কত দুঃখের, আমি জানি। বাবা তারকেশ্বর আপনাকে ভাল রাখুন। আমি আপনার জন্যে খুব ভাল দোকানের মিষ্টি আর কিছু ফল এনেছি। আর একটা মালা এনেছি, আপনার পিতার ছবিতে পরাবার জন্যে। আমি খুব শুদ্ধভাবে এনেছি। আজ আমি কোনও নেশাভাঙও করিনি।'

আরতি লক্ষ্য করল, রতন হালদারের চোখে জল এসে গেছে। আরতি অবাক হয়ে গেল।

'যাবো? যদি কেউ কিছু ভাবে?'

'ভাবে, ভাববে। আপনি আসুন।'

জমিদারের ঘরে যে-ভাবে প্রজা ঢোকে, রতন সেই ভাবে ভয়ে ভয়ে, চোরের মতো ঢুকে মেঝেতে বসতে যাচ্ছিল। আরতি বললে, 'ও কি করছেন? চেয়ারে বসুন। চেয়ারে।'

রতন জড়োসড়ো হয়ে চেয়ারে বসল। মালার প্যাকেটটা আরতির হাতে দিয়ে বললে, 'ছবিতে পরিয়ে দেবেন?'

'আপনি পরিয়ে দিন না।'

'আমি ছবি ছোঁব?'

'কেন ছোঁবেন না? ছুঁলে কি হবে?'

'আমাকে সবাই চরিত্রহীন বলে তো। তবে বিশ্বাস করুন, আমার চরিত্রে কোনও দোষ নেই। আমি একটু মদ খাই। সে আমার নিজের রোজগারে খাই। না খেলে আমার জীবনের অনেক দুঃখ ভুলতে পারব না বলে খাই। বউকে আমি যেমন পেটাই আমার বউও তেমনি আমাকে ক্যাঁত ক্যাঁত করে লাথি মারে। কি মুখ! যেন নালা-নর্দমা। আবার কি বলে জানেন, বিয়ের আগে প্রফেসারের সঙ্গে

প্রেম করত। কত দুঃখ দেখুন, আজও আমাদের কোনও ছেলেপুলে হল না। কি বলে জানেন! আমি মদ খাই বলে হচ্ছে না। তাহলে তো বিলেতে কারোর ছেলেপুলে হত না।'

হঠাৎ রতন হালদার নিজের দু'কান ধরে জিভ কেটে বললে, 'ছিঃ ছিঃ, আপনার সামনে এসব আমি কি কথা বলছি! অশিক্ষিত হলে যা হয়।'

রতন হালদার খাটের ওপর বালিশে হেলানো করুণাকেতনের ছবিতে মালা পরিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। তারপর চেয়ারে না বসে বললে, 'আমি তেজস্বী মানুষকে ভীষণ শ্রদ্ধা করি। আমি যা শুনেছি, তাতে আপনার পিতাকে ভীষণ তেজস্বী মনে হয়েছে। আপনিও তেজস্বী। আপনার মনে আছে, একদিন আমি আপনার হাত ধরেছিলুম। আপনি আমাকে ভুল বুঝে বলেছিলেন, জুতো মারব। আমি তখন ব্যাপারটা বোঝাবার মতো অবস্থায় ছিলুম না। নেশার ঘোরে পড়ে যেতে যেতে আমার মনে হয়েছিল আপনি আমার স্ত্রী। বিশ্বাস করুন, আমার ভুল হয়েছিল। আমি নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য সকলকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা করি। এ আমার গুরুর নির্দেশ।'

ঠিক এই সময় শঙ্কর ঘরে এসে রতনকে দেখে বললে, 'এ কি, আপনি এখানে?'

আরতি বললে, 'না, না। কোনও ভয় নেই শঙ্করদা। ইনি খুব সুন্দর মানুষ। আমরা সবাই দূর থেকে এতদিনে এঁকে ভুল বুঝে এসেছি। ইনি প্রকৃত ভদ্রলোক। কাছে না এলে মানুষকে ঠিক বোঝা যায় না।'

রতন শঙ্করের দিকে ঘুরে বললে, 'নমস্কার, শঙ্করবাবু। জানি, একটা কারণে আপনি আমার ওপর খুব রেগে আছেন। আপনি আদর্শবাদী, সমাজসেবক, চরিত্রবান, কালীভক্ত, শিক্ষিত, সুন্দর, আপনি সব সব। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। এও জানি, আপনি তিন-চারবার পুলিসের কাছে আমার নামে কমপ্লেন করেছেন। আমি তার জন্য আপনার ওপর এতটুকু রাগ করিনি। কেন আমি মদ খাই জানেন? আমার মা, আর আমার ওই লাল পিঁপড়ে বউটার জন্যে। কি সাংঘাতিক কামড়, আপনি জানেন না! আর একটা জিনিস আপনি জানবেন, মদ খেলেই বউকে পেটাতে ইচ্ছে করবে। তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়াল, বউয়ের জন্যে মদ, মদের জন্যে বউকে পেটান। একটা গোলাকার ব্যাপার। আমার কি দোষ বলুন। আমি কি পেটাই? পেটায় আমার পেটের বোতল। জানেন কি আমার কোনও দাম্পত্য জীবন নেই।'

'আপনার ওই রুগ্ণ স্ত্রীকে দিয়ে রোজ সকালে ভারি লোহার উনুনটা তোলান কেন; নিজে পারেন না?'

'কেন পারব না, ওই তো আমাকে তুলতে দেয় না। আমার কোমরে একটা ফিক ব্যথা মতো আছে। মাঝে মাঝেই কষ্ট দেয়। তা আমার বউ বলে, ওই ভারি উনুন তুলতে গিয়ে চিরকালের মতো বিছানায় পড়ে গেলে কোন মিএা

দেখবে?'

'তার মানে আপনার স্ত্রী আপনাকে ভীষণ ভালবাসেন।'

'বাসেই তো। আমিও ভীষণ ভালবাসি; ওই তো আমার একটি মাত্র স্ত্রী। জানেন তো, জীবনে স্ত্রী একবারই আসে। রাখতে পারলে রইল, না রাখতে পারলে গেল।'

'তাহলে অমন চিৎকাব-চেঁচার্মেচি, গালিগালাজ করেন কেন?'

'ছেলেবেলা থেকে ওইটাই আমার আদত। জানেন তো, মানুষ আসলে বাঁদরের জাত। আপনারা যাঁরা পড়ালেখা করেন তাঁরা জানেন। ঠিক মতো ট্রেনিং না পেলে আমার মতো দামড়া হয়ে যায়। ছেলেবেলায় বাবা আমাকে শুধু রতন বলতেন না। বলতেন, দামড়া রতন। আর আমার বউ, আমার এই স্বভাবটাই পছন্দ করে। চিৎকার, চেঁচামেচি যেদিন কম হয়, সেদিন জিজ্ঞেস করে, কি গো, তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

'তা এই যে বললেন, আপনার দাম্পত্য জীবন নেই।'

'সেটা হল, ছেলেপুলে না থাকলে দাম্পত্য জীবনের কি হল বলুন? তারপর তো ওই শরীর। ছত্রিশটা ব্যামো। সম্প্রতি যোগ হয়েছে ছুঁচিবাই। এইবার আমাকে বলুন, আমি কাকে পাশে নিয়ে শুই? বউ না ডিসপেনসারি। আমার এতখানি শরীর। তাই আমি মদ খাই। মদে একটা জিনিস হয়, চরিত্রটা মদেই আটকে থাকে। আর বেশি নড়াচড়া করতে পারে না।'

'এই যে বললেন, স্ত্রী আর মায়ের জন্যে মদ ধরেছেন।'

'সে কথাটাও ঠিক। রোজ মশাই দম খাটা খেটে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল কীর্তন। মা আসে বউ-এর নামে বলতে, বউ আসে মায়ের নামে বলতে। লে হালুয়া।'

রতন হালদার জিভ কেটে কান মললেন, 'এই আমার চরিত্র। কোথায় কি বলে ফেলি। মুখ নয় তো...।'

রতন তাড়াতাড়ি নিজের মুখ চেপে ধরে ঢোক গিলল। গিলে মুখ থেকে হাত সরিয়ে বললে, 'বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। কি বেরোতে চাইছিল। অ্যায় এই হল রতন হালদার। লক্ষ্মী ক্লথ স্টোরের মালিক। লক্ষ্মী হল আমার স্ত্রীর নাম। তা নামটা মিলেছে জানেন। আসার পর থেকে রোজগারপাতি বেড়েছে। তা হয়েছে। ছোটলোক হতে পারি, মিথ্যেবাদী তো নই। না, আমি এবার যাই। আমার বউ একেবারে সিঁটিয়ে আছে। আসার সময় বলেই দিয়েছে, যাচ্ছ যাও, খুব সাবধান। যা-তা বলে মরো না। খুব একটা যা-তা কিছু বলিনি, কি বলুন? খালি একটা শব্দ লিক করেছিল।'

রতন আবার খাটের দিকে হাত তুলে নমস্কার করল, তারপর যেমন এসেছিল, সংযত হয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল। আমি অবাক। শঙ্কর আর

আরতিও অবাক। শঙ্কর তৈরিই ছিল, এলোমেলো কিছু করলে, জীবনেব প্রথম ঘুষিটা রতনের চোয়ালে গিয়েই পড়বে।

শঙ্কর বললে, 'এত সহজ সরল মানুষ আমি কমই দেখেছি।'

টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে রতন হালদারের আনা শহরের সেরা আপেল, মুসাম্বি, আতা, সফেদা, কলা। বিশাল এক বাক্স সন্দেশ। করুণাকেতনের ছবিতে দুলিয়ে দিয়ে গেছে, টাটকা গোড়ের মালা। তলায় ঝুলছে টাটকা একটা গোলাপ। রোলেক্স চিকচিক করছে, আনন্দাশ্রুর মতো।

রতন হালদার তক্ষুনি আবার ফিরে এল। হাতে একটা বেশ বড় রঙিন প্যাকেট।

ঘরে সেই একইভাবে সমীহ হয়ে ঢুকল, 'একটা জিনিস ভুলে ফেলে এসেছিলুম। ধূপ। থেকে থেকে, ঘরের চারপাশে জ্বালিয়ে দিন। আমি আর দাঁড়াচ্ছি না। এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে, আমাব বউকে মনে হয় কাঁকড়া বিছে কামড়েছে। সেই কথায় বলে না, গোদের ওপর বিষ ফোড়া। আমি যাই দিদি।'

শঙ্কর আর আরতির সেই রাতটা রতন হালদারেব বউকে নিয়েই কেটে গেল। ডাক্তার, ইঞ্জেকশান, বরফ, পাখার বাতাস। সেবা। সব মিলিয়ে একটা রাত। মৃত মানুষের আত্মা এই খেলাটাই খেলেন। দুঃখ ভোলবার জন্যে একের পর এক বিপদ তৈরি করতে থাকেন। যাতে সব একেবারে তালগোল পাকিয়ে থাকে। মাথা না তুলতে পারে। সেই রাতেই রতন হালদারকে চেনা গেল। লোকটা কত খাঁটি! সারাটা রাত তার দৌড়ঝাঁপ। ছোটাছুটি। মনে হচ্ছিল, তার স্ত্রীকে নয়, বিছে তাকেই কামড়েছে। রতন যেন সেই প্রবাদ—শাসন করে যে-ই, সোহাগ করে সে-ই। ভোরের দিকে মনে হল, বিপদটা কেটে গেছে। একে রোগা শরীর তার ওপর বিছের কামড়। বিছে মানে বিছের রাজা, কাঁকড়া বিছে, প্রায় সাপের সমান। রতন হালদার ঠিকই বলেছে, তার বউয়ের শরীরে হাড় ক'খানাই সার। স্রেফ ভেতরের তেজে মহিলা লড়ে যাচ্ছেন। রতন হালদার সত্যই সংযমী! অন্য কেউ হলে নারীসঙ্গের জন্য ছটফট করত। মদে আরও বাড়িয়ে দিত তার নারী-লিপ্সা। আর একটা ব্যাপার জানা ছিল না, সেটা হল রতনের ঈশ্বর-বিশ্বাস। দেয়ালের হুক থেকে ঝুলছিল রুদ্রাক্ষের মালা। রতন মাঝে মাঝেই সেই মালাটা নামিয়ে ঘরের কোণে বসে যাচ্ছিল জপে। সেটা এত আন্তরিক, যে কেউ বলতেই পারবে না, এটা ভণ্ডামি। কেউ হাসতেও পারবে না, নিউক্লিয়ার এজে, জপের শক্তি, ব্যাটা অশিক্ষিত গেঁয়ো কোথাকার।

মিনিবাস ছুটছে হই হই করে। জানালার ধারে বসে আছে আরতি। পাশে শঙ্কর। আরতির রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে। করুণাকেতনের মৃত্যু আরতি সহজভাবেই নিয়েছে। কষ্ট পাচ্ছিলেন ভীষণ। চলে গেলেন। আরতি এখন নিজের জীবনের পরিকল্পনা নিয়েই ব্যস্ত। বাগানবাড়ির দখলটা পেয়ে গেলেই সে একটা নার্সারি, কেজি স্কুল করবে। সে যোগ্যতা তার আছে। সে ঘোড়ায় চড়তে

জানে, সে বন্দুক চালাতে জানে। ইংরেজি জানে সাংঘাতিক ভাল। ওই স্কুল কালে বড় হবে। বিশাল এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বাবার নামে নাম রাখবে সেই প্রতিষ্ঠানের—করুণাকেতন।

কন্ডাক্টর কাছে আসতেই শঙ্কর পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিল, আরতি সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের হাত চেপে ধরল। খুব আস্তে বলল, 'এরই মধ্যে ভুলে গেলেন, আমাদের কাল রাতের চুক্তি।'

শঙ্কর আরতির আঙুলগুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। ঈশ্বর যাকে দেবেন মনে করেন, তার সবই ভাল করে দেন। লম্বা লম্বা মোচার কলির মতো আঙুল। একেবারে দুধে-আলতা রঙ। ডগাগুলো সব টোপর টোপর গোলাপি! অনামিকায় একটা টুকটুকে লাল পাথর বসানো সোনার আংটি। যা মানিয়েছে! চোখ ফেরানো যায় না। শঙ্করকে ওইভাবে মুগ্ধ হয়ে যেতে দেখে আরতি বললে, 'কি হল আপনার?'

'তোমার আঙুল। ঠিক যেন নন্দলাল বসুর ছবি।'

'এই রকম আঙুল আপনি কত মেয়ের পাবেন। আপনি মেয়েদের সঙ্গে মেশেন, যে জানবেন?'

'তুমি এই আঙুলে বন্দুক ছুঁড়তে?'

'হ্যাঁ, আমার টার্গেট খুব ভাল ছিল। সত্যি রাজস্থানে সেই দিনগুলো ভোলা যায় না। আমার জীবনের সবচেয়ে ভাল দিন। দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়, রইল না, রইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।'

শঙ্কর হঠাৎ মুখ তুলে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কন্ডাক্টর ছেলেটি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। সে-ও অবাক হয়ে আরতিকে দেখছে। টিকিটের পয়সা নিতে নিতে বললে, 'দিদি, আমি এত বছর কন্ডাক্টারি করছি, আপনার মতো সুন্দরী দেখিনি। মনে হচ্ছে জ্যান্ত মা দুর্গা। আপনি কেন সিনেমায় নামছেন না দিদি। সুচিত্রা সেনের পর আর তো একই সঙ্গে অত সুন্দরী আর শক্তিশালী কেউ এলেন না।'

আরতি বললে, 'সিনেমায় নামা কি অত সোজা ভাই?'

'আপনি একটু চেষ্টা করলেই চান্স পেয়ে যাবেন।'

আরতি আর শঙ্কর ভবানীপুরে নেমে পড়ল। আরতিদের অ্যাডভোকেট ভবতোষবাবুর চেম্বারে যখন গিয়ে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ভবতোষবাবু কোর্ট থেকে ফিরে সবে বসেছেন। এক মারোয়াড়ি মক্কেল রাজস্থানী বাংলায় খুব ক্যাচোর-ম্যাচোর করছেন। আরতিকে আসতে দেখে ভবতোষবাবু বললেন, 'একটু চুপ করুন।'

আরতির এমনই প্রভাব ভবতোষবাবু চেয়ার ছেড়ে প্রায় উঠেই পড়েছেন, 'এসো মা এসো।'

সামনের চেয়ারে বসতে বসতে আরতি বললে, 'বাবা, মারা গেছেন কাকাবাবু।'

মুখে মশলা দিতে যাচ্ছিলেন ভবতোষবাবু, তাঁর হাত নেমে এল। বললেন, 'যাঃ, একটা যুগ শেষ হয়ে গেল।'

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক পাশ থেকে আরতিকে দেখছেন হাঁ করে। শঙ্করের মনে হল মনে মনে তিনি হিসেব করছেন, 'ভাও কিতনা।'

ভবতোষবাবু বললেন, 'তোমরা জান না, করুণাদা কত বড় ফাইটার ছিলেন! হি ওয়াজ এ গ্রেট সোল।'

কাজের মানুষ। সেন্টিমেন্ট নিয়ে পড়ে থাকার সময় নেই। ওই এক মিনিট নীরবতা পালনের মতো দু'কথাতেই সেরে দিয়ে আসল কথায় এসে গেলেন, 'খুব নিষ্ঠুরের মতোই বলছি মা, করুণাদা মারা গিয়ে তোমার কিছুটা সুবিধে করে দিলেন। কেসটাকে এবার আমি অন্যভাবে প্লেস করতে পারব। তুমি এখন হেল্পলেস, অসহায়। তোমার কেউ নেই। অ্যালোন ইন দিস ওয়ার্লর্ড। বাই দি বাই, এই ছেলেটি কে? এত সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, উজ্জ্বল যুবক, একালে সহসা দেখা যায় না।'

'আমরা একই বাড়িতে থাকি। আমার বন্ধু, আমার দাদা, আমার শিক্ষক, আমার আদর্শ, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, ইনি কে; একটি রেয়ার স্পেসিমেন, আই ক্যান সে।'

'ছেলেটিকে আমার ভীষণ ভাল লেগে গেল। আজকালকার খুব কম ছেলেই আমাকে মুগ্ধ করতে পারে। তুমি কি ব্রহ্মাচর্য পালন কর?'

শঙ্কর বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ভেরি গুড। তুমি আমার বইটা পড়েছ? ইন প্রেইজ অফ ব্রহ্মাচর্য।'

'বইটা আপনার লেখা? আপনি সেই ভবতোষ আচার্য। আপনার ওই বই-ই তো আমার ইন্সপিরেসান।'

শঙ্কর ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে ভবতোষবাবুকে প্রণাম করল। ভবতোষবাবু সোজা দাঁড়িয়ে উঠে শঙ্করকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। সেই অবস্থায় এক হাতে শঙ্করের পিঠ চাবড়াতে লাগলেন। দু'হাতে, শঙ্করের দু'কাঁধ ধরে, সামনে সোজা দাঁড় করিয়ে, শঙ্করকে দেখতে দেখতে বললেন, 'চেস্ট কত?'

'ছেচল্লিশ।'

'ভেরি গুড।'

শঙ্কর ফিরে এসে চেয়ারে বসল। মারোয়াড়ি ভদ্রলোক অবাক হয়ে বাঙালিদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন, অবশেষে থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেসটা কি ছিল? প্রোপার্টি কি ডামেজ স্যুট।'

ভবতোষবাবু বললেন, 'প্রপার্টি। হিউম্যান প্রপার্টি।'

'বিষোয় বিষ আছে। আমি তো মোশাই পাগোল হয়ে গেছি। চার ছেলেকে চারটে প্রপার্টি দিলিয়ে দিলুম, লেকিন শান্তি হোলো না দাদা। বোড়োটা ওখোন বলছে কি, আমাকে আরো দাও। মেজোর মকানের সামনে দিয়ে পাতাল রেল গেছে। আরে উল্লুকা পাঠ্ঠে, মেজোর তো ফ্ল্যাট। তোর তো বাগানবাড়ি। একটা গাড়ি নতুন মোডেল, আর একটা গাড়ি প্রানা মোডেল। আমি কি দিল্লি যাবো দরবার লাগাবো। বেলেঘাটামে পাতাল রেল চালিয়ে দাও। মোশাই আমি ভাবছি কি ভিখিরি হোয়ে যাই। জোয় রাম। দেখি একটা হুমন লাগাই, কি দোশ মণ ঘিউ ঢালি।'

'আপনার তো মশাই টাকায় ছাতা পড়ছে। এক বস্তা দিয়ে দিন না?'

'টাকা তো আমাদের কাছে টয়লেট পেপার। নো ভ্যালু। আমরা চাই রিয়েল এস্টেট। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে নো বাড়ি। এদিকে কুছু আছে পুরনো বাঙালি বাড়ি। চেষ্টা তো চালিয়েছি। লেকিন সোব লিটিগেশানে আটকে আছে। ফ্রি প্রোপার্টি কোথায়? এই আপনারটা ফ্রি আছে। হামি এক কোটির অফার দিয়ে রাখছি।'

'দশ বছর অপেক্ষা করুন। আমি আগে মরি।'

'লেকিন আপনি মোরলেই তো লিটিগেশানে চলে যাবে। যা করবেন মরার কম সে কম সাতদিন আগে করুন।'

'আমি কনট্যাক্ট করে ফাইন্যাল ডেটটা জেনে নি।'

মারোয়াড়ি ভদ্রলোক হা-হা করে হাসলেন।

ভবতোষ আরতিকে বললেন, 'ডেথ সার্টিফিকেটটা আমাকে আগে পাঠাও ফাইনাল লড়াইটা শুরু করা যাক। তোমাদের দু'জনের বিয়ে হলে আমি খুব খুশি হব। তবে কেসটা ফয়সালা হবার আগে নয়। ফাইন ইয়াং ম্যান, তোমার নামটা কি?

'আজ্ঞে আমার নাম শঙ্কর মুখার্জি।'

'আরতিকে তোমার পছন্দ?'

'আমি বেকার। আমার বোনের এখনও বিয়ে হয়নি। বিয়ের বাজারে আমি অচল কাকাবাবু।'

'তুমি অচল থাকবে না শঙ্কর। তুমি সচল হয়ে যাবে। যদি তুমি বিবাহ কর আরতিকে কর। আমি নিজে আরতিকে সম্প্রদান করব তোমার হাতে। যাও তোমাদের মঙ্গল হোক। এইবার আমাকে কাজ করতে দাও।'

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এল। আরতি বললে, 'শঙ্করদা আপনি ছাড়া সত্যিই কিন্তু আমার আর কেউ নেই। এই পৃথিবীতে আমি কিন্তু একেবারে একা। এই কথাটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। আমি কি খুব বেশি দাবি করে ফেলছি?'

'আরতি, তোমার স্বামী হবার যোগ্যতা আমার নেই, তবে এইটুকু বলতে

পারি, যতদিন প্রয়োজন হবে, আমি তোমার ম্যানেজারি করব। তোমার সেবা করব। আমি কামজয়ী নই। কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় কামজয়ী হওয়া। চেষ্টা করবে, হারবে, আবার চেষ্টা করবে। বাইরে একটা ভাব দেখাবে নির্বিকার, কিন্তু ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে যাবে। তবে নিজেকে নানাভাবে ব্যস্ত রাখলে আক্রমণটা কম হবে। সত্যি কথা বলব, তোমাকে কখনও মনে হয় প্রেমিকা, কখনও মনে হয় আমার আদরের ছোট বোন। দু'রকমের ভাব হয় আমার। তবে তৃতীয় আর একটা ভাব ভীষণ প্রবল তোমাকে আগলে রাখা, তোমাকে সামলে রাখা, তুমি আমার এত আদরের যে তোমার গায়ে যেন কোনও কিছুর স্পর্শ না লাগে। কর্কশ জীবন, কর্কশ সময় যেন তোমাকে ছুঁলে না দেয়। আমার চোখে, তুমি হলে পৃথিবীর সুন্দরতম ফুল। তুমি বলবে, হঠাৎ আমার এমন ভাব হল কেন? আমি বলব, এইভাবেই হয়। তোমার ওই ভুরু কোঁচকানো হাসি। তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার কথা বলার ধরন, এইগুলো হল তোমার ব্যক্তিত্বের দিক, আমাকে এক কথায় কাবু করে ফেলেছে। তুমি প্রথম আমাকে চুম্বকের মতো টেনেছিলে সেই ফুলের দোকানের সামনে। পাশ থেকে রোদ-ঝলসানো তোমার ধারাল মুখ দেখে, তোমার চাবুকের মতো শরীর দেখে আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলুম। তোমার কাছে আমি নিজেকে লুকোতে চাই না। গোপনীয়তাটাই পাপ। সেদিন তোমার ঘামে-ভেজা কোমর ছুঁয়ে আমার ডান হাত এগিয়ে গিয়েছিল বালতি থেকে নোট তুলতে। সেই স্পর্শে আমি পেয়েছিলুম বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। সেদিন আমি তোমার প্রেমিক। আবার যেদিন শ্মশানে, গঙ্গার ধারে আমার বুকে মাথা রাখলে, তখন মনে হচ্ছিল আমাদের দু'জনেরই পিতৃবিয়োগ হয়েছে। আমরা দুটি ভাই-বোন। আবার শেষ রাতে স্নানের পর তোমাকে যখন ভিজে কাপড়ে জল থেকে তুলছিলুম তখন মনে হচ্ছিল তুমি আমার নায়িকা। এইবার বল, আমাকে তোমার কেমন লাগে? আমার সম্পর্কে তোমার কি ভাব?'

দু'জনে অন্ধকার মতো একটা জায়গায় চলে এসেছে। দোকানপাট নেই। কিছুটা দূরে আবার আলোর এলাকা। ডানপাশে একটা পার্ক। আরতি দাঁড়িয়ে পড়ল। শঙ্করকে বললে, 'আমার মুখটা এই আলোছায়ায় তুমি দেখ। যে কথা বলা যায় না, সে-কথা ফুটে ওঠে মুখে।'

শঙ্কর আকাশের আলোয় আরতির মুখের দিকে তাকাল। এ মুখ নায়িকার। চোখ দুটো যেন ইরানী ছুরি। পাশ দিয়ে এক প্রবীণ যেতে যেতে বললেন, 'উচ্চিং পোকা পড়েছে চোখে। অন্ধকারে হবে না, আলোতে নিয়ে যাও। নরম রুমালের কোণ দিয়ে টুক করে তুলে নাও। বাড়ি গিয়ে দু'ফোঁটা গোলাপজল।'

পরিচালক আর প্রযোজক দু'জনেই এসেছেন আজ, সাদা, রঙ-চটা একটা অ্যামবাসাডার চেপে। যাক, আর কিছু না হোক, একটা বাহন হয়েছে। প্রযোজক বললেন, 'স্টোরির কি খবর?'

'এই খবর।'

‘সে কি, ভিলেনটাকে মেরে ফেললেন।’

‘মারিনি তো, মানে মরেনি তো। এখন আমি আর লিখছি না। আমি আজ্ঞাবহ দাসমাত্র।’

‘ওই হল। ও সব আপনাদের অনেক ভড়ং আছে। ধর্মের পথ মানেই মৃত্যুর পথ। স্টোরিটার আর কি রইল। তারপর আবার সেই রাত। আপনি নায়ক-নায়িকাকে একটা ঘনিষ্ঠ অবস্থায় নিয়ে এলেন, এনে কি করলেন, ডুবিয়ে দিলেন অন্ধকারে। আপনাকে অন্ধকারে পেয়েছে।’

পরিচালক বললেন, ‘না, না, আধো-অন্ধকার, ডানপাশে একটা পার্ক, ইরানী ছুরির মতো চোখ, আমার ক্যামেরার পক্ষে খুব ভাল। এ-সব সফট সিন। এর মর্ম আপনি বুঝবেন না। আপনি শুধু দয়া করে ওদের পার্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন, তারপর খেল কাকে বলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।’

প্রযোজক বললেন, ‘তারপর কি হবে, পুলিস দু-ব্যাটাকেই মারতে মারতে নিয়ে যাবে ভবানীপুর থানায়?’

পরিচালক বললেন, ‘আজ্ঞে না, এইখানেই আসবে নতুন এক ভিলেন, প্রেমের ঘুঘুটির পালক ছেঁড়ার জন্যে। আর প্রেমিক মোরগটির সঙ্গে লেগে যাবে ঝটাপটি। ফাইট সিকোয়েন্স।’

প্রযোজক বললেন, ‘আমি সাফ কথা জানতে চাই, শঙ্কর আর আরতির বিয়ে হবে কি হবে না।’

পরিচালক বললেন, ‘বলুন কি হবে?’

এই ঘটনার ঠিক তিন দিন পরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল আরতিদের বাড়ির সামনে, নেমে এলেন ভবতোষ আচার্য ও আর এক ভদ্রলোক। শঙ্কর বেরোচ্ছিল পড়াতে যাবে বলে।

ভবতোষ বললেন, ‘এই যে আমার ইয়াংম্যান, আরতি আছে?’

‘আছে কাকাবাবু। আসুন. ভেতরে আসুন।’

আরতি সবে চান সেরে চুলে জট ছাড়াচ্ছিল। ভবতোষ বললে, ‘মা, দেখ কে এসেছেন?’

আরতি বললে, ‘কে, রাধুকাকা!’

দু’জনে ঘরে ঢুকলেন। ভবতোষ শঙ্করের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করতে করতে বললেন, ‘ইয়াংম্যান, আমরা একটু একান্ত বৈষয়িক কথা বলব, বাবা। যাবার সময় দেখা করে যাব তোমার সঙ্গে।’

শঙ্করের মা জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে রে শঙ্কু?’

‘আরতিদের উকিলমশাই। তুমি একটু চা বসাও মা। আমি খাবার কিনে আনি। মস্ত মানুষ। আমার গুরুও বলতে পার।’

রাধুবাবু বললেন, ‘করুণা মারা গেছেন আমি শুনেছি। তুমি আমার বন্ধু-

কন্যা। তোমার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। বলতে পার, স্রেফ জেদাজেদির বশে এই কোর্ট-কাছারি-মামলা। আমি এখন আমার সেনসে ফিরে এসেছি। আর মামলা নয়। এইবার সহজ সমাধান। এই পরিবেশে তোমার আর এক মিনিট থাকা চলবে না।'

'চোদ্দ বছর রয়েছি কাকু।'

'সে তোমার বাবার জেদে। আর না, প্যাক-আপ, প্যাক-আপ।'

ভবতোষ বললেন, 'প্যাক-আপ, প্যাক-আপ।'

'কোথায় যাব আমরা?'

'বারাসতে, তোমার বাগানবাড়িতে। যা আমি আজ চোদ্দ বছর আগলে বসে আছি। দেখবে চল, সেখানে তোমার মানসদা কি করেছে? বিশাল এক নার্সিং হোম। সেই নার্সিং হোমের নাম হবে, করুণাকেতন। সেখানে তোমার কত কাজ। এক যুগ ধরে তুমি সেবা করেছ বাবার। এইবার করবে সমাজের। তুমি হবে নিবেদিতা। দিস ইজ নট ইওর প্লেস, মা। তুমি এখন বন্ধনমুক্ত, তোমার সামনে নবদিগন্ত।'

'আমি একবার শঙ্করদার সঙ্গে পরামর্শ করে নি।'

ভবতোষ বললেন, 'কোনও দরকার নেই মা, আমরা ছাড়া তোমার কে আছে? রোমান্স রোমান্স, জীবন জীবন। তোমার ব্যাগে সামান্য কিছু ভরে নাও, ভ্যালুয়েবলস। পরে সব লরিতে যাবে। তোমার ফিউচারের একটা সমাধান করতে পেরে আজ আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল।'

'আমি শঙ্করদার সঙ্গে একবার কথা বলব।'

'না, করুণাকেতনের মেয়ে হয়ে তুমি কোনও ফিল্মি নাটক করতে পারবে না। তুমি আর দেরি কোরো না। ওদিকে মানস বেচারা রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'আমি যদি না যাই।'

রাধুকাকা বললেন, 'তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে। আমার স্বপ্ন ভেঙে যাবে। তোমার পিতা দুঃখ পাবেন। আমরা ঠিক করেছিলুম, আমাদের দু'জনের যদি ছেলে আর মেয়ে হয়, তাহলে তাদের বিয়ে হবে। আমার ছেলে মানস এফ. আর. সি. এস।'

ভবতোষকাকা বললেন, 'এতে হবে কি তুমি তোমার সম্পত্তি ফিরে পেলে। প্লাস পেলে আধুনিক এক নার্সিং হোম। যে হোমের নাম হবে করুণাকেতন। মামলা লড়ে যা তুমি কোনও দিন পাবে না।'

'কাকাবাবু ক'লাখ?'

'ক'লাখ মানে?'

'রাধুকাকু ক'লাখ খাইয়েছেন আপনাকে?'

দুই প্রবীণের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। হড়াস করে দরজা খুলে গেল। দু'জনে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। শঙ্কর আর তার মা চা-খাবার নিয়ে আসছিলেন। ছিটকে পড়ে গেল। ভবতোষ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'ব্রহ্মচারীর বিয়ে করা উচিত নয়।'

আরতি একটু গলা চড়িয়ে বললে, 'চোদ্দ বছর যখন একা চলতে পেরেছি, বাকি জীবনটাও পারব।'

প্রযোজক বললেন, 'সেই পাঁচশো টাকা আছে, না খরচ হয়ে গেছে?'

'চলেনি, সব ক'টা অচল।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওইটাই আমাদের হাতের পাঁচ, হাতের প্যাঁচও বলতে পারেন। দিন। আবার আর এক জায়গায় গিয়ে টোপ ফেলি।'

বিকট শব্দ করে গাড়িটা চলে গেল। আমার নিয়তির অট্টহাসি।

বারুদ

শব্দ শুনে সুধা এঁটো হাতেই ছুটে এলেন রান্নাঘর থেকে। মানস মেঝেতে দু'হাতে মাথা আড়াল করে বসে আছে, তার সামনে বেলো খোলা হারমোনিয়াম। আর শঙ্কর একটা কাঠের হ্যাঙার দিয়ে মানসকে আগাপাশতলা পিটিয়ে যাচ্ছে। একেবারে আন্তরিক পেটানো। কোনও দয়ামায়া নেই। সুধা অবাক, নিজের ছেলেকে কেউ ওভাবে মারতে পারে! সুধা ছুটে এসে স্বামীর হাত থেকে হ্যাঙারটা কেড়ে নিলেন, 'কি করেছে কি? তুমি ওকে অমন করে মারছ কেন? মরে যাবে যে।'

উত্তেজিত শঙ্কর বেরিয়ে এলেন দক্ষিণের খোলা বারান্দায়। ঘেমে গেছেন। টুকটুকে ফর্সা সুন্দর চেহারা। যখন বয়েস আরও কম ছিল, সবাই বলত কন্দর্প, গন্ধর্ব। শঙ্করের টকটকে ফর্সা মুখ রাগে লাল। সারা শরীর কাঁপছে। গায়ে চাঁপা ফুল রঙের ফিনফিনে পাঞ্জাবি। কালো কাঁচিপাড় ধুতি। শঙ্কর বেগে ঘরে ঢুকে মানসকে আচমকা একটা লাথি মেরে বললেন, 'গেট আউট ফ্রম মাই হাউস।'

সুধা জামা তুলে ছেলের ক্ষতবিক্ষত পিঠ দেখছিলেন। পুলিসেও বোধহয় এমন করে মারে না। সুধা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার শরীরে কি কোনও মায়া দয়া নেই। কিভাবে মেরেছো একবার দেখ। কোনও বাপ তার ছেলেকে এইভাবে মারে?'

শঙ্কর বললেন,'এই বংশে আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ গানের লাইনে যাবে না, যাবে না, যাবে না। আমি এসে দেখি আমারই হারমেনিয়াম নিয়ে রাসকেলটা আমারই গান গাইছে। এর আগে আমি বারবার ওয়ার্নিং দিয়েছি। তুই হারমোনিয়াম ছুঁবি না, তুই গলা দিয়ে সুর বের করবি না। লেখা-পড়া শিখে ডাক্তার হও, ব্যারিস্টার হও, ইঞ্জিনিয়ার হও, কিন্তু গাইয়ে তুমি হবে না।'

সুধা বললেন, 'এ আবার কি? আশ্চর্য কথা! যার অত সুন্দর গলা, এমন ভগবানদত্ত প্রতিভা, যে শুধু শুনে শুনে তোমার প্রায় সব গান অবিকল তোমার মতো গাইতে পারে, সে গান গাইবে না? এ কি? তোমার তো উচিত ওকে তালিম দেওয়া। পশ্চিমের ওস্তাদরা তো তাই করেন। তোমার এই অদ্ভুত আদেশের কারণ তো আমার মাথায় আসে না!'

শঙ্কর উঁচু গলায় বললেন, 'তুমিও গেট আউট। আমার ত্রিসীমানায় তোমরা কেউ আসবে না।'

সুধা ছেলেকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। শঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন দমাস করে। ছিটকিনি তোলার শব্দ হল ভেতর থেকে। সুধা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ জোর গলায় বললেন, 'সবাই গেট আউট হয়ে গেলে কাকে নিয়ে থাকবে?'

ভেতর থেকে উত্তর এল, 'ভিকিরিরা যেমন গান নিয়ে থাকে, অন্ধ ভিকিরি।'

কালোর ওপর ভারি সুন্দর চেহারা। মায়াবী মুখ চোখ। একমাথা ফুরফুরে চুল। দীর্ঘ, সুঠাম। শঙ্কর যেমন উঁচুদরের গাইয়ে তেমনি উচ্চশিক্ষিত। স্কটিশের নামকরা ছাত্র। ভারতবর্ষের তিনজন প্রথম সারির ওস্তাদের কাছ থেকে তালিম নিয়েছেন। খেয়াল, ঠুংরি, ভজন। সাত বছর বয়সে জামাইবাবুর কোলে বসে আসরে গান গেয়েছেন, তবলার সঙ্গে, তালে, লয়ে, 'কোলে তুলে নে মা কালী'। সেই আসরে ছিলেন ভীষ্মদেব। তিনি শঙ্করকে বলেছিলেন, 'তোমার হবে। তবে এখনই আসর মারার চেষ্টা কোরো না। নষ্ট হয়ে যাবে।' শঙ্করের হয়েছে। সত্যই হয়েছে। গানের ব্যাকরণে তাঁর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবেন না। তালে, লয়ে যে কোনও তবলিয়াকে তিনি ঘোল খাইয়ে দিতে পারেন। এক শার্পে তিন সপ্তকে তাঁর গলা খেলা করে অক্লেশে। সবই হয়েছে। হয়নি অর্থ। সংগীতজগতের কুৎসিত দলাদলি অনবরতই তাঁর পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে। প্রাপ্য সম্মান তিনি আজও পেলেন না। ভীষণ একরোখা, আর সৎ মানুষ, তেমনি রাগী, ফলে অক্ষম, অযোগ্য লোকের পায়ে তেল মাখাতে পারেন না। আর ওইটা না পারলে, এ-বাজারে মানুষের প্রচার বা প্রতিষ্ঠা হয় না। শঙ্করের বৃদ্ধ পিতা সংসারের হালটি ধরে আছেন বলেই চলছে, তা না হলে সংসার টাল খেয়ে পড়ে যেত। বাঁধ দিয়ে যেমন জল আটকায়, শঙ্কর সেইরকম প্রতিরোধ দিয়ে গান আটকাতে চাইছেন। এই বংশে আর যেন কেউ গাইয়ে না হয়। গান বেচার জিনিস নয়। গান আরাধনার জিনিস। প্রকৃত শিল্পীর ভবিষ্যৎ হল, অনাহারে মৃত্যু। শঙ্কর জানেন, ছেলে তারই প্রতিভার উত্তরাধিকারী হয়ে এসেছে। শ্রুতিধর। সংগীত তাকে টানবেই মায়াবিনীর বাঁশির মতোই। তারপর ভবিষ্যৎটা ছারখার করে দেবে। তিনি এড়াতে পেরেছেন, ছেলে কি পারবে? সুরের পেছনে আসবে সুরা, তার পেছনে সাকী। নিজের গুরুভাইদের অবস্থা তো পড়েই রয়েছে চোখের সামনে। আবীরলাল চক্রবর্তী। হীরেন মজুমদার। গলায় সুর না থাকুক, তালকানা, লয়কানা হও ক্ষতি নেই, পাটোয়ারি বুদ্ধি থাকলেই হল। যেটা এ-বংশের কারোর ছিল না কখনো, এখনো নেই। শরীরে বড় বেশি নীল রক্ত। বড় বেশি অহঙ্কার। ঈশ্বর আর সংগীত ছাড়া কারোর চরণে মাথা নত করবো না। তা বললে চলে! সেই কারণেই সব অচল হয়ে আসছে। মাথায় মাথায় দুই মেয়ে, এক ছেলে। এদিকে আমির ওমরাহদের মতো মেজাজ। কেউ বিয়ের নিমন্ত্রণ করলে বেনারসী নিয়ে লৌকিকতা করতে ছোটেন। বেদীজীর কাছে যখন খেয়াল শিখছেন, তখন থেকেই মোগলাই খানায় অভ্যস্ত। রোগানজুস আর পরোটা না হলে রাতের খানা জমে না। দু'একজন সমঝদার বন্ধু না হলে খেতে বসে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এমনিতে ভীষণ রসিক মানুষ। মেজাজ ভালো থাকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রসিকতা করে আসর জমিয়ে রাখতে পারেন। সবাই হেসে কুটোপাটি খাবে। আবার গানে বসলে অন্য মূর্তি। একেবারে আত্মগত, তন্ময় শিল্পী। তবলিয়া 'সম' ধরতে না পারলে 'ফাঁক' চিনতে না পারলে, তবলা টেনে নিয়ে নিজে বাজিয়ে দেখিয়ে দেবেন, দেখিয়ে দেবেন বোলের ছন্দ। তারপরেও না পারলে আসর থেকে দূর করে দেবেন।

তবলিয়া ডাঁট দেখালে গানের মধ্যে 'সম'টাকে এমন কায়দায় লুকিয়ে ফেলবেন যে বেচারা বিপাকে পড়ে যাবেন। জিজ্ঞেস করলে বলবেন, 'ধরার চেষ্টা করুন।' এক একবার এক এক জায়গা থেকে তিনি ধরবেন, শঙ্কর অমনি মাথা দুলিয়ে বলবেন, 'হল না, হল না।' প্রকাশ্য আসরে এইরকম কতবার হয়েছে। আসরে কেউ কোনও রাগ গাইবার ফরমাশ করলে শঙ্কর অসম্ভব রেগে যান। একবার এক আসরে জনৈক নামজাদা ধনী খুব মেজাজে বললেন, 'একটা মালকৌষ ছাড়ুন তো।' শঙ্করের পাতলা ধনুক-ভুরু আরও ধনুকের মতো হয়ে গেল। শঙ্কর শঙ্করায় গানের মুখটা গেয়ে ভদ্রলোককে খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ্ঞে, নিবেদন ঠিক হচ্ছে তো?' ভদ্রলোক ব্যঙ্গটা ঠিক ধরতে পারলেন না, খুব মুরুব্বিয়ানার চালে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোফা হচ্ছে। মধ্যমটা আর একটু কড়া করে লাগান।'

'কড়া করে লাগাবো?'

শঙ্কর যোগ রাগে একটা গানের মুখ গেয়ে বললেন, 'এইবার?'

ভদ্রলোক বললেন, 'অ্যায়, এতক্ষণে ঠিক এল।'

'তাই না কি? মালকোষে কি কি পর্দা লাগে বলুন তো?'

'ওই যে, যা যা লাগাচ্ছেন।'

শঙ্কর অমনি কড়া গলায় বললেন, 'এটাকে বাইরে বের করে দিন তো।'

সঙ্গে সঙ্গে হই হই পড়ে গেল আসরে। যাঁর টাকায় আসর, তাঁকেই বাইরে বের করে দেবার আদেশ! শেষে পরিস্থিতি এই দাঁড়াল শিল্পী থাকেন, কি উদ্যোক্তা!

রেকর্ড কোম্পানিতে শঙ্করের সুরে ও কথায় গান রেকর্ড করবেন নামী এক শিল্পী। রিহার্সাল হচ্ছে। সাত-আটবার দেখাবার পরও শিল্পীর গলায় গান আসছে না। শঙ্কর মালিকদের একজনকে ডেকে বললেন, 'কাকে ধরে এনেছেন মশাই। নি লিক করছে। কড়ি মধ্যম লাগছে কড়ি বরগার মতো।'

'কি বলছেন? এঁর রেকর্ড বাজারে পড়তে পায় না।'

'এঁকে দিয়ে হবে না মশাই। গলাকাটার গান হয় না। এঁকে দিয়ে ছড়া গাওয়ান।'

রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেল চিরকালের মতো। শঙ্করের 'টেনর' গলা। শঙ্করের সুরে যে কোনও গানের অন্তরা তারসপ্তকের মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ছুঁয়ে খেলা করে নেমে আসে। কে গাইবে সে গান! শঙ্কর ছাড়া।

রেডিওর স্টেশান ডিরেক্টারকে বললেন,'আমাকে আর কতকাল বি-হাই গ্রেডে ফেলে রাখবেন?'

ডিরেক্টার বললেন, 'যতদিন না আপনি গ্রেড বাড়াবার অডিশানে বসছেন।'

'আমার পরীক্ষা কারা নেবেন?'

'কেন? আমাদের প্যানেল অফ জাজেস।'

'তাঁরা গান জানেন? আমার পরীক্ষায় তাঁরা পাশ করতে পারবেন?'

বাস্, রেডিওর সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ। এইভাবে শত্রু বাড়াতে বাড়াতে শঙ্কর আজ

একেবারেই একঘরে। সবাই বলেন, 'ওই দুর্বাসাকে কে আসরে ডাকবে বাবা।'

আঘাতের বিনিময়ে আঘাত আর সেই আঘাতে আহত শঙ্করের এখন তিনটি সম্পদ, সুর, ঈশ্বর আর অভিমান। শঙ্করের ইদানীং একটা বিখ্যাত গান, নিজের কথায়, নিজের সুরে, 'গান শোনাবি তাকে যিনি দীন-দুনিয়ার কাণ্ডারী।/তিনিই যে তোর সকল গানের, সকল সুরের ভাণ্ডারী॥' তিলক-কামোদে এই গান যখন করেন, তখন শ্রোতাদের চোখে জল এসে যাবে। গানে বসলেই শঙ্করের একটা রূপান্তর হয়। চোখ-মুখ-চেহারা। তখন সকলেরই মনে হতে থাকে, এই সেই গন্ধর্ব। দেবলোক থেকে নেমে এসেছেন মর্ত্যালোকে। শঙ্কর গান দিয়ে আর মানুষকে ছুঁতে চান না। রেডিও অফিসের বড়কর্তা, রেকর্ড কোম্পানির বড়বাবু, কি পেটমোটা গোলাপী ধনকুবের, কি টিকিট কাটা হুজুগে শ্রোতা। গানের ওপারে এখন দাঁড়িয়ে দেখেন তিনি, 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—/ আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে॥' গানের ভেতরে যত ডুবতে থাকেন গলা ততই চড়তে থাকে। একেবারে তারসপ্তকের ধৈবতে ধরেন—'ব্যথায় কারো গলে না প্রাণ/ব্যথার বলো কি আছে দাম॥' শঙ্করের সমস্ত গানই এত কঠিন যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে তোলা অসম্ভব। ফলে একমাসের বেশি কেউ টেকে না। সুধা বলেছিলেন, 'একটু সহজ হও না।' শঙ্কর রেগে বলেছিলেন, 'তার মানে? সারেগামা শেখাবো আর মাসে পাঁচ টাকা মাইনে নোবো!'

সুধা মানসকে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন। দুই বোন ছুটে এল। তারা এতক্ষণ মারের শব্দ শুনে কাঁদছিল। কিছু তো করার নেই। বাবার ভয়ে সবাই তটস্থ। কোনও দিন হেসে কাছে ডাকলে তবেই এগোবার সাহস হয়। ভোলেভালে, গানপাগলা এই ভাইটাকে দু'জনেই ভীষণ ভালবাসে। লেখাপড়ায় তেমন মন নেই। মন পড়ে আছে গানের দিকে। মাথার ভেতর সবসময় সুর চলছে। দরবারীর আলাপ। কাফি সিন্ধুর মোচড়। পিলুর কান্না। ভৈরোঁর প্রার্থনা। এঘরে পড়া নিয়ে বসেছে, ওঘরে বাবা গানে সুর বসাচ্ছেন। মানস একেবারে বিভোর। কাজকর্ম দিয়ে গানটাকে বাবা যত কঠিনই করুন, মানসের মনে গেঁথে যায় সঙ্গে সঙ্গে। সামনে পড়ার বই, মানস গুনগুন করছে গান। নিজের মনেই বাবার তারিফ করছে। বাবাকে সে ঈশ্বরের মতো ভক্তি করে। গানের মতোই ভালবাসে। বাবা যদি তাকে কুপিয়ে খুনও করেন মানস প্রতিবাদ করবে না, চিৎকার করবে না। পড়ে পড়ে মার খাবে। কেউ যদি বাবার নিন্দে করে, সে যত বড় শক্তিশালীই হোক মানস তেড়ে যাবে।

সুধা পিঠের দিকে জামাটা তুলতে গেলেন। মানস হাসতে হাসতে বললে, 'আমার কিচ্ছু লাগেনি মা। বাবার গায়ে কি তেমন জোর আছে! আসলে কি জানো তো, হারমোনিয়ামটা খুব দামী তো, উল্টোপাল্টা বাজিয়ে আমি যদি খারাপ করে ফেলি।'

সবাই জানে মানস ভীষণ ভালো হারমোনিযাম বাজায়। সে যখন বাজায় মনে হয় কোনও পাকা লোক অবগ্যান বাজাচ্ছে।

মেজো বোন বললে, 'ভাইদা, তুই তো সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে বাজাবি! তাহলে এই মারটা খেতে হত না! বাবাব ভারি অন্যায়।'

মানসের মুখটা কঠিন হল। বললে, 'বাবার নামে কিছু বলবি না। বেশ করেছে বাবা আমাকে মেরেছে।'

সুধা মেয়েদের বললেন, 'কি লাগাই বল তো।'

দুই মেয়ে ভাইয়ের পিঠের অবস্থা দেখে আর্তনাদ করে উঠল, 'ইস, কি অবস্থা!'

মানস বললে, 'চোপ!! এমন কিছুই হয়নি। বাবা শুনতে পেলে দুঃখ পাবেন।'

সিঁড়িতে খড়মের আওয়াজ। শঙ্করের বাবা বাজার থেকে ফিরছেন। বৃদ্ধ, কিন্তু ভীষণ শক্তসমর্থ। ছেলের চেয়ে অনেক বেশি বলশালী। দীর্ঘ, ঋজু শরীর। যৌবনে কুস্তি করতেন। আড়াই মণ ওজনের মুগুর ভাঁজতেন। একটা গোটা কাঁঠালের রস পাঁচ পোয়া দুধ দিয়ে ফুটিয়ে খেতেন। একবাটি অড়হর ডালে আধপোয়া খাঁটি খুরজা ঘি ঢেলে খেয়ে হজম করার শক্তি ছিল। এই বয়সেও ছানি পড়েনি। চোখে দূরদৃষ্টি অথবা নিকট-দৃষ্টির চমশা লাগাতে হয়নি। প্রাচীন অভ্যাস, খড়ম পায়েই হাঁটাচলা করেন পাড়ার রাস্তায়। তাঁর হাঁটার দৃপ্ত ভঙ্গিমার দিকে লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। প্রবীণরা ডেকে ডেকে যুবকদের দেখান — 'দ্যাখ, সংযমী মানুষের চেহারা দেখ। এই বয়সেও কেমন হাঁটছেন, খাপখোলা তরোয়ালের মতো।' চামড়া এখনও তেলা, টানটান, মসৃণ। চুল পেকেছে, কিন্তু টাক পড়েনি। সাংঘাতিক রজোগুণী মানুষ। সিংহের মতো স্বভাব। কারোকে পাত্তা দেন না। পরোয়া করেন না। জীবনে কারোর কাছে হাত পাতেননি। প্রায মাথায় মাথায় একটি শিশু-পুত্র ও কন্যা রেখে স্ত্রীর চলে যাবার পর আবার বিয়ের জন্যে আত্মীয়-স্বজনেরা যখন ভীষণ উৎপাত শুরু করলে, তখন দুম করে অনেক টাকা মাইনের রেল কোম্পানির ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'আর তো কোনও সমস্যা নেই। নিজের ছানাদের নিজেই মানুষ করবো। সংসারে কোনও সার আছে? ছ'বছরের বিবাহিত জীবনে হিসেব করলে দেখা যাবে, ক্ষেপে ক্ষেপে তিনটে বছর গেছে ঝগড়ায়। দেড় বছর গেছে রোগের সেবায়। আর দেড়টা বছর একটু প্রেমালাপ। মার ঝাড়ু মার, ঝাড়ু মেরে ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর।'

বৃদ্ধ ছেলে আর মেয়েটিকে কিন্তু ভীষণ ভালবাসতেন। মায়ের মধ্যে দেখলেন জগদম্বাকে, ছেলের মধ্যে পেলেন শিবশঙ্করকে। ঢুকে পড়লেন সাধনার জগতে। শুরু হল তন্ত্রসাধনা। আরম্ভ হল ষোড়শোপচার-এ তারা মায়ের পূজা। কোথা থেকে এসে গেলেন এক তন্ত্রসিদ্ধ পূজারী। বৃদ্ধ একসময় ধ্রুপদ শিখতেন। নিজেই আবার শুরু করে দিলেন সংগীতসাধনা। বিশাল তাঁর কণ্ঠ। জয় শিব ওঙ্কার, ভজ শিব ওঙ্কার, বলে যখন তানপুরা বেঁধে গান ধরতেন, পাড়া-প্রতিবেশীকে তখন নিজেদের কথাবার্তা জোরে জোরে বলতে হত, কিছুই শোনা যেত না, মুকুজ্যেমশাইয়ের গানের ঠেলায়। বাড়িতে ঘনঘন সাধুসন্তর আগমন হতে লাগল। গৃহ হয়ে উঠল আশ্রম। অল্প বয়সেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন ভাল ঘরে। আদর্শবান, ভয়ঙ্কর এক

রাগী মানুষের সঙ্গে। ছেলেটিকে মেয়ে-জামাইয়ের হেপাজতে রেখে চলে যেতে লাগলেন হিমালয়ে। পরিব্রাজকের বেশ হল গেরুয়া। হাতে দণ্ড-কমণ্ডুলু, কাঁধে কম্বল। পাহাড়, ঝরনা, বরফ, হিমবাহ হল জীবনের সঙ্গী। হরিদ্বারে মিলে গেল গুরু। রাজসিক ভোগী হয়ে গেলেন যোগী। চাঁদের আলোয় পাহাড়ী ঝরনার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান শোনাতেন পরমেশ্বরকে।

সেই বৃদ্ধ খড়ম খটখটিয়ে আসছেন। হাতে একটা চটের থলে। নাতনীরা দাদার পিঠে সোঁটা সোঁটা ক্ষতের উপর ওষুধ লাগাচ্ছে। সুধা তটস্থ হয়ে এগিয়ে আসছেন বৃদ্ধ শ্বশুরের হাত থেকে থলেটি নেবার জন্যে। এমন সময় বন্ধ ঘরে শঙ্কর চড়া পর্দায় গান ধরলেন 'মা গো তুমি শুধু বেদনাই দিতে জানো।'

বৃদ্ধের গানের কান। বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি হল, দোর বন্ধ করেই ভরদুপরে দরবারী ধরলেন, খুনোখুনি হয়েছে বুঝি?'

ছোট নাতনী মুখ হলসা, সে আগেই বলে বসল, 'এই দেখ না বুড়োদা, ভাইদাকে কি রকম মেরেছে।'

'কে মারলে ওরকম করে! রাস্তায় বুঝি মারামারি করতে বেরিয়েছিলে?'

সুধা চাপা দেবার চেষ্টা করলেন, এখুনি পিতাপুত্রে বেঁধে যাবে হয়তো; আর সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়বে সংসার চালানোর প্রসঙ্গ। মানুষটার অনশন শুরু হয়ে যাবে। ওই ঘরেই একাসনে বসে শীর্ণ তাপসের মতো একের পর এক গান লিখে সুর করে গেয়ে যাবে, আর গেলাস গেলাস জল খাবে। দু'জনেরই কষ্ট। বৃদ্ধ তাঁর নিচের কুঠুরিতে ঢুকে যাবেন। বসে পড়বেন পুজোর আসনে। ওপরে আর ভুলেও উঠবেন না। দোকান বাজার বন্ধ। দিনকতক অরন্ধন। অনশনভঙ্গের অস্ত্র হল অনশন। ছেলেমেয়েদের চিঁড়ে খাইয়ে সুধা এক গেলাস জল খেয়ে বই কি বোনা নিয়ে বসবেন। মেয়েরা সাধ্য-সাধনা করবে। বাবার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বলবে, 'আজ তিনদিন হয়ে গেল, মা কিন্তু তোমার জন্যে শুধু জল খেয়ে আছে বাবা।'

সুধা কথা ঘোরাবার জন্যে বললেন, 'এক দণ্ড বাড়ি থাকে না, কোথায় কি করে এল বলছেও না।'

মানস নিচে নামার সিঁড়ির দিকে পালাচ্ছিল, বৃদ্ধ বললেন, 'কবে তুই একটু মানুষের মতো হবি রে?' মানস আবার রাস্তায়। বাড়িতে থাকলেই সে আবার গান গেয়ে ফেলবে। গান তার কাছে কাশির মতো। কিছুতেই চাপতে পারে না। অন্যমনস্ক হলে বেরিয়ে আসবেই, আর বেরোবে বাবার সুর ও কথা।

বাড়িতেই মানসের কোনও খাতির নেই; কিন্তু বাইরে তার সাংঘাতিক খাতির। সকলেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কৃষ্ণের মতো এই ছেলেটির দিকে। যে যখন সুযোগ পায় সেই মানসকে ধরে নিয়ে যায় তাদের বাড়িতে। যেখানেই মানস সেইখানেই জমজমাট পরিবেশ। গানে, গল্পে, মজার মজার কথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সকলকে মজিয়ে রাখে। অফুরন্ত মানসের গানের ভাণ্ডার। প্রায় সমস্ত রাগরাগিণী তার আয়ত্তে। সবরকম তাল সে জানে। নিজে নিজেই তবলা শিখেছে।

খেয়াল পুরো গাইতে পারে না, কিন্তু ঠুংরি, গীত, গজল, ভজন গেয়ে সে একটা সারা রাতের আসর অনায়াসে চালিয়ে দিতে পারে। ভক্তিমূলক গান, প্রাচীন শ্যামাসংগীত, টপ্পা অঙ্গের গান অসাধারণ ভাল গায়। সবাই ভাবে, বাবার তালিমে এইসব হয়েছে।

রাস্তায় বেরোলেই মানস যেন নিজেকে খুঁজে পায়। আড্ডাবাজ, মিশুক ছেলে। কেউ তার কাকা। কেউ দাদা। কেউ জ্যাঠা। কেউ দিদি। কেউ বউদি। সকলের সঙ্গেই তার সম্পর্ক। সোজা যে কোনও বাড়ির হেঁসেলে সে চলে যেতে পারে। মানস হল তার অহঙ্কারী বংশগর্বী বাবার নিরহঙ্কারী অপর পিঠ। মানস হল তার বাবার ব্যালেন্স। পাড়া-বেপাড়ার অজস্র শত্রু মানসের জন্যেই ঠাণ্ডা থাকে। এই বয়সের ছেলেরা মেয়ে-পাগল হয়। মেয়েদের সম্পর্কে মানসের আলাদা কোনও কৌতূহল নেই। সে বোঝে না, মেয়ে ব্যাপারটা কি? এটা মনে হয় তার পিতামহের উত্তরাধিকার। মানসের এই সরল শিশু-মনের জন্যে যে-কোনও বয়সের মেয়ে মানস বলতে অজ্ঞান। মানস যে কোনও বাড়ির হেঁসেলে সোজা চলে যেতে পারে। একটু হাসির গান। আখর দিয়ে কীর্তনের ক্যারিকেচার। ছায়াছবির নায়কের অনুকরণ। নিজের জীবনের মজার মজার গল্প। বন্যার জলে ভেসে যাবার গল্প। পাগল অধ্যাপকের গল্প। মানস কথা বলে একটু থেমে থেমে। কথা মাঝে মাঝে আটকে যায়। সেটাও একটা বড় আকর্ষণ। আর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তার অসাধারণ হাসি। তিন মিনিটে মানস পরকে আপন করে নিতে পারে। মানস চলে যাবার পর সকলেই একটা শূন্যতা বোধ করে। যেন মহানন্দের হাট ভেঙে গেল। যেন শ্রীচৈতন্য চলে গেলেন নবদ্বীপ ছেড়ে। কৃষ্ণ চলে গেলেন মথুরায়।

শংকরের সাংঘাতিক মেজাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একজনই কিছু আদায় করতে পেরেছিল, তার নাম সুখময়। লম্বা কঞ্চির মতো চেহারা। ঘাড় পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল। আড়ালে অনেকেই তাকে ঝুলঝাড়ু বলে। সামনে কেঁচো হয়ে থাকে। সুখময় যখন গান গায় তখন সুখময়; যখন ছুরি চালায় তখন তার নাম বল্টু। মাসখানেক আগে এক আসরে সুখময় বাগেশ্রী রাগে খেয়াল গেয়েছিল, আনন সায়েব গান শেষ হবার পর পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, 'বাগেশ্রী রাগটা ভেবেছিলুম আমিই ভাল গাই, এখন দেখছি তুমিও কম যাও না।'

মানস কোথায় যাই, কোথায় যাই করতে করতে চলে এল বল্টুদার বাড়িতে। ছন্নছাড়া একটা মানুষ। একটা পোড়ো বাড়ির বাইরের ঘরে তার আস্তানা। এককোণে মা-কালীর বেশ বড় একটা মূর্তি। বিরাট, লকলকে জিভ ঝুলিয়ে আধো অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন। বল্টু যখনই হোক রোজ ঘণ্টা তিনেক আসনে বসে। আজ বোধহয় সকালেই বসেছিল। কপালে দগদগ করছে এক ধাবড়া তেল-সিঁদুর। বাড়িটা এত প্রাচীন আর এত ড্যাম্প যে মায়ের গায়েও নোনা ধরে গেছে।

বল্টু মেঝেতে একটা চটের ওপর বসে তানপুরা ছাড়ছে। গায়ে গা লাগিয়ে আয়েস করে শুয়ে আছে রাস্তার একটা কুকুর। বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে

ঝাঁঝালো ঝগড়ার শব্দ। বল্টুর বাবা চির রুগ্ণ। এখন একেবারে ইনভ্যালিড। মাথায় মাথায় দুটি মেয়ে বেশ বড় হয়েছে। সুন্দরী, কিন্তু কেউই বিয়ের চেষ্টা করেনি বলে বিয়ে হয়নি। গোটাকতক বখাটে ছেলে জামাই হবার ইচ্ছে রাখে, বল্টুর ভয়ে এগোতে পারে না। দূর থেকে দেখে। মিটসেফের বাইরের বেড়ালের মতো। বল্টুর মা জীবনে একটা জিনিসই জানেন, ঝগড়া। ঝগড়ার সময় তিনি যেন চতুর্মুখ লেডি ব্রহ্মা। এখন সেই ঝগড়াই চলছে।

মানসকে দেখে বল্টু লাফিয়ে উঠল, 'এসো গুরু। এতদিনে মনে পড়ল ওস্তাদকে। নিশ্চয় বেদনার রাগিণী বেজেছে মনে!' ভেতরে ঝনঝন করে কি একটা পড়ল। মানস চমকে উঠেছিল। বল্টু হাত তুলে বললে, 'ঘাবড়ে যেও না গুরু 'সম' পড়ল। ঝাঁপতালে ঝগড়া চলেছে। মা মেয়েতে। ভাবছি, এ বছর কালী পুজোয় সবকটা পাঁঠাকে বলি দিয়ে দেবো। কাল রাত্তির থেকে শুরু হয়েছে।'

মানস চটের এক পাশে বসল। কুকুরটা অমনি পা দুটো টান টান করে মানসের কোলে তুলে দিল। বল্টু বলল, 'ব্যাটা যেন গভারনারের বাচ্চা। নাও গুরু, মিঞা মল্লারে একটু গলা মেলাও।' গান জমে গেল নিমেষে। এ ধরে ও ছাড়ে, ও ছাড়ে তো এ ধরে। বিস্তারের রকম রকম খেল। দুজনেই তখন অন্য জগতে। একটু আগে মানসের ক্ষতবিক্ষত পিঠটা বড় জ্বালাচ্ছিল, সে সব এখন উধাও। সুর বোনা চলেছে নানা নকশায়।

হঠাৎ বল্টুর মা জ্বলন্ত একটা তোলা উনুন এনে ঘরের মাঝখানে নামিয়ে দিয়ে খ্যানখেনে গলায় বললেন, 'নাও, রাগ-রাগিণীর কালিয়া কোফতা বানাও। সকাল সাতটা থেকে জনে জনে বলছি, ঘরে কিছু নেই, ঘরে কিছু নেই, ঘরে কিছু নেই সব কানে তুলো দিয়ে বসে আছে। নে সব চুলো খা চুলো।'

বল্টু মিঞা মল্লারেই গানের লাইন বলে উত্তর দিল 'কুতুর কুতুর ময়না, কাল দেব তোর গয়না। ওরে ও কুতুর কুতুর ময়না।।' বল্টুর মা রেগে বেরিয়ে যেতে যেতে মানসকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'তুমি এসেছো বাবা, ভেতরে এসো। ওর সঙ্গে বেশি মিশো না। পরকালটা ঝরঝরে করে দেবে।'

বল্টু সঙ্গে সঙ্গে গান ঘুরিয়ে নিল, 'দনুজ দলনে, অসুর নাশিতে মাতঙ্গী মেতেছে সমর রঙ্গে!'

বল্টুর মা বেরিয়ে গেলেন। চেহারা দেখলেই মনে হয় ভদ্রমহিলার চালচলনে কোথাও একটু গোলমাল আছে। তা বয়েস কম হল না; কিন্তু এখনও পাতাপেড়ে চুল বাঁধা। পানের রসে ঠোঁট লাল। কপালে কাঁচ পোকার টিপ। শাড়ি পড়ার ধরন ঠিক মা বলে মনে হয় না। ভদ্রমহিলার কাছে যেতে মানস ভয় পায়। একদিন দুপুরে। সেদিন কেউ ছিল না বাড়িতে। শোওয়ার ঘরে খাটে বসে মানস একটা ঠুংরির মুখ গাইছিল, মহিলা বললেন, 'এক সময় ভালো নাচতে পারতুম। তুমি গাও আমি নাচি।' বলেই শাড়িটা খুলে গানের সঙ্গে নাচতে লাগলেন ঘুরে ঘুরে। ওই শরীরের দিকে মানসের তাকাতে ভয় করছিল। একবার তাকিয়েই সে চোখ

নামিয়ে নিয়েছিল। তার সারা শরীর সিরসির করছিল। মনে একটা বিষণ্ণ অন্ধকার নেমে আসছিল। তবু সে বসেছিল। 'গানও গাইছিল। হঠাৎ মহিলা একটা পাক মেরে দুম করে খাটে এসে পড়লেন, মানসের ঘাড়ে। ঘামঘাম শরীরে মানসকে কষকষে করে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি আমার রাগকৃষ্ণ'। মুখে জর্দার গন্ধ। ভারি বুকের ওঠা-নামা। আবার গান ধরলেন, 'ও সে হোক না কালো, আমার তাকে ভালো লেগেছে।/ টেরি কাটা কালো ছোঁড়া আমায় পাগল করেছে।' সেই দেহভারে মানস উল্টে পড়ে গেল। ঘণ্টাখানেক ধরে কি ঝড় যে বয়ে গেল। সেই থেকে এই মহিলাকে দেখলেই মানস ভয় পেয়ে যায়। বল্টুদার বাবা চিররুগ্ণ। ব্রঙ্কাইটিসের রুগী। ইদানীং ভয়ংকর হাঁপানি। চোখ দুটো সব সময়ের জন্যে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আছে। লাল জবাফুলের মতো রঙ। কিন্তু মেয়ে দুটো কি সুন্দর। নিন্দুকে বলে মেয়ে দুটো এক জমিদারের। এমন এলোমেলো সংসার মানস আর দুটো দেখেনি। কোন গোছগাছ নেই। সবকিছু ছড়ানো ছত্রাকার। বল্টুদার মা বসে বসে কেবল হুকুম করে চলেছেন। এ বাড়ির অন্দরমহলে গেলে মানস বুঝতে পারে কোন্‌টা পাপের সংসার, কোন্‌টা পুণ্যের সংসার। সাধনা দিয়ে পুণ্যকে ধরে রাখতে হয়। তার বাবা মা বুড়ো দাদা, তার দু বোন যেন হোমের আগুনে পুড়ছে সব। মানস এরপরেই জেনেছিল, এই ভদ্রমহিলা বল্টুদার সৎ মা।

উনুনটার দিকে তাকিয়ে বল্টু বললে, 'ওস্তাদ মেঘমল্লার গেয়ে তানসেন আগুন নেবাতেন। এসো আজ হয়ে যাক সেই পরীক্ষা। দেখি উনুনটাকে নেবানো যায় কি না!'

শুরু হল মেঘমল্লার। মানস হারমোনিয়ামটা টেনে নিল। শুরু হল আলাপ। বল্টুর গলা অসাধারণ, একেবারে বড়ে গোলাম আলির মতো। সুর একবার ধরে গেলে বল্টু একেবারে অন্য মানুষ। গান গেয়েই সারাটা দিন কাটিয়ে দিতে পারে। উনুনে ছাই পড়ে এল। তানপুরা শুইয়ে বল্টু বললে, 'ওস্তাদ, মায়ের চরণে পেন্নাম ঠোকো। দেখ উনুন নিবিয়ে দিয়েছি। আমরা দ্বিতীয় তানসেন। মা কালীকে প্রণাম করে বল্টুদা বললে, 'মা, এত লোক মরে, তুমি কেন মরো না মা। এখন তোমার ভোগের জন্যে আমাকে বেরোতে হবে। ওস্তাদ, টাকা কি করে রোজগার করতে হয় বলো তো!! সব মুফতে গান শুনবে আর পিঠ চাপড়াবে। আর ডবকা মেয়েগুলোকে এগিয়ে দিয়ে বলবে, একটু সুর ধরিয়ে দাও। গুরুদক্ষিণা? অমনি গায়ের ওপর ঢলে পড়ল। পৃথিবীটা কি জায়গা মাইরি। ওস্তাদ, আজ একাদশী না?'

'ঠিক জানি না বল্টুদা।'

'হ্যাঁ, আজ একাদশী। সকালে ষষ্ঠী বুড়ি কোঁত পাড়ছিল।'

'ষষ্ঠী বুড়ি?'

'ওই যে সামনের বাড়িতে থাকে রে! বাতের রুগী।'

বল্টুদা মা কালীর দিকে ফিরে বললে, 'মা আজ তোমার নির্জলা একাদশী। শিব কি আর তোমার ভারে জ্যান্ত আছে মা, কবেই হার্টফেল করেছে। আর কেন?

এইবার একাদশীটা ধরো। কচি পাঁঠাগুলো একটু প্রাণে বাঁচুক।' বল্টু উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও উঠে পড়ল ধড়মড় করে। বল্টু তার মাথায় তিনটে তেহাই মেরে বললে, 'কাল রাতে তোকে মাংস খিলিয়েছি ব্যাটা। আজ স্বাস্থ্যের কারণে নো মিল।'

মানস বললে, 'যাচ্ছেন কোথায়?'

'পালিয়ে বাঁচি ওস্তাদ। একটু পরেই হোল ফ্যামিলির খিদে পাবে, তখন আর একবার কীর্তন শুরু হবে। তার আগেই পালাই। বল্টু যেন শালা সকলকে গেলাবার দাদন নিয়ে বসে আছে।'

ট্রাউজারের ওপর ঝলঝলে একটা শার্ট গলিয়ে নিল বল্টু। মানস জিজ্ঞেস করল, 'কি খাবেন আজকে?'

'আগে একটু হাওয়া খাই, তারপর দেখা যাবে। আরে জল-হাওয়ার মতো জিনিস আছে!'

'আমাদের বাড়িতে চলুন।'

'শোনো ওস্তাদ, খালি পেটে কোথাও যেতে নেই। নিজেকে ভিকিরি মনে হবে। আমরা হলুম রাজার জাত।'

'ওস্তাদ আজ তোমার লাঞ্চের কি ব্যবস্থা! বাড়িতে আছো, না গলাধাক্কা খেয়েছো?'

মানস উঠে পড়ল। বল্টু বলল, 'চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে, বেশ দলাইমলাই হয়েছে।'

মানস বললে, 'আজ আমার রূপালিদের বাড়ি নেমন্তন্ন।'

'সেই কারখানাঅলার মেয়েটা? তা ভালো। কেস কতদূর এগলো?'

'কি কেস?'

'আরে স্যুটকেস।'

বল্টু একলাফে রাস্তায়। কুকুরটাও লাফ মারলো।

মানস আর ভেতরে গেল না। উঠোনে রোদে বসে বল্টুদার দুই বোন কাপড়জামা কাচছে। গেলেই সব ছেঁকে ধরবে। মজার মজার গল্প শুনতে চাইবে। আজ মেজাজ ভাল নেই। পিঠটা টাটাচ্ছে। মনে হচ্ছে জ্বর আসবে। এই সময় কারোর বাড়িতেও যাওয়া উচিত নয়। সব বাড়িতেই এখন খাওয়ার সময়। গেলেই জোর করে খাইয়ে দেবে।

মানস একটা চায়ের দোকানে বসে এক কাপ চা খেল। বাড়ির দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। জানে কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা আসে। বাবার হারমোনিয়ামের আওয়াজটা এত সুন্দর যে লোভ সামলানো যায় না। আর ও কোনও দিন হাত দেবে না। প্রতিজ্ঞা। আচ্ছা, বাবা কি তাকে হিংসে করেন? তা কখনো হয়! কোনও বাবা কোনও ছেলেকে হিংসে করতে পারেন? তাহলে?

বোনেদের ডেকে ডেকে গান শেখান, আর তাকে দূর দূর করেন। কই ছাত্রছাত্রীদেরও তো বিশেষ কিছু দেন না! যক্ষের মতো নিজের সম্পদ, নিজের মধ্যেই আগলে রাখতে চান না কী?

মানস বাস স্টপে এসে একটা বাসে উঠে পড়ল। মাথায় এসে গেছে, কোথায় সে যাবে। ভবানীপুরের গুরদোয়ারায়। সেখানে তার খুব খাতির। অল্প অল্প পাঞ্জাবী ভাষা বলতে পারে, আর কয়েকশো ভজন সে তো জানেই। রাত ন'টা অব্দি তার আর কোনও ভাবনা নেই। তারপর দেখা যাবে। পরের কথা পরে। নিজের বাড়িতে ঢুকলেই একটা-না-একটা অশান্তি। তার জন্যে আজ বাড়িসুদ্ধ লোকের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে নিজেকে বড় একা মনে হয়। কেউ যদি তাকে একটু ভালবাসতো! সবাই থেকেও তার যেন কেউ নেই! বাবার ভয়ে বাড়ির কেউ তাকে ভালবাসতে সাহস পায় না। সে কি এতই খারাপ ছেলে!

বাস কিছুদূর এগোতেই মানস সব ভুলে গেল। অনেক লোক তার ভীষণ ভাল লাগে। কত রকমের মুখ! কত কথা! একা একা ভাবটা বেশ কেটে যায়! রাস্তা, ফুটপাত, দু'পাশে দোকান। পৃথিবীটা আনন্দে যেন টগবগ করে ফুটছে! বেঁচে থাকতে ভীষণ ভাল লাগে; কিন্তু কাল কি হবে, এই ভেবে আপনার লোকেরা ভীষণ ভাবিয়ে তোলে। ওরে তোর কাল কি হবে! বাবা চোখ বোজালে তুই কি করবি রে? বোনের বিয়ে, মায়ের ভরণপোষণ। পাওনাদার, ট্যাক্স। তারপর যদি নিজে সংসার করো তাহলে তো হয়েই গেল। মানস বুঝতে পারে না, মানুষ এত ভাবে কেন? ভবিষ্যৎ নিয়ে এত ভাবনার কি আছে! চলতে চলতেই তো ভবিষ্যৎটা বর্তমান হয়ে জীবন ছেয়ে অতীতে চলে যায়। আজ খুব রোদ, কাল খুব ঝড়বৃষ্টি। দুটো দিনই মানুষকে পেরোতে হবে। মানুষ আর পেরোয় কই, দিনই চলে যায় মানুষকে পেরিয়ে। যারা সব সময় প্ল্যান বগলে নিয়ে বাড়ি তৈরির কনট্রাক্টারের মতো চলে তারাই সারাটা জীবন হল না, হল না, আর গেলো গেলো করে। 'গান গেয়ে মোর দিন কেটে যায় বিরহের বালুচরে।' মানস অন্যমনস্কভাবে একটু জোরেই গেয়ে উঠেছিল। বসে থাকা পাশের ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন। মানস তার সেই অনিন্দ্য হাসি হেসে বললে, 'কিছু মনে করবেন না, লিক করেছে।'

প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন, 'গলাটা তোমার খুব ভাল। সুর ভরাট। সাধনা করো। জাতের গলা। আমার নাম যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী। নামটা শুনেছ নিশ্চয়!'

মানস তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে প্রণাম করল। পুরাতনী বাংলা গান আর টপ্পায় ভীষণ নাম। ফরসা ধবধবে চেহারা। ঋষির মতো মুখ। হলুদ দেয়ালের গায়ে রোদের আভার মতো এক ঝলক হাসি লেগে আছে। নিমেষে আলাপ জমে গেল। মানসের বাবার নাম শুনে যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'খুব চিনি! মেজাজটা যদি একটু সংযত করতে পারত, তাহলে ও তো আজ ভারতের শীর্ষস্থানে চলে যেতে পারত। যেখানে মানুষ নিয়ে কারবার সেখানে মানুষকে মানুষ ভাবতে হবে। কত রকমের মানুষ! সব মানুষকে নিয়েই চলতে হবে। লোক না পোক ভাবলে সাধুর চলবে। শিল্পীর চলবে

না। অত শিক্ষা নিয়ে তাই বেচারা আজ একঘরে। তুমি বাবা ওরকম হয়ো না।'

মানস বললে, 'জ্যাঠামশাই, একদিন আপনার বাড়িতে যাবো।'

'তোমার জন্যে আমার অবারিত দ্বার। শোনো বাবা, শুধু শ্রুতিতে হবে না, শাস্ত্রও চাই। সংগীত শাস্ত্র একটু পড়বে। বেস চাই, বেস। গুরুরও খুব প্রয়োজন। সংগীত গুরুমুখী বিদ্যা।'

গুরদোয়া-রায় আজ একটা কিছু আছে। খুব ভিড়। শিখ মেয়েরা দামি দামি শালোয়ার কামিজ পরে জায়গাটাকে যেন আলো করে রেখেছে। পাঞ্জাবিদের মধ্যে হাঁড়ি চড়ে না, এমন সংসার নেই বললেই চলে। যেমন সব সাজ, তেমনি সব চেহারা। মানসও বেশ লম্বা, তাই মানিয়ে যায়। পথে পথে ঘোরে, খাওয়াদাওয়ার ঠিক নেই; কিন্তু মুখে অদ্ভুত এক লালিত্য। মনে পাপ না ঢুকলে মানুষের মুখে একটা দেবভাব আসে।

গেলাসে গেলাসে সরবত বিলি হচ্ছে। মানসকে দেখেই কি আনন্দ সকলের, 'আইয়ে আইয়ে মানসজী, ওস্তাদজী।' ঢলঢলে সুন্দরী এক মহিলা, মানসের হাতে এক গেলাস সরবত তুলে দিলেন। ফরসা শরীরে গাঢ় নীল রঙের কামিজ। মানস না তাকিয়ে পারল না। তার মেজ বোন শোভনাটাকেও এই রকমই প্রায় দেখতে। তাকে যদি এইরকম একটা পোশাক পরানো যেত!

মানস বুঝতেই পারলো, আজ এখানে আসরে বসতে হবে। খাওয়াটা হবে জবরদস্ত। ভেতরে ভজন চলেছে। মানসের কানে সুর লেগে গেল। ভেতরে তার একটা সুরের মৌচাক আছে। খোঁচা লাগলেই গানের মাছি ভোঁ ভোঁ করে উড়তে থাকে।

মানস সোজা আসরে গিয়ে বসে পড়ল। পুরু, বাহারি কার্পেট পাতা। একজন মানসের গলায় একটা চাদর পরিয়ে দিলেন। খুব খাতির মানসের। এমন খাতির মানসকে নিজের লোকেরা করে না। মানসজী এইবার ভজন পরিবেশন করবেন।

প্রথমেই মানস কাফিতে ধরল, 'সাধো গোবিন্দকে গুণ গাবো।/মানব জনম অমোলক পায়ো, বিরথা কাহে গঁবাবো।' নানকের ভজন। শঙ্করও এই ভজনটা করেন। মানস তার সাধা গলায় একেবারে পশ্চিমা ওস্তাদের ঢঙে গাইছে। পঙ্গত একেবারে ভরে গেছে। যাঁরা বাইরে ছিলেন, তাঁরা সব ভেতরে চলে এসেছেন; যেন পাঞ্চাল-সভা। গানে বসলেই মানস গানটাকে দেখতে পায়। সেই কতকাল আগের ভারত। কম আলো, কম শব্দ, কম লোক। মোগল আমলের ঘর, বাড়ি, জাফরি। গালিব, সুরদাস, গোবিন্দ সিংজী, নানক. মীরাবাঈ, কবীর। পঞ্চনদ। নানক সায়েব আপন মনে গাইছেন, 'পতিত পুনীত দীনবান্ধব হরি, শরণ তাহি তুম আবো।' মানসের চোখে জল। গাল বেয়ে গড়াচ্ছে। মানসের চোখ দুটো বংশের ধারা অনুসারে বিশাল বড় বড়। আর চোখের পাতাগুলো যেন ছায়া দিয়ে ঘিরে রাখে। কুঞ্জছায়ে দুটি সরোবর। শ্রোতারা সব আসনে আটকে গেছেন। প্রবীণাদের চোখ ছলছল করছে। প্রবীণরা মালা জপছেন। কেউ, 'অয়, অয়' বলছেন। মানস গাইছে,

'ত্যজ অভিমান মোহনায়া পুনী ভজন রাম চিতলবো।/নানক কহত মুক্তি পথ এহী,/ গুরুমুখ হোয় তুম পাবো॥' ঢোল আর তবলা একসঙ্গে বাজছে কাহার্বা তালে।

এরপরই মানস শুরু করল কবীরের ভজন। 'মেরী মেরী দুনিয়াঁ করতে মোহ মছর তন ধরতে।' শঙ্কর ছাত্রছাত্রীদের বলতেন, 'মানে বুঝে গান গাইবে, আর যে ভাষার গান, সেই ভাষার উচ্চারণ যেন শুদ্ধ হয়।' মানস সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে চলে। যদিও সেই উপদেশ তার জন্যে নয়। মানস গাইছে আর গানের অর্থ তার মনে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে। যেমন জামা ঝোলাবার হ্যাঙারের মার তার পিঠে কেটে কেটে বসেছিল। দুনিয়া আমার আমার করে। মোহ-মাৎসর্যে জীবন কাটায় মানুষ। পূর্বে যাঁরা মুখ্য পীর হয়েছেন তাঁরাও এই করতে করতেই চলে গেছেন। 'কিসকী মমাঁ চচা পুঁনি কিসকা, কিসকা পংগুড়া জোঈ।' কারো মামা, কারো বা কাকা, কারো পঙ্গু স্ত্রী। এই তো সংসার! এই সংসার একটা বাজার, মণ্ডী। এ রহস্য জানতে পারে এমন ব্যক্তি দুর্লভ। আমি বিদেশী। কাকেই বা ডাকব। এখানে আমার কেউ নেই।

শ্রোতারা সব হায় হায় করতে লাগলেন। সারা দিন পেটে কিছু পড়েনি। মানসের গলা একেবারে ঝনঝন করছে। এইসব ভজনে সে নিজেই সুর আর তাল বসিয়েছে। মানস গানের নোটেশন করাও শিখে গেছে। সবাই বলে, সে নাকি একটা প্রতিভা। এতে মানসের কোনও অহঙ্কার নেই। প্রতিভা আবার কাকে বলে!

রাত নটার সময় মানস যখন গুরদোয়ারা থেকে বেরিয়ে এল তার পকেটে তখন তিনশো টাকা। শ্রোতাদের স্নেহের দান। পাঞ্জাবী খানায় পেট ভরপুর। আজ আর বাড়ি ফিরবে না মানস। বাড়ি আর তাকে টানে না। বাইরে কত ভালবাসা! বাড়ির অবস্থা সে দেখতে পাচ্ছে। নিচের ঘরে পঁচিশ পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে। চটা ওঠা উঠোন। খোলা নর্দমার গন্ধ। মশা। বুড়োদাদা তাঁর বিশাল সিন্দুকটাকে বেদী করে. তার ওপর বসে আছেন ধ্যানে। ওপরের সবচেয়ে ভাল ঘরটায় কার্পেটের ওপর বসে আছেন বাবা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। হয় লিখছেন, না হয় গানে সুর করছেন। উপোসে মুখ শুকনো। কারোর সঙ্গে কোনও কথা নেই। তার পাশের ঘরে মা আর দুই বোন। বোন দুটো পড়ছে। রান্নাঘরে শিকল তোলা। বাড়ি নিস্তব্ধ। উঠোন থেকে সোজা উঠে গেছে বেঁটে জাতের এক নারকেল গাছ। রাতের বাতাসে পাতার ঝালর হিল হিল করে দুলছে। যেন কিছু একটা খুঁজছে।

আকাশের পশ্চিম কোণে বিশাল একখণ্ড মেঘ উঠেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের দেঁতো হাসি। বাতাসে ঠাণ্ডার সিরসিরানি। অল্প দূরেই মামার বাড়ি। মানস যখন মামার বাড়ি পৌঁছলো তখন সাড়ে নটা, পৌনে দশটা। মামার বাড়ি এক মজার বাড়ি। সাবেক কালের বনেদী বংশ। দাদু ছিলেন সুপণ্ডিত প্রধান শিক্ষক। পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন দোতলার ঘরে। দিদিমা কানে কিছুই শোনেন না। একমাত্র মামা, ভীষণ ভালো মানুষ, কিন্তু সাংঘাতিক ভুলো মন। আবার ঢেঁকুরের রুগী। যেই সূর্য ডুবলো, শুরু হল ঢেউ ঢেউ ঢেঁকুর তোলা। আর মামা অমনি, 'নাঃ, পেটে গ্যাস

হয়ে গেছে, গ্যাস হয়ে গেছে', বলতে বলতে সারা বাড়ি ঘুরবেন আর ঢেঁকুর তুলবেন। ঠিক যেন বাছুর ডাকছে! রাস্তার মোড় থেকে শোনা যাবে সেই শব্দ। বাড়ির বাইরে মার্বেল ফলকে লেখা আছে, 'নিকুঞ্জ নিবাস'। পাড়ার লোকে বলে উদ্গারালয়। একমাত্র মাসীমা। খুবই সুন্দরী, কিন্তু মাথার গোলমাল। সবসময় নয়। শুক্লপক্ষে বাড়ে। চাঁদ যত বড় হতে থাকে মাথা তত ঢিলে হতে থাকে। পূর্ণিমায় একেবারে পূর্ণ উন্মাদ। পাগলামির একটাই লক্ষণ, দু'চার কথা বলেই বলবেন, 'আচ্ছা, আমার চোঁখের নিচে কি কালি পড়েছে?' যেই বলবে, 'না, কই কালি পড়েনি তো!' অমনি বলবেন, 'তা হলে আয়নায় একবার দেখে আসি।' সেই যে আয়নার সামনে বসলেন, শুরু হল ঘষাঘষি। বিয়ে হয়েছিল। শ্বশুরবাড়িও খুব ভালো। মাসী মেসোকেও পাগল করে দিয়ে পালিয়ে এসেছেন। তিনি দু'চার কথার পরই প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা আমার কি ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে!' তারপর নিজেই বলবেন, 'একটু মনে হয় হচ্ছে! যাই বেল্ট বেঁধে আসি।' শ'খানেক বেল্ট কেনা হয়ে গেছে। কেউ বিদেশ গেলেই বলবেন, 'আমার জন্যে ভালো দেখে একটা বেল্ট এনো তো।'

মানস ঢুকেই মামার মুখোমুখি হল। তিনি তখন একটা ঢেঁকুর তোলার কসরত করছিলেন। মানসকে দেখেই উদ্গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই জায়গাটার নাম কি রে?'

'কোন্ জায়গাটা?'

'ওই যে রে যেখানে বরফের একটা কি হয়!'

'আইসক্রিম?'

'ধুর, আইসক্রিম তো খায়! এ হল পুজো করার জিনিস! শিবলিঙ্গ রে। বরফের বিশাল শিবলিঙ্গ। তীর্থস্থান।'

'ও, তুমি অমরনাথের কথা বলছো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ অমরনাথ। উঃ, ভাগ্যিস তুই এলি! নামটা এমন আটকান আটকে গিয়েছিল মেমারিতে। ভাল করে ঢেঁকুর তুলতে পারছিলুম না। সেই সন্ধে থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র দশটা ঢেঁকুর কোনও মতে উঠেছে।'

'কটা ওঠার কথা?'

'তা শ'খানেক তো বটেই।'

কথা শেষ করেই তিনি পরপর গোটা আষ্টেক ঢেঁকুর তুললেন। রাগমালার মতো ঢেঁকুরমালা।

মানস বললে, 'এই তো, চ্যানেল খুলে গেছে। আঠারটা হয়ে গেল।'

'ভাবতে পারিস কি হার্ড টাস্ক, রাত বারোটার মধ্যে আরো বিরাশিটা তুলতে হবে! এ কি তোর ফুল তোলা, না চুল তোলা!'

দোতলার বারান্দা থেকে দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এল রে এত রাতে?'

মামা বললেন, 'মানস।'

দিদিমা শুনতে পেলেন না। বললেন, 'এখনও কিচ্ছু খালি করা হয়নি, বলে দে কাল সকালে আসতে।'

মামা মানসকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বললে বল তো?'

'ও কিছু না।'

মামা দর্শনের অধ্যাপক। তিনি সহজে ছাড়বেন কেন? তিনি বললেন,'কিছু না বলে কিছু নেই। কিছু আছে, তবেই না কিছু নেই? কিছুই না থাকলে কিছু না থাকার কথাটা আসে কি করে? অবশ্যই কিছু আছে। তা হলে পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস আছে, যা সত্যিই নেই। হ্যাঁ আছে বলেই না না। না শব্দটা আগে না হ্যাঁ শব্দটা আগে! আমি — যখন আছি, তখন সব আছে। আমি যখন নেই তখন কিছুই নেই। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে -- মৃত্যুতেই নেই। তার মানে মৃত্যুও নেই। তাহলে প্রকৃত না-থাকাটা কি? বলো কি?'

'মৃত্যু।'

'সে তো তোমার মৃত্যু। তোমার মৃত্যুর পরেও তো অনেকে রয়ে গেল।'

'আমি নেই তো কেউ নেই।'

'আহা, মামার বাড়ি আর কি? তুই নেই তো কি হয়েছে? অন্যের স্মৃতিতে তো তুই আছিস। মানস ছিল বলেই না মানস নেই।'

'তাহলে কি হবে?'

'সেইটাই তো এক সমস্যা! পৃথিবীটা যে কি সমস্যার জায়গা! কিছুই ভাল লাগে না। এ ভাবে বাঁচা যায়!'

'তুমি অত ভাবছ কেন?'

'কি আশ্চর্য! ভাববো না? না ভেবে মানুষ বাঁচতে পারে? আমি গরু না ছাগল!'

মামা আবার পরপর ছ'সাতটা ঢেঁকুর তুললেন। আর ঠিক সেই সময় মাসিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সেজেগুজে। মানসকে দেখে বললেন, 'মালা এনেছিস। মালা?'

'মালা? মালা কি হবে?'

'ওমা! তাও জানিস না বুঝি? আজ যে আমার বিবাহবার্ষিকী!'

মামা বলতে লাগলেন, 'স্যাড, ভেরি স্যাড, ভেরি ভেরি স্যাড।'

মাসিমা এরপরেই চলে এলেন তাঁর আসল জায়গায়। জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, আমার চোখের তলায় কালি আছে?'

মানস কিছু বলার আগেই, মামা বলে দিলেন, 'হ্যাঁ, একটু যেন কালচে কালচে লাগছে।'

মাসিমা অমনি চিৎকার করে বললেন, 'চোপ। তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করিনি। তুমি রুগি। তুমি একটা আধপাগলা বুড়ো। মানস তুই বল তো।'

মানস বলে, 'একটু যেন কালোকালো লাগছে।'

'যাই বাবা, তাহলে ভাল করে আর একটু ঘষি।'

মাসিমা আবার তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মামা তখনও সমানে বলে চলেছেন, 'স্যাড। ভেরি স্যাড।'

মানস দোতলায় চলে গেল। বিশাল বড় ঘরে বিশাল এক খাটে শুয়ে আছেন বৃদ্ধ দাদু। শরীরটা পড়ে গেলেও, বোধবুদ্ধি, স্মৃতি সবই প্রখর। কথা বলে, তবে একটু জড়িয়ে যায়। দিদিমা বললেন, 'ও মা তুই এসেছিস! ওপর থেকে আজকাল আর ঠিক ঠাহর করতে পারি না। চোখ দুটো একবারে গেছে। সব কিছু যেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে দেখছি। তা বল, সব কে কেমন আছে?'

'ভালো আছে।'

বৃদ্ধা কি বুঝলেন কে জানে। বেশ জোরে বললেন, 'সে কি রে?'

দাদু বিছানা থেকে বললেন, 'কে এলি মানস?'

মানস খাটের ধারে গিয়ে বসল। বৃদ্ধের অবশ শরীর এলিয়ে আছে। ওষুধের গন্ধ। বেডসোর হয়ে যাবার ভয়ে শরীরে ওষুধ লাগানো হয়। বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যাঁ রে! লেখাপড়াটা একেবারে ছেড়ে দিলি? আমাদের বংশে যে ওইটাই ছিল রে!'

'আমার যে গান ভীষণ ভালো লাগে।'

'আহা! তোর বাবা তো গান আর লেখাপড়া দুটোই একসঙ্গে রেখেছিলেন।'

'আমিও তো পড়ছি।'

'হ্যাঁ দাদু ওটা ছেড় না। শিক্ষা ছাড়া মানুষের পশুত্ব ঘোচে না।'

হঠাৎ মাসিমা এলেন ঘরে। খাটের কাছে এসে বাবাকে বললেন, 'উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। যখনই দেখছি তখনই শুয়ে আছ। এত শুয়ে থাকলে যে বাতে ধরবে।'

পেছন পেছন মামা এলেন, ঢেঁকুর তুলতে তুলতে। ঢুকেই বললেন, 'আমার পক্ষে আর ওই টিমকে সার্পোট করা সম্ভব হচ্ছে না। মোহনবাগান আজও দু গোলে হেরেছে! ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলতে গেলেই যে ওদের কি হয়! কাল আমি পাড়ায় মুখ দেখাবো কি করে?'

দিদিমা বললেন, 'হ্যাঁ রে ওষুধ এনেছিস!'

মামা চমকে উঠে বললেন, 'ওষুধ? কার ওষুধ? কিসের ওষুধ?' তারপর দু'হাতে মাথা চাবড়ে বললেন, 'সর্বনাশ! প্রেসক্রিপসানটা তো ধোপার বাড়ি চলে গেল, জামা কাপড়ের সঙ্গে।' সারা ঘরে ঘুরতে শুরু করলেন, একটা করে ঢেঁকুর তোলেন, আর কপালের কাছে টুসকি মেরে বলেন, 'কি যেন নাম ছিল ওষুধটার! আহা! লার, লার, মনে আসছে মুখে আসছে না।'

দিদিমা বললেন, 'কি করছে বল তো, নামসংকীর্তন! এত ভক্তি এল কোথা থেকে?'

দাদু বললেন, 'কেমন বুঝছিস দাদু! এর নাম সংসার! বেঁধে মারছেন। বুঝতে পারি না, আমার পাপটা কি? সারাটা জীবন সাত্ত্বিকভাবে কাটিয়ে, শেষটায় আমার

এ কি হল? দাদূভাই একটা গান শোনা তো। এমন গান যেন একটু কাঁদতে পারি। ভাল করে কাঁদতে পারলে তাড়াতাড়ি মুক্তি হয়।'

মানস খাটের তলা থেকে হারমোনিয়ামটা টেনে বের করল। এই বাড়িটাও কি হয়ে গেল, কি সুন্দর ছিল।

দাদু বললেন, 'গোপাল, তুই যদি এইভাবে ঢেঁকুর তুলিস গান হবে কি করে?'

মামা বললেন,'গান আরম্ভ হলেই থেমে যাবে।'

মাসিমা বললেন, 'ও গান হবে বুঝি! তাহলে একটু সেন্ট মেখে আসি।'

মানসের মনে তখনো কবীর ঘুরছেন। দাদু বললেন. 'যদি হিন্দি ধবিস তাহলে আমাকে মানেটা একটু ধরিয়ে দিস।'

মানসের কানে হারমোনিয়মের সুর ঢুকলেই, সে আর কারোর নয়। পুরোপুরি একজন শিল্পী। তখন তার মুখচোখের চেহারাই আলাদা। মানস একপাল্টা দ্রুত হারমোনিয়াম বাজিয়ে সুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'গানটার মানে আমি আগেই বলে দি— 'চার দিন অপনী নৌবতি চলে বজাই।' তার মানে, চার দিন আপনার নহবত বাজিয়ে চলল। 'উতানেঁ খটিয়া গড়িলে মটিয়া সংগি ন কুছ লৈ জাই।।' এমন খাটিয়া তৈরি করলে তাও ঢেকে দিলে মাটি দিয়ে, সঙ্গে তো কিছু নিয়ে যেতে পারলে না। 'দেহরী বৈঠী মেহরী রোবৈ দ্বারৈ লগি সগী মাই।' দেহরী মানে, দাওয়া পর্যন্ত স্ত্রী যাবে কাঁদতে কাঁদতে, দরজা পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে যাবে নিজের মা। 'মরহট লৌঁ সব লোগ কুটুম্ব মিলি হংস অকেলা জাই॥' সব কুটুম্ব সজ্জন মিলে শ্মশানে গেল; কিন্তু হংস চলে গেল একলা।

মানস এইবার গানের শেষ দুটি লাইন ভৈরবীতে ধরে ফেলল আর ধৈর্য রাখতে পারল না ব্যাখ্যার—'বহি সুত, বহি বিত, বহি, বহি পুর পাটন বহুরি ন দেখৈ আই। /কহ কবীর ভজন বিন বন্দে জনম অকারথ যাই॥' এক ফাঁকে থেমে মানেটা বলে দিল—সেই পুত্র, সেই বিত্ত, সেই ঘরদোর কিছুই আর ফিরে এসে দেখে না। কবীর বলছেন, ওরে বান্দা, ভজন বিনা বৃথা জন্ম গেল।

জীবনের সেরা গান মানস সেদিন গাইল। পাগলী মাসি সেও কেঁদে ফেলল। মামার ঢেঁকুর বন্ধ। দিদিমা ভাল শুনতে না পেলেও কিছুটা তাঁর কানে গেল। দাদু একেবারে নির্বাক! দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

গান শেষ হবার পর মানসকে কাছে ডেকে বৃদ্ধ বললেন, 'আমার হাত দুটো অচল না হলে তোমাকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরতুম। গান তোমার ভেতরেই আছে। তুমি নিয়ে এসেছ। তুমি দিয়ে যাও। সাবধান! একটু ধর্ম দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখো। সুরের দেবলোক আর অসুরের ভোগলোকের চৌকাঠটা বড় সরু।'

মাসিমা হঠাৎ বললেন, 'এটা মনে হয় জন্মদিনের গান নয়, মৃত্যুদিনের গান। আমি যে কেঁদে ফেলেছি। হ্যাঁ রে, চোখের কোলের কালি কি আবার বেরিয়ে পড়েছে?'

॥ ২ ॥

মানস যখন গুরদোয়ারার শ্রোতাদের মাতাচ্ছিল, সেই সময় তার বাড়িতে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সন্ধে সাতটা নাগাদ ঝকঝকে নতুন একটা গাড়ি তাদের বাড়ির সামনে থামল। নেমে এলেন প্রায় প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। এক মাথা কাঁচা-পাকা চুল। পরনে ধপধপে সাদা খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবি। দেখলেই মনে হয় কংগ্রেসের কোনও চাঁই। ভদ্রলোকের নাম সুরজিৎ দাস। রূপালির বাবা। শিল্পপতি। পায়ে মশমশে জুতো।

ঢুকেই তিনি খুব জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগলেন।

উৎকট কড়া নাড়ার শব্দ শঙ্কর ভীষণ অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, কড়া নাড়া, জিনিসপত্র রাখা, হাঁটাচলা, হাত-পা নাড়া, কুলকুচো করার ধরন দেখে মানুষ চেনা যায়। সংস্কৃতিবান মানুষের আচার-আচরণ অত্যন্ত সুললিত হয়। ভদ্রলোক যখন কড়া নাড়ছিলেন, শঙ্কর সেই সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে মানিপ্ল্যান্ট ঠিক করছিলেন।

মুখ ঝুলিয়ে এক দাবড়ানি দিলেন, 'ইডিয়েটটা কে?'

ভদ্রলোক একটু পেছিয়ে গিয়ে বারান্দার দিকে মুখ তুলে বললেন, 'ইডিয়েটের নাম সুরজিৎ দাস।' এই তল্লাটের সবাই এই নামের সঙ্গে পরিচিত। খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি। এই অঞ্চলে যা জায়গাজমি ছিল, প্রায় সবই কিনে ফেলেছেন। জমিদারদের যুগ শেষ, শুরু হয়েছে শিল্পপতিদের খেলা। এক পা শিল্পে আর এক পা রাজনীতিতে। শিল্পের গাড়ির স্টিয়ারিং হল রাজনীতি। একেই বলে দেশটাকে কব্জা করা। মাখন খাওয়া। স্বাধীনতার আগে সব রোগাপটকা ছিল। এখন নধরকান্তি। মসৃণ ভাগলপুরী গরু। এই সুরজিৎ এক সময় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াত। সংসারে হাঁড়ি চড়ত না। এখন এই পাড়ায় তার পাঁচতলা বাড়ির ছাদের মিনার সারারাত বাতিঘরের মতো জ্বলে থাকে। একতলায় উমেদারের ভিড়। দোতলায় নেতাদের মজলিশ। তিনতলায় আমোদপ্রমোদ। চারতলায় বসবাস। পাঁচতলায় নির্জনবাস। এই সুরজিৎ দাস এখন প্রায় সমস্ত কমিটির চেয়ারম্যান। শিক্ষিত, পণ্ডিত, অধ্যাপকদেরও স্যার। থানার ওসি স্যালুট করেন। যে যাই করুক, শঙ্কর ভদ্রলোককে পাত্তা দেন না। শঙ্করের বাবা দেখা হলেই বলেন, লোহাকাটা দাস। সুরজিৎ বিরক্ত হলেও বলেন না কিছু; কারণ শঙ্করের বাবা একসময় তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রেল কোম্পানিতে একটা চাকরিও করে দিয়েছিলেন।

শঙ্কর বললেন, 'তুমি? হঠাৎ কি মনে করে? এস ওপরে এস।'

সুরজিৎ মশমশ করে ওপরে এল। জুতো পরেই ঢুকছিল। শঙ্কর বললেন, 'জুতো ছেড়ে এস।'

সুরজিত কার্পেটের ওপর বসল। শঙ্কর দেখছেন আর ভাবছেন—কি ছিল, আর কি হয়েছে! বিরাট শরীর। ভারিক্কি মুখ। নেতাদের মতো কাঁচাপাকা চুল। বিশ বছর আগের সুরজিৎ! সুরজিৎ ঘরের চারপাশে চোখ বোলাতে বোলাতে ভাবছে—অবস্থা পড়ে এসেছে। আর সে দিন নেই, সে দাপট নেই। থাকার মধ্যে মেজাজটাই আছে।

বাঘের আর দাঁত নেই, ডাকটাই আছে। সরস্বতী আর কি দেবেন। দেনেঅলা তো লক্ষ্মী। আমার ফ্যাকট্রির নাম তাই, লক্ষ্মী ইন্ডাস্ট্রিজ। ইঞ্জিনিয়ারদের আমি চাকরি দি। চাকরির সুপারিশ করে মন্ত্রীরা আমার কাছে তাদের আত্মীয়দের পাঠায়। আমি বোর্ডে বসে ইন্টারভিউ নি। সুরজিতের মনে হল, সে কারোর মৃত্যুশয্যার পাশে এসে বসেছে। বনেদিয়ানার মৃত্যু। পথে যারা ছিল তারা ওপরে উঠছে। ওপরে যারা ছিল তারা পথে নামছে।

শঙ্কর যেন ধ্যানাসনে বসেছেন। বেশ বিরক্তি মেশানো গলায় বললেন, 'বলো কি বলবে?'

সুরজিৎ বললে, 'মেয়ের বিয়ে দোব।'

'দেবে, দেবে, তার আমি কি করবো?'

'তুমি অনুমতি দেবে।'

শঙ্কর একটু অবাক হলেন। ভেতরে ভেতরে একটু নরমও হলেন। এত শ্রদ্ধা এত ভক্তি! একমাত্র মেয়ে। এক সময় গান শিখতে আসত শঙ্করের কাছে। দেখতে শুনতেও ভাল। বেশ একটা সংস্কৃতির ছাপ আছে। লোহাকাটার মেয়ে বলে মনেই হয় না।

শঙ্কর বললেন, 'আমার অনুমতির জন্যে কাজ আটকে আছে?'

'অবশ্যই। বিয়ে তো হবে তোমার ছেলের সঙ্গে!'

শঙ্কর যেন স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠলেন, 'আমার ছেলের সঙ্গে! মানসের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। আর তো কোনও উপায় নেই। মেলামেশাটা এমন জায়গায় চলে গেছে যে এর বাইরে আর কিছু ভাবা যায় না।'

'তার মানে?'

'মানে প্রেম। দু'জনে দু'জনের প্রেমে পড়েছে।'

'সে আবার কি?'

'লাভ। আমার মেয়ে তোমার ছেলেকে ছাড়া আর কারোকে বিয়ে করবে না। আর তোমার ছেলেরও ওই একই ব্যাপার।'

'আচ্ছা! তাহলে কাল সকালেই আমার প্রথম কাজ ওই প্রেমিকটির পেছনে ক্যাঁত করে একটা লাথি মেরে বিদায় করা; তারপর তুমি যা পার তাই কোরো। একটা জাতের বিচারও তো আছে।'

'এখনও জাতের বিচার? জাত বলে কিছু নেই। তুমি না প্রগতিবাদী?'

'জাত আছে। যাক সেটা বাদ দিলেও, বংশ থাকে।'

'পুরুষে পুরুষে বংশ বদলায়। আমাদের এখন উঠতি, তোমাদের পড়তি। পূর্বপুরুষের তালপুকুরে এ-পুরুষের ঘটি ডোবে না।'

শঙ্করের ফর্সা মুখ লাল জবার মতো হয়ে গেল। একবার মনে করলেন

লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে বললেন, 'এই পড়তি বংশের, বেকার, অপদার্থ একটা ছেলের সঙ্গে তোমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবে কেন?'

'সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীকে মেলাবো বলে। মায়ের কৃপায় আমার অর্থের অভাব নেই। একটা বাড়ি, একটা গাড়ি, কয়েক লাখ টাকা আমার কাছে কিছুই নয়। ছেলেটার ভেতর অসাধারণ প্রতিভা। আমার মনে হয়, ও তোমার চেয়ে বড় হবে। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি কিছুই করতে পারলে না; আর ও কিছু করুক সেটাও তুমি চাইলে না।'

শঙ্কর এবার লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'গেট আউট। তুমি আমার ছেলে কিনতে এসেছ?'

'কিনতে না পারি, কুড়িয়ে নোবো। তোমরা তো ফেলেই দিয়েছ। পথে পথেই তো ঘোরে। তোমাকে শুধু জানিয়ে গেলুম।'

সুরজিৎ মশমশ করে বেরিয়ে গেলেন। দামী গাড়ির দরজা বন্ধের শব্দ হল। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে যেই চলে গেল শঙ্করের মনে হল শব্দটা তার ভেতরেই হল। এক ট্যাঙ্ক পেট্রলে আগুন ধরে গেছে। প্রথমেই এক টান মেরে বারান্দায় এতক্ষণ ধরে সাজানো সমস্ত মানিপ্ল্যান্ট পটাপট টান মেরে ছিঁড়ে ফেললেন। পাশেই একটা গোলাপফুলের টব ছিল। একটানে গাছটাকে উপড়ে দিলেন। তাতেও মন শান্ত হল না। ঘরে ঢুকে দেয়াল থেকে নিজের ছবিটা টেনে নামালেন। প্রয়াগসঙ্গীত সম্মেলনে গান গাইবার সময় ছবিটা তোলা হয়েছিল। সুন্দর ছবি। শঙ্কর তখন খ্যাতির তুঙ্গে। ভারত জুড়ে সমালোচকরা তখন বাহবা, বাহবা করছেন। সেই বাঁধানো ছবিটা শঙ্কর দোতলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন একতলায়। কাঁচ চুরমার হয়ে যাবার শব্দ হল।

সুধা ছুটে এলেন। মেয়ে দুটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে কিছু দূরে। বাবা যখন এইরকম মূর্তি ধরেন, তখন তারা ভয় পায় কাছে আসতে। শঙ্করের সারা শরীর কাঁপছে। সুধা স্বামীকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে খুবই নরম গলায় বললেন, 'ছি ছি, এসব কি হচ্ছে?'

এই 'ছি ছি' শব্দে আগুনে যেন ঘি পড়ল। সুধার শরীরে শঙ্করের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা। প্রায় সমান লম্বা। শঙ্কর সেই তুলনায় ছিপছিপে। গত কয়েক বছরে শরীর অনেক ঝরে গেছে; কিন্তু রেগে গেলে শঙ্কর একেবারে বাঘের মতো হয়ে যায়। এক ঝটকায় শঙ্কর সুধাকে ঝেড়ে ফেলে দিল। মেয়ে দুটো ভয়ে আরও দূরে সরে গেল। আর নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, 'ও বাবা, কি হবে।'

শঙ্কর সুধার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ছি ছি। আমি ছি ছি, না তোমার ছেলে ছি ছি। তোমার আস্কারা, তোমার আদরে সে বাঁদরেরও বাঁদর। বংশের মুখে চুনকালি মাখাতে বসেছে। প্রতিভা, প্রতিভা, বিরাট প্রতিভা, ক্ষণজন্মা। একশো বছরের মধ্যে এমন প্রতিভা আসেনি, আসবে না। গন্ধর্ব, গন্ধর্ব, গন্ধর্ব।' বারান্দায় কতকগুলো অর্কিডের টব ঝুলছিল পাশাপাশি। হাতের এক ঝটকায় সব কটা খুলে

পড়ে গেল। একটা পড়ল শঙ্করেব পায়ে। বেশ লেগেছে। ভাঙচুরের শব্দ শুনে ওপরে উঠে এসেছেন শঙ্কবের বাবা। অনেক যত্নে একটি একটি করে ইট গেঁথে তৈরি এই বাড়ি। নিজে ছাতা মাথায় সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রিদের কাজেব তদারকি করতেন। এখনও কোথাও একটু পলেস্তারা খসে গেলে, সেই জায়গায় পানে খাবার চুন টিপে টিপে দেন। জানেন থাকবে না, তবু সৌন্দর্যটা যেন নষ্ট না হয়।

সুধা এইবার বেশ একটু চড়া গলায় বললেন, 'আশ্চর্য তো! এমন ভাঙচুরের অভ্যাস তো আগে ছিল না? কি তোমার হয়েছে বলবে তো! কিছু বলবেও না, গুমরে গুমরে থাকবে শুধু।'

শঙ্করের বাবা বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, 'একজন শিক্ষিত, শিল্পী মানুষ যদি এইরকম করে, তাহলে খুবই লজ্জার, খুবই লজ্জার। শান্ত হও, সংযত হও। তোমার ছেলে এমন একটা কিছু অমানুষ হয়ে যায়নি। আর সব ভেঙে ফেললেই কি সে রাতারাতি দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়ে যাবে?'

শঙ্কর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনাদের আদরে আজ সে কি হয়েছে জানেন, চরিত্রহীন, লম্পট। সে ওই সুরজিৎ দাসের মেয়েটার পাল্লায় পড়েছে। লোকটার এত বড় অডাসিটি, বলে কি না, আপনারা তো রাস্তায় ফেলেই দিয়েছেন, আমি এইবার ঘরজামাই করে তুলে নি। লোকটা আমাকে তুমি তুমি করে কথা বলে গেল। বলে গেল রূপালির সঙ্গে মানস প্রেম করছে। ভাবতে পারেন কত বড় ব্যভিচার! একটা ছাত্র সে লেখাপড়া ছেড়ে নারীসঙ্গ করছে। তার গুরু এখন বল্টু গুণ্ডা। সে আমাদের ঘরানা ছেড়ে বোম্বাই ঘরানার তালিম নিচ্ছে চিপ ফিল্ম-মিউজিক ডিরেক্টরদের কাছে। আমাকে না জানিয়ে সে রেডিওয় অডিশান দিয়ে এসেছে। সে এমন এমন কাজ করে চলেছে যাতে আমার মুখ পোড়ে। এইবার আমাকে ছেড়ে সে ওই অশিক্ষিত, আনকালচারড সুরজিৎ দাসটাকে বাবা বলবে, প্রণাম করবে! তার ওই ঝি-টাইপের বউটাকে মা বলবে! হয় আমি মরবো, না হয় ও মরবে। হয় আমি থাকবো, না হয় ও থাকবে! চেহারা দেখে মনে হয় মদ ধরে ফেলেছে। বল্টু যার স্যাঙাত, সে মদ না ধরে পারে।'

বৃদ্ধ বহুকাল বোধহয় এমন উদাত্ত হাসেননি। জীবনের শেষবেলায় সংসারটা ব্লটিং পেপারের মতো হয়ে যায়। সব রসকষ শুষে নেয়। বৃদ্ধের সেই হাসিতে পরিবারের সকলে যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন ভয়ে। পাগল হয়ে গেলেন না তো! সুধার মনে হল, কি অকারণ অশান্তি! মানুষে মানুষে কি এতটুকু সদ্ভাব থাকতে নেই। এ যেন একই তাঁবুর ভেতর বাঘে বাঘে লড়াই। ছেলেটা কি খেল, কোথায় গেল, সে নিয়ে কারোর চিন্তা নেই। বাঁচলো, কি মরলো!

বৃদ্ধ হাসি সংযত করে বললেন, 'এই বয়সে তুমি কি কি করেছিলে স্মরণে আছে কি? না, বর্তমান তোমার অতীত ভুলিয়ে দিয়েছে! গ্র্যাজুয়েট হবার আগেই কেন আমি তোমার বিয়ে দিয়েছিলুম, মনে আছে কি? মনে পড়ে, তোমার নিজের

আড্ডা আর কাপ্তেনির কথা! তোমার চারপাশে এখনও অনেকে ঘোরে, যারা পাঁড় মাতাল। তোমার এই ওপরের ঘরের মজলিশ, সময় সময় কতটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠত খেয়াল করেছ কি? শিল্পীদের এইটাই না কি ধরন! শঙ্কর তুমিই আমাকে বলেছিলে। তুমিই জনান্তিকে আমাকে বলেছিলে, ওল্ড ফুল। তোমার ছেলে তোমারই পথে চলেছে। ছেলের ধরন পাল্টায়নি পাল্টেছে বাপের ধরন। আমিও বাবা, তুমি বাবা। আমি ছেলেকে ধরেছিলুম, তুমি ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছ।'

বৃদ্ধের খড়মের আওয়াজ ধীরে ধীরে নেমে গেল নিচের দিকে। সেখানে চল্লিশ শক্তির একটা বাতি জ্বলছে মিটিমিটি। নোনাধরা দেয়ালে রহস্যময় সব দেবদেবীর চিত্রপট। কোণের দিকে খাড়া করা বিশাল এক ত্রিশূল। তার ছায়া দেয়ালে। গোটাগোটা রুদ্রাক্ষের বিশাল একটা মালা এক দেয়ালে ঝুলছে। কুলঙ্গিতে প্রাচীন কালের কিছু পুঁথি। কাঠের একটা চৌকির ওপর কম্বল পাতা বিছানা। পুঁটলির মতো একটা বালিশ। এই হল বৃদ্ধের সাধনপীঠ। মাঝে মাঝে বাগান থেকে ছুঁচো এসে ঢুকে পড়ে ঘরে। ব্যাং লাফায়। বর্ষাকালে জানলা দিয়ে সাপ দোল খায়। এই হল সংসার-জাহাজের কাপ্তেনের কেবিন।

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল। শঙ্কর ঢুকে গেলেন ঘরে। একটা মানুষের জীবন ঘাঁটলে কিছু না কিছু ময়লা বেরোবেই। একেবারে টলটলে ফটকিরি দেওয়া জলের মতো কাঁচ-স্বচ্ছ জীবন বোধহয় হয় না। কিছু ভুল, কিছু ঠিক এই দিয়েই মালা গাঁথা। উঠতি বয়সটা বড় সাংঘাতিক, কিন্তু ছেলেকে তিনি কাছে টানতে পারবেন না। একটা বাধা তৈরি হয়েছে মনে চিরকালের মতো। মানস এক প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক জায়গাতেই শুনেছেন, ছেলে বাপকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মানসের আবার শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ নেই। শঙ্করের শত্রুপক্ষীয়দের সঙ্গে তার আবার বেশি খাতির।

সুরজিৎ বাড়ি ফিরে মেয়েকে বললেন, 'তোমার কথা আমি রেখেছি। আধুনিক বাবার যেমন হওয়া উচিত। শঙ্করবাবু বললেন, ছেলেকে ক্যাঁত করে একটা লাথি মেরে দূর করে দেবেন। এরপর তো তোমার আর কোনও আপত্তি থাকা উচিত নয়। আমি আমার পছন্দমতো তোমার বিয়ে দোবো।'

রূপালি বললে, 'আমি এখন বিয়ে করব না।'

'কি করবে? বাউণ্ডুলেটার পিছনে দৌড়াবে?'

'দেখতেই পাবে।'

'তোকে ভূতে ধরেছে। তুই যে-ভাবে মানুষ হয়েছিস, তাতে বস্তিতে গিয়ে বাস করতে পারবি?'

'মানুষ কি পারে আর কি পারে না, আগে থেকেই বলা যায় না বাবা।'

'প্রেম! প্রেমে কি আছে রে! ন্যাকামি। ফ্যাশান। রোগ। মনের অসুখ। মানসকে ভেবেছিলুম একটা ইনভেস্টমেন্ট। আমার টাকার সঙ্গে কালচারের বিয়ে। নাম ও করবেই। সেই নামটা আমি ভাঙাতুম। শিক্ষা আর সংস্কৃতি—এই দুটোতে তো আমি

শূন্য। তা ছাড়া ব্রাহ্মণদের ওপর আমার অনেক কালের রাগ। মুকুজ্যেমশাই আমাকে কখনো এক সারিতে বসে খেতে দেননি। ভেবেছিলুম তোকে দিয়ে গোঁড়াদের গোঁড়ামি ভাঙবো। দাস থেকে মুকুজ্যে। তা বাড়ি থেকে দূর করে দিলে সে আর কি করে হবে!'

সুরজিতের স্ত্রী পান চিবোতে চিবোতে বললেন, 'ওটা একটা পাত্র হল? তিন লাখ টাকায় অনেক ভাল ছেলে পাওয়া যায়।'

॥ ৩ ॥

মামার বাড়িতে বেশ একটু বেলাতেই মানসের ঘুম ভাঙল। তাও ভাঙত না, যদি না মাসি এসে চুল ধরে টানত! মানস চোখ মেলেই মাসির মুখ দেখতে পেল। মাথার গোলমাল হলে কি হবে, চেহারাটা ভারি সুন্দর! গোল মুখ। ছোট্ট কপাল। কপালের মাঝখানে গোল সিঁদুরের টিপ। একমাথা কালো কুচকুচে চুল।

মাসির ডান হাতে একটা চিরুনি। মানস তাকাতেই মাসি নাকে কেঁদে বললে, 'কি হবে বল তো, যেই না চুলে চিরুনি দিচ্ছি, অমনি না ভুসভুস করে চুল উঠে যাচ্ছে। তুই এখনও শুয়ে আছিস! আমার কথাটা একবারও ভাবছিস না। আমাকে যে ওরা আর নেবে না রে!'

মানস উঠে বসল, 'কারা নেবে না?'

'ওই যে রে আমার বরের বাবা আর মা।'

'তোমার চিরুনিতে তো মাত্র তিন চারটে চুল।'

'ওই তো, ওই করেই তো সব যায়! একটু একটু করেই তো যায়। দেখবি আমি একটা গান করবো —একটু একটু করেই হয়, আবার একটু একটু করেই সব যায়। হাহা, হোহো, হিহি।'

মাসির গলাটা কিন্তু খুব সুন্দর। ভোরের ফোটা ফুলের মতো ওই মহিলার দিকে তাকিয়ে মানসের মনে হল, তাদের দুটো পরিবারের ওপরেই কোন একটা অভিশাপ খেলা করছে। ব্রহ্ম শাপ। ওই, একটু একটু করে জাহাজ তলিয়ে যাচ্ছে মাঝদরিয়ায়! অনেক দূর থেকে যেন বাবার গলার সেই গানটা ভেসে এল, বাবারই রচনা—'অনেক কিছু দিয়েছিলি/দিয়েও আবার কেড়ে নিলি/শুধু হার মানলি কাড়তে/আমার দু চোখ ভরা জল॥' মানসের গলা দিয়ে গানটা হঠাৎ বেরিয়ে এল ভোরের সুরে। মানসের মনে হয় কোনও ভাবে যদি ছেলেবেলার দিনগুলো ও আবার ফিরে পেত! বাবার ভালবাসা আর বন্ধুত্ব পেতে তার ভীষণ ইচ্ছে করে। বাবা তাকে ডাকছেন, মানস আয়। ভালবেসে কিছু একটা দিচ্ছেন। বেরিয়ে যা, না বলে, বলছেন, কাছে আয়। সে কি এমন করেছে!

আর একটু বেলা বাড়তেই মানসের মেজ বোন উৎপলা হন্তদন্ত হয়ে এল। বেচারা ঘেমে গেছে। চুল উড়ছে। মুখে না-খাওয়া, না-ঘুমোনোর কালি। মানসকে

একপাশে নিয়ে গিয়ে বললে, 'ভাইদা, তুই এখন ভুলেও বাড়ি যাবি না। গেলেই বাবা তোকে খুন করে ফেলবে।'

'কেন রে! আমি তো আর হারমোনিয়ামে হাত দিইনি। গানও গাইনি!'

'ধ্যুত্, কাল সন্ধেবেলা রূপালির বাবা এসে যা-তা বলে গেছে। রূপালিকে তুই ভালবাসিস?'

'আমি একমাত্র গান ভালবাসি, রূপালি আমার গান ভালবাসে। এ ভালবাসাটা সে ভালবাসা নয়।'

'তোদের ভালবাসাটা কি ভালবাসা, তোরাই জানিস, কিন্তু মেয়েটাকে বিয়ে করতে হবে। কি করে করবি? তোর তো চাকরি নেই, বাকরি নেই, বাবাও তো তাড়িয়ে দেবে, তুই কি করবি ভাইদা?'

'এখন কে বিয়ে করতে যাচ্ছে? বিয়ে করার তো একটা নিয়ম আছে!'

'বড়লোকের মেয়ে, বিয়ে করলেই তুইও বড়লোক।'

'সিনেমা না কি? আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।'

'তুই তাহলে পরিষ্কার বলে দে। বাবা কিন্তু কাল পাগল হয়ে গিয়েছিল। সব ভেঙেচুরে তছনছ করেছে।'

'আমি কেন বলতে যাবো! আমাকে কেউ ভালবাসলে আমার ভীষণ ভাল লাগে।'

'বুঝেছি। জানিস তো একেই বলে প্রেম। ভাইদা তুই কিন্তু আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছিস, আরও যাচ্ছিস।'

'গেছিই তো। আরও যাবো। তোরাই তো আমাকে দূরে ঠেলেছিস। তোরা বাবাকে একদিনও বলেছিস, বাবা তুমি অন্যায় করছ। বলেছিস! তোরা শুধু মজা করে দেখেছিস। কই তোরা তো আমার দিকে আসিসনি। বাবা যেবার জামা জুতো কেড়ে নিয়ে মাঝরাতে রাস্তায় বের করে দিলেন, সেদিন তোমরা কি করেছিলে?'

'বা-রে আমরা কত কেঁদেছিলুম সারা রাত।'

'আর আমি রাত কাটিয়েছিলুম মুদিখানার রকে নেড়িকুকুরের সঙ্গে। ভোরবেলা বাবা আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন, একবারও ফিরে তাকালেন না। আমার মানসম্মান নেই! যত মানসম্মান তোমাদের! তখন আমি কোথায় গেলুম! ওই রূপালি তিন দিন আমাকে রেখেছিল।'

'বাবাকে আমরা ভীষণ ভয় পাই।'

'তাই পা! আমার কথা ভেবে আর কি হবে!'

'জানিস তো খুব অশান্তি হলে বাবার খুব লেখার মুড আসে। তখনই ভাল ভাল গান লেখেন, ভাল সুর দেন।'

'তার মানে আমরা বলির পাঁঠা। বাবা তোদের ডেকে ডেকে গান শোনান, গান তোলান, তোদের নিয়ে বেড়াতে বেরোন। তোদের বেলায় যত আদর, আমার বেলায়

যত ধোলাই! কেন রে!'

'আমরা যে মেয়ে, পরের বাড়ি চলে যাব। আর গান তো শিখতেই হবে। বিয়ে-পরীক্ষার একটা পেপারই তো গান।'

'একটু আগেই মনটা ভীষণ খারাপ হচ্ছিল। ভাবছিলুম, বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবো। তোর কথায় মনটা ঘুরে গেল। আমি শিল্পী হয়ে মাকে দেখিয়ে দেব শিল্পী হওয়া যায় কি না! লোকে বাবার নাম ভুলে যাবে, আমার নাম মনে রাখবে। আমি অনেক কষ্ট করে বাবাকে ঘৃণা করতে শিখবো। আর সেই ঘৃণাই হবে আমার বারুদ। ঘৃণা করার মতো দু-দুটো ঘটনা আমার কানে এসেছে। সেইগুলোকেই আমি নাড়াচাড়া করে যাবো। মায়ের কাছে শুনে নিস, আমি মরতে মরতে বেঁচেছি, এইবার আমি বাঁচতে বাঁচতে মরবো। রাজার মতো বাঁচবো।'

'তুই কি জানিস, কাল সকালে আমরা সবাই টাটানগর চলে যাচ্ছি, তুই এখন কি করবি?'

'কেন তোরা আমাকে বলতে পারছিস না, ভাইদা, তুইও চল।'

'বা, রে! আমরা বলার কে?'

'মা কি মরে গেছে!'

'মা বাবাব মন বুঝে চলতে চায়।'

'আচ্ছা! আমার জন্যে তোদের আর ভাবতে হবে না। আমার ভাবনা আমি ভেবে নোবো।'

'তুই আর পড়বি না?'

'টিয়াপাখির মতো একই কথা কপচাস না। আমি কি করব, আমি তা জানি।'

'জানিস তো বল্টুদাকে কাল অনেক রাতে পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।'

'কেন?'

'সবাই বলছে খুনের মামলা।'

'ও ছাড়া পেয়ে যাবে।'

মানসের মায়ের একটা একটা করে প্রায় সব গয়নাই চলে গেছে। গানের রোজগারে সংসার আর চলে না। মাঝে মধ্যে গয়না বেচতে হয়। কিছু আগে মাসিমার গাওয়া সেই গানের মতো একটু একটু করেই যায়। সুধা মানসকে একদিন বলেছিলেন, 'হাত আর গলা একেবারেই খালি হয়ে গেল, হাতে কিছু জমেও না যে এক সেট নকল সোনার গয়না কিনবো।' মায়ের এই ক্ষোভ মানসের মনে খুব ধাক্কা মেরেছিল। মানসের পকেটে এখন করকরে তিনশো টাকা। মানস উৎপলাকে নিয়ে বেরিয়ে এল। মায়ের জন্যে গয়না কিনবে।

বৌবাজারে দোকান ঘুরে ঘুরে মানস হার, চুরি আর একজোড়া দুল কিনল। বোনের হাতে দিয়ে বললে, 'মাকে বলিস, এখন নকল সোনাতেই কাজ চালাতে

আর পাঁচটা বছর পরেই আসল সোনা হবে।'

'কি করে হবে?'

'হবে তুই দেখে নিস।'

'এই টাকা তুই কোথায় পেলি?'

'চুরি করিনি। সৎ পথের রোজগার।'

উৎপলাকে বাসে তুলে দিল মানস। ওঠার আগে উৎপলা বললে, 'আবার কবে দেখা হবে?'

'কোনও দিন হবে। কবে তা জানি না।'

'কোথায় থাকবি?'

'জানি না রে, এত বড় দেশ, কোথাও একটা জায়গা হবেই।'

'সাবধানে থাকিস কিন্তু।'

বাস চলে গেল। মানস ভাবতে লাগল, পকেটে কয়েকটা মাত্র টাকা আছে, কাল তবু গুরদোয়ারা ছিল আজ কি হবে! বল্টুদা হাজতে। যাবার অনেক জায়গা আছে; কিন্তু রোজগার। একটা টিকিটের দাম তাকে তুলতে হবে। এক পিঠের ভাড়া। তারপর দেখা যাবে!

ছানাপটির সামনে দাঁড়িয়ে মানস মনে-মনে একটা পরিকল্পনা ছকে নিল। টালিগঞ্জে বেশ একটা বড় মন্দির আছে। রোজই সেখানে একটা না একটা কিছু হয়! সেবায়েত পূর্ণবাবু মানসকে ভীষণ ভালবাসেন। জায়গাটা খুব সুন্দর। একবার গিয়ে দেখলে হয়। মানস বারোটার মধ্যেই পৌঁছে গেল। গিয়েই বুঝল, ঠিক দিনেই এসে পড়েছে। মানস আজকাল, বুড়োদার কথা সময় সময় ব্যবহার করে, যেমন, বেটি ঠিক দিনেই টেনে এনেছে। মন্দিরের আজ প্রতিষ্ঠাদিবস। ফুল, মালা, ধূপ, ধুনো, সংগীত, ভক্তসমাবেশ, যেন আর এক জগৎ। মানস একটু আগে ছিল কোথায়, আর এখন কোথায়!

পূর্ণ ভট্টাচার্য, মানসকে দেখেই বললেন, 'বিশ্বাস করবে কি না জানি না, মনে মনে আমি তোমাকেই ডাকছিলুম। আমার মানস কোথায়? আমার মানস কোথায়?'

'আর বৌবাজারের ছানাপট্টিতে দাঁড়িয়ে আমি সেই ডাক শুনতে পেলুম।'

'তাহলে জমিয়ে দাও। তোমাকে আমি একটা ধুতি আর চাদর উপহার দোব। সেইটা পরেই বোসো। আগে চান করে নাও!'

মানসের এই শুদ্ধাচার ঠিক আসে না, তবু সাধুসজ্জনের আদেশ। মনটা তার একেবারে ফাঁকা। একলা হলেই কেমন যেন লাগছে। মন্দিরের পেছনে বাগান, কলাঝাড়, একটা বাঁশ ঝাড়। ম্যাটম্যাটে রোদ। পাঁচিলের ওপারে ধুধু মাঠ। টিন দিয়ে ঘেরা বাথরুমে দাঁড়িয়ে গায়ে জল ঢালতে ঢালতে মানসের কত কথাই মনে পড়ছে। পিতা শঙ্করের রমরমা অবস্থা সে দেখেছে। অল্প কিছুদিন। তিনি উঠলেন, তিনি ধপাস করে পড়ে গেলেন। কেন পড়লেন, কিভাবে পড়লেন মানস ঠিক জানে

না। লোকে বলে, মেজাজ ও দুর্ব্যবহার। গুণী বলে, তুমি যাই করো মানুষ তোমায় পুজো করবে, সে যুগ আর নেই। এখন ইট ছুঁড়লেই পাটকেল খেতে হবে। যত অভাব বাড়ছে ততই দুর্ভাব চড়ছে! মেজাজ সবসময় সপ্তমে। সব গানেই কান্না। মানুষ একটু আনন্দ চায়। নিজের দুঃখ সকলের উপর চারিয়ে দিতে চাইলে হয়! শুধু নিরাশার কথা মানুষ শুনবে কেন। নিরাশার ওপর আশাকে দাঁড় করাতে হবে। দুঃখকেই করে তুলতে হবে আনন্দ! তবে বাবার ওই বিদ্রোহের গানগুলো ভারি সুন্দর—'বহুদিন হতে মোরা উপবাসী/দেখ্ মা তবুও মুখে আছে হাসি/(তোর) অভয় বাণীতে আর ভুলিব না/তোরে ভাল করে চিনি না॥/ সংসারটা তাহলে একেবারেই ভেঙে গেল। ভাঙুক। কুছ পরোয়া নেহি।

নাটমন্দিরে তখন গান চলেছে। মানস এসে বসল, রাজবেশ করে। শুরু হয়ে গেল গান। 'একটি অসুর নিধন করে মা/কত না দর্প হয়েছে তোর/মহিষাসুরের মৃত্যুর পরে বহু বহু যুগ কেটেছে/এরই মাঝেতে লক্ষ অসুর/তোরই সৃষ্টি ভেঙে করে চুর॥' বেলা তিনটে অবধি মানস একটানা গান গেয়ে গেল। সকলেই ধন্য ধন্য করছেন। ওইখানেই ছ' জায়গায় গান গাইবার বায়না হয়ে গেল। পূর্ণবাবু এসে মানসকে জড়িয়ে ধরলেন, 'তুই সিদ্ধিলাভ করেছিস মানস। তোর পিতামহ প্রায়ই আসেন এখানে, এসে মায়ের সামনে বসে কেবল তোদেরই মঙ্গলকামনা করেন। পেছনের ওই গোটা জমিটা মায়ের সেবার জন্যে দান করেছেন। আমাকে বলেছেন, পূর্ণ. আমার জন্যে একটা চালা তৈরি করে রেখো, আমি এই এলুম বলে। হ্যাঁ রে, ছেলের সঙ্গে বনছে না বুঝি?'

মানস কথা ঘুরিয়ে নিল। সামনে বিশাল এক থালায় অনেক প্রণামী পড়েছে। পূর্ণবাবু বললেন, 'ওগুলো সব তোমার।'

অন্য সময় হলে, মানস সব দান করে দিত; যতই হোক, আর একটা শঙ্করই তো বসে আছে ভেতরে, নির্লোভি, বেহিসেবী, অভিমানী, কল্পনাবিলাসী এক রাজা। আজ আর সে পারল না। এক পিঠের রেলভাড়া মায়ের কৃপায় যোগাড় হয়ে গেছে। এ বেশ ভাল। তাদের সংসারের ধারাটা সত্যিই বেশ সুন্দর হয়েছে। বুড়োদা বলেন, পাখির সংসার। কোথাও কোনও সঞ্চয় নেই। কোনও ভবিষ্যৎ নেই। বাঁধন নেই। এ যেন, শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস, কখন কি যে ঘটে ভেবে হই মা সারা। মানস ভাবলে, আমাদের আজ আছে কাল নেই। কাল কি হবে আমাদের পরিবারের কেউই জানে না।

মানস বললে, 'আজ আমি এখানেই থাকবো।'

পূর্ণবাবু বললেন, 'একদিন কেন? তুমি এক মাস থাকো। তুমি থাকলে বেশ জমে যায়। গানে-গল্পে। রাতে তোমাকে আমি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি খাওয়াবো, সঙ্গে ছোলার ডাল।'

দুটোই মানসের ভীষণ প্রিয়। পিতামহের উত্তরাধিকার। বৃদ্ধেরও এই দুটি জিনিস ভীষণ প্রিয়, সঙ্গে একটু মোহনভোগ থাকলে তো আর কথাই নেই, ষোলকলা পূর্ণ।

মানস একটা কাপড়কাচা সাবান কিনে নিয়ে এল। এখনও বেলা আছে। বসে গেল টিউবওয়েলের তলায়। ট্রাউজার, জামা, গেঞ্জি। এক মহিলা হাত ধুতে এসে বললেন, 'এ কি শিল্পী মানুষের একি অবস্থা। আমি কেচে দিচ্ছি। সাধারণ মানুষ এই শিল্পী শব্দটা কেমন সহজে ব্যবহার করে। মানসের হাসি পায়! কবি, শিল্পী, ওস্তাদ। বোকা বোকা শব্দ। মহিলা বললেন ; কিন্তু কিছু করলেন না। হাত ধুয়ে চলে গেলেন।

কোথা থেকে ফ্রক পরা একটা মেয়ে এসে মানসকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ধুপধাপ কাচতে বসে গেল।

মানস বললে, 'এ কি রে বাবা?'

মেয়েটা বললে, 'হ্যাঁ রে বাবা। তোমার জন্যে আমি মায়ের কাছে বকুনি খেলুম। সবেতেই পাকামো।'

'এক পেট খিচুড়ি খেয়ে অমনি কাচতে বসে গেলেন। দেখানো হচ্ছে, আমি শুধু ভাল গাইতেই পারি না কাচতেও পারি।'

'তুমি কে গা?' মানসের সন্দেহ হচ্ছিল, মা একবার রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই মা আর একবার এলেন না তো লীলা করতে! বড় বড় চোখ। কালো কুচকুচে চুল। লালচে সাদা গায়ের রঙ। শাসন করে করে কথা; যেন কতকালের চেনা।

মানস বললে, 'দেখাতে যাবো কেন? তোমাকে আমি চিনি না কি?'

মেয়েটা বললে, 'ও মা, সে কি গো! তোমাকে যে আমি এই একটু আগে পরিবেশন করে খাওয়ালুম গো। এরই মধ্যে ভুলে গেলে! আমি তো পূর্ণবাবুর ভাগনী!'

'ও মা, তাইতো। আমি একটা মাথামোটা।'

'তা হতে পারে জানো! গাইয়েরা ভীষণ বোকা হয়।'

'কেন বলো তো?'

'তা না হলে, তারা তো সব হেডমাস্টার হয়ে যেত!'

'তুমি কোথায় থাকো?'

'খুব ভালো জায়গায়। নাম শুনলে অজ্ঞান হয়ে যাবে। গোবরডাঙায় থাকি গো আমি, গোবরডাঙায়। তুমি আমাকে একটু গান শেখাও না গো। তোমার গানগুলো বেশ ভাল। খুব সুর। ওই যে ওই গানটা—'জীবন বীণার তারে বাজে শুধু বারে বারে, বিদায় বেলার শেষ রাগিণী / বিদায়ের আগে তাই শুধু তোরে বলে যাই/তোর মত কারেও আমি এত ভালবাসিনি/এত ভালবাসি তাই এত বেশি ব্যথা পাই॥' আঃ, খুব সুন্দর গান।'

'কথাগুলো তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে? আশ্চর্য।'

'কি জানো, কোনও কিছু ভালো লাগলে আমার চিরকাল মনে থাকে। এই তো

তোমাকে আমার ভালো লেগে গেছে তো. তোমাকে আমি কোনও দিন ভুলবো না। তোমার ওই গণ্ডারের মতো নাক, পাগলা পাগলা চোখ। তুমি জানতেও পারবে না. তোমাকে একজন মনে রেখেছে।'

'তার মানে আমাকে বিচ্ছিরি দেখতে!'

'ও মা, তাই বললুম বুঝি! তোমাকে বেশ একটা নায়ক-নায়ক দেখতে। এই একটা গায়ে সিল্কের চাদর দিয়ে. চোখ দুটো উল্টে উল্টে যখন গাইছিলে. মনে হচ্ছিল নিতাই আমার। দেখো তো সুরটা ঠিক হচ্ছে কি না?'

'তোমার নামটা একবার বলো না গা।'

'ওমা! আমার নাম তো মহুয়া। তুমি তো খেতে বসে আমাকে ডাকছিলে। আমার মা মামাকে কি বলছিল জানো তো. তোমাকে নাকি জামাই করবে।'

মহুয়া খিল খিল হেসে ওপর-হাত দিয়ে কপালের চুল সরালো। বাতাসে সাবানের ফেনা উড়ছে। চুলগুলো খুব বিরক্ত করছে। মহুয়া বললে, 'একটা কাজ তুমি পারবে! পেছন দিকে এসে আমার চুলগুলো টেনে একটা খোঁপা করে দিতে পারবে?'

'ওঃ, এই কাজ! এ তো খুব সহজ। টেনে ধরবো, ধরে একটা গোলমতো করে দোব।'

মানস মহুয়ার পেছন দিকে গেল। পিঠে ছড়িয়ে আছে এক রাশ কালো চুল। ফুলছাপ ফ্রকের ওপর। পিঠের হুক তিনটে টান হয়ে আছে। ভেতরের জামার সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছে। মানসের মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। কত ছোট ছোট জিনিসে, কত ভাল লাগা থাকে। একটু ইতস্তত করে মানস সমস্ত ছড়ানো চুল এক জায়গায় করে যেই টেনেছে, উবু হয়ে বসে থাকা মহুয়া পেছন দিকে উল্টে পড়ল মানসের পায়ে। পা দুটো ছড়িয়ে গেল সামনে সাবানের ফেনায়। গোল নিটোল দুটি পা। ভরাট গোড়ালি। পায়ে আবার এক হারা দুটো নূপুর।

মহুয়া তো হেসেই খুন। 'একটা ছোট্ট কাজও যদি তোমাকে দিয়ে হয়! এমন টান মারলে উল্টেই পড়ে গেলুম। ও মা, আমার জামাটামা সব ভিজে গেল।' দমকা বাতাসে ফ্রকটা পায়ের দিক থেকে উল্টে গেল। মহুয়া বলল, 'ভীষণ অসভ্য।'

'কে অসভ্য!'

'ওই যে মুখপোড়া হাওয়া। দেখো না সব উড়িয়ে দিচ্ছে। আমার লজ্জাশরম নেই বুঝি। দাও, আমাকে আবার আগের মতো করে দাও! জামাটা গেছে তো!'

'একটু গেছে।'

'একটা কাজও যদি ভালভাবে শান্তিতে করা যায়!'

মানস মহুয়ার বগলের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে তুলে বসাতে গেল। মহুয়া যে একটা বাড়ন্ত মেয়ে সে খেয়াল নেই। মহুয়ার ভীষণ সুড়সুড়ি লেগেছে। সে কুঁকড়েমুঁকড়ে এবারে পাশে উল্টে পড়ল। মানস বললে, 'আশ্চর্য তো! তুমি তো

কেটলি নও যে হাতল ধরে তুলবো! তোমাকে তুলতে হলে তো আমাকে ওই ভাবেই তুলতে হবে।'

মহুয়া বেদম হাসছে। একটা হাত ভাঁজ করে মুখ চাপা দিয়েছে। সমস্ত চুল ছড়িয়ে গেছে মাটিতে। হাসি আর থামে না। 'তুমি তো আমাকে কলসির মতো করে তুললেই পারতে!'

'এখন তাহলে বেডিং-এর মতো করে তুলি!'

মহুয়া আবার হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে নিজেই উঠে বসল।

সন্ধেবেলা মহুয়া আলু ভাজার আলু কাটতে কাটতে মানসকে বললে, 'শোনো তো, সুরটা ঠিক হচ্ছে কি না। 'জীবন বীণার তারে বাজে শুধু বারে বারে বিদায় বেলার শেষ রাগিণী' ...।

মানসকে অবাক করে দিয়ে মহুয়া গোটা গানটা ঠিক ঠিক গেয়ে গেল। পুরো গানটাই প্রায় তারসপ্তকে খেলা করেছে। মহুয়ার গলা যেন সাধা বাঁশির মতো। কেউ সাংঘাতিক ভালো একটা কিছু করে ফেললে মানসের চোখে জল এসে যায়। মানস বলল, 'আলুফালু রাখো। হারমোনিয়ামে বসবে চলো।'

মন্দিরে মহাসমারোহে আরতি লেগেছে। ঘণ্টা, কাঁসর বাজছে। বাইরের দাওয়ায় মানসের ট্রাউজার আর জামা দোল খাচ্ছে বাতাসে। রান্নাঘরে মহুয়ার মা ভোগ রাঁধছেন। মানস হারমোনিয়াম টিপে মহুয়াকে বললে, 'গলা মেলাও।'

মেলাবে কি। মিলেই আছে। যেন কতকালের সাধা। মানসের মনে হল তার সামনে আর এক মানস বসে আছে। পবিত্র। সাদা ধপধপে একটা মোমবাতির মতো। মানস বললে এসো, দু'জনে মিলে গাই—দেবী সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবন-তারিণী তরলতরঙ্গে। মানস সাদামাটা সুরে গাইল না। পটবর্ধন সায়েব যে-ভাবে গাইতেন, যে-সুরে, যে-কায়দায় ঠিক সেইভাবে। মানসেব মনে হল, মেয়েটা সুরের ফোয়ারা। একটু উস্কে দিলেই হল।

গান শেষ হতেই মহুয়া বললে, 'তুমি তাহলে আমার গুরু হলে। প্রণাম করি!'

মানস বললে, 'কে কার গুরু! আমার তো মনে হচ্ছে, তুমিই আমার গুরু হবে।'

মহুয়া মানসকে কটাস করে একটা চিমটি কেটে বললে, 'বেশি বেশি।'

'গুরুকে চিমটি কাটা?'

'তুমি আবার দয়া করে মাকে বলে দিও না যেন।'

'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে মহুয়া?'

'কবির মতো। মাইরি বলছি।'

আধ হাত জিব কাটলো মহুয়া।

'কি হলো?'

'মাইরি বলে ফেলেছি। আমার বাবা বলেন, তোর কি হবে মহুয়া, আমার মতো

পণ্ডিতের মেয়ে হয়ে তুই মাইরি মাইরি করিস? কি জানো তো, এটা আমি মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। যাক গে, যা হবার তা হবে। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো না, আমাদের ওখানে। আমার তাহলে খুব গর্ব হবে।'

'গর্ব হবে কেন?'

'সে হবে।'

'তোমাদের ঠিকানাটা আমাকে দাও।'

অনেক রাতে মানস উঠোনের চৌকিতে বসে আছে। গাছের পাতায় পাতায় তেলেভাজার শব্দ। দূরে অন্ধকার মন্দিরের চূড়া তারা খুঁজছে। মানস বসে আছে। এমনিই তার ঘুম কম। আজ আবার মনে চিন্তার ছবি উতলাচ্ছে। বহু মেয়ের সঙ্গে সে মিশেছে, কিন্তু কোনও মেয়ের কথা সে রাতে ভাবে না। কোনও সময়েই ভাবে না। ওই যতক্ষণ দেখা, ততক্ষণই। মহুয়া কিন্তু মানসকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। মেয়েটা তার মন থেকে বেবোতে চাইছে না।

অন্ধকারে কিন্‌কিন্ করে শব্দ হল। মানসের পিঠের ওপর একটা হাত পড়ল। 'কি গো কবি তুমি আজ ঘুমোবে না?'

'আমার ঘুম আসতে বেশ রাত হয়।'

'ক'টা বেজেছে জানো? বারোটা।'

'তুমি শোবে না?'

'শোবো, এই তো সবে সারা হল সব।'

মহুয়া মানসের মাথার চুল খাবলাখাবলি করে দিল। মাথা ঘষল মানসের পিঠে। কানের কাছে ভিজে ভিজে ঠোঁট ঠেকিয়ে বললে, ফিসফিস করে, 'তোমাকে আমি কিন্তু ভালবেসে ফেলেছি।' বলেই মহুয়া দুদ্দাড় দৌড়লো। অন্ধকারে একটা কুকুর শুয়েছিল, বার কয়েক ধমকে উঠল। জোরে একটা বাতাস বয়ে গেল যেন কোথাও তাদের ভীষণ কাজ আছে।

মানস খুব ভোরেই বেরিয়ে গেল। প্রথম বাস ধরেই চলে গেল হাওড়া স্টেশানে। প্ল্যাটফর্ম জমজমাট। ভোরের ট্রেন সব ছাড়বে। আসানসোল, ধানবাদ, টাটানগর। একটু পরেই সব ছাড়বে। মানস মাঝেমাঝে নিজেকে হারিয়ে দিচ্ছে ভিড়ে । টাটা ছাড়বে তিন নম্বর থেকে। মানস হুইলারের বই-এর গাড়ির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখল। ঢোকার গেটের দিকে তার চোখ। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আসছেন সব। বোন দুটোকে খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে, পাঞ্জাবি মেয়েদের মতো। বাবাকে দেখাচ্ছে সরল একটা বেতের মতো। কি সুন্দর দেখতে ভদ্রলোককে! দুধের মতো ফর্সা। আর্য ঋষিদের মতো নাক। রিমলেস চমশা। নিখুঁত, পরিপাটি বেশবাস। মাকে ভীষণ ভীতু ভীতু আর বোকা বোকা দেখাচ্ছে। ভীষণ যেন দুর্বল। বাবার ধবধবে সাদা পায়ে কালো স্ট্র্যাপ দেওয়া চটি। পা দুটোর কি সুন্দর গড়ন। পাতলা আমসত্ত্বের মতো। বড় বড় চোখ দুটো যেন ঝলসাচ্ছে। মানসের মনে হল,

সংসারের বাইরে এলে বাবাকে যেন হাজার গুণ সুন্দর দেখায়। কি অভিজাত চেহারা। সংসার বাবার স্থান নয়। সংসারে বাবা নিজেকে নষ্ট করছেন। অকারণ রাগ, ঝগড়া, কথা বন্ধ, খাওয়া বন্ধ। মানস জানে, বাইরে যাঁকে এত কঠিন কঠোর মনে হচ্ছে, ভেতরটা তাঁর ভীষণ কোমল। ভেতরে শুধু জল—যা গান হয়ে সুর হয়ে বেরিয়ে আসে। বন্দী মানুষের আর্তনাদ। কুলিরা আগে আগে ছুটছে। একজনের মাথায় সেই বিখ্যাত হারমোনিয়ামের বাকসো। বাবা তাকে কেবলই সাবধান করছেন।

মানসের একবার মনে হল, হঠাৎ গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। ওই পা দুটো ধরে বলে, আমগাছে আমই হয়, জাম হয় না। পারলো না। অহংকারীর বংশের ছেলে, অহংকারটাকে ফেলবে কোথায়! চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনটা চলে গেল। প্ল্যাটফর্ম খালি। যে কুলি দু'জন মাল বয়ে এনেছিল, তারা এখন আয়েস করে খইনি দলছে।

মানস একটা ফোন করল। শেষ মুদ্রাটা ফেলে বোতাম টিপতেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল। হিসেব মিলেছে। রূপালিই ধরেছে।

'আমি মানস।'

'ওমা! কোথা থেকে বলছ তুমি?'

'হাওড়া স্টেশান।'

'ওখানে কি করছ? এত সকালে?'

'শোনো, আমি বোম্বাই যাচ্ছি। তুমি পালাবে আমার সঙ্গে?'

'ওমা সে কি? পালাবো কেন। খারাপ ছেলেমেয়েরাই তো বোম্বাই পালায়। তারপর পুলিস তাদের ধরে। তুমি শুধু শুধু বোকার মতো বোম্বাই যাচ্ছ কেন? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?'

'না, পুরোপুরি সুস্থ। ওখানে আমি কিছু একটা করার ডাক পেয়েছি।'

'কি করার?'

'আমি যা পারি, গান। বিদেশেও যেতে পারি দলের সঙ্গে।'

'তুমি বড় হও মানস, খুব বড়, আরও বড়।'

'সে তো হবই, আমার ভেতর বারুদ আছে। তুমি চলে এসো, বোম্বাইতে বিয়ে হবে।'

'যাঃ, তা হয় না কি? বাবা, মা-র অমতে! আমার অত সাহস নেই। তুমি আগে দাঁড়াও তারপর সব হবে। আমি এখন ছাড়ছি। আমার ভয় করছে।'

মানস হেসে ফেলল। আর এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন, তিনি বললেন, 'হাসছেন?'

'এই সকাল আটটায় একজনের ভয় করছে। ভূতের ভয়।'

মানস বোম্বাইয়ের একটা টিকিট কাটল। রিজার্ভেশান নেই। একটা কুলি বললে, 'দশটা টাকা দেবেন, আমি ইয়ার্ড থেকে চেপে আসবো।' ছ'টাকায় রফা হল।

মানসের কোনও ব্যস্ততা নেই। সে জানে, বসতে পাবেই। সবাই ওঠার পর সে যখন উঠলো, এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, 'আইয়ে মানসজী, আইয়ে।' মানসের মনে হল সারা ভারতবর্ষ তাকে ডাকছে, আইয়ে মানসজী, আইয়ে।

একটু আগে শঙ্কর যে-পথে গেছেন, সেই পথেই মানস চলল। সে যাবে অনেকটা দূরে। আর ঠিক সেই সময় এক বৃদ্ধ, দোতলার সার সার ঘরে দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে আপন মনে বলছেন, থিয়েটারে এখন ড্রপসিন পড়ে গেল। এ পালা শেষ। পরের পালার দিনক্ষণ পরে জানান হবে। খড়ম খটখটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখলেন, নারকেল গাছের বেল্লোর খাঁজে ঘুঘুর বাসা হয়েছে। মাথা নাড়লেন, 'তোফা, তোফা! ভিটেয় তাহলে ঘুঘু চরল!'

পাঁচ দিন পরে সুধা একটা চিঠি পেলেন,

"মা, আমি এখন অনেক দূরে, বোম্বাইতে। আমার জন্যে ভেবো না। বেশ আছি আমি। মা, বাবাকে ছেড়ে যতটা ভাল থাকা যায়। বাবাকে বোলো, আমগাছে আমই হয়, জাম হয় না। মানস এমনকিছু করবে না, যাতে তাঁর সম্মানের হানি হয়। বাবা শুধু আমার জন্মদাতা নন, গুরু। নিজে না শেখালেও, আমি শুনে শিখেছি। আমার রক্তে তাঁরই সুর। বাইরের জগৎ বাবাকে অসম্মান করেছে, প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি, আঘাত করেছে, আহত করেছে, আমরা যেন সেই আহত মানুষটিকে আরও আঘাত করে না বসি। আমরা যেন তাঁকে ভালবাসতে পারি। বড় গুণী মানুষ, বড় আদরের মানুষ, বুকে ধরে রাখাব মানুষ। বাবাকে তোমরা ধরে থেকো। দেখো তাঁর গান যেন বন্ধ না হয়। খুব উৎসাহ দেবে, সঙ্গ দেবে, ভেঙে পড়তে দেবে না। বাবাকে বোলো সুরজিৎ দাসের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তার মেয়ের সঙ্গেও নয়। লোকটা ধান্দাবাজ, ধাপ্পাবাজ। কাল সকালে আমি দুবাই যাচ্ছি। কিসে কি হয়, কার কি হয়, বলা যায় না মা। ঈশ্বর আছেন। বাবাকে বোলো, আর কয়েকটা বছর, সংসারের ভাবনা, মেয়ের বিয়ে, কিছুই আর তাঁকে ভাবতে হবে না। মানস আসছে। আমার বারুদ যেন সেঁতিয়ে না যায়! তোমরা প্রণাম নিও—মানস॥"

নারকেল গাছের তলায় বসে বৃদ্ধ একটি ছোট চিঠি পড়ে হেসে উঠলেন—বুড়োদা, তুমি হলে আমাদের বুড়ি। চুপ করে বসে থাকো। আমরা সব চোর চোর খেলতে বেরিয়েছি। দেখি, এবার কে আগে বুড়ি ছুঁতে পারে! প্রণাম নিও।—তোমার খোকা॥

গোবরডাঙায় এক কিশোরী আমবাগানে বসে যে চিঠিটি পড়ল—মৌ, আমি এখন বোম্বাইতে। তোমার সঙ্গে দেখা করে আসিনি, কাছ থেকে যা বলা যায় না, দূর থেকে বলব—আমিও তোমাকে ভালবাসি, তবে কি জান তো, বাবারা মেয়ের বিয়ে দেন কোনও ছেলের সঙ্গে নয়, জীবিকার সঙ্গে। গাড়ি, বাড়ি, চাকরি, টাকা। আমি সেই সব গয়নার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি, ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আদায় করব বলে। আমার মাথায় এখন দুটো চিন্তা—গান আর তুমি। জীবনে আর কারোকে দেখে এত দুর্বল হইনি। পারলে অপেক্ষা কোরো। বেশি না, মাত্র কয়েক

বছর। আর কারোর কাছে গান শিখো না, ঘরানা উল্টে দেবে। আমিই তোমাকে শেখাব। কিছুদিনের জন্যে আমি একটা দলের সঙ্গে দুবাই যাচ্ছি। বোম্বাই আর দুবাই দুটো ঠিকানাই রইল। ইচ্ছে হলে লিখো। তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম—মানস॥

শঙ্কর মানসের চিঠিটা পড়লেন। অনেকদিন পরে তাঁর চোখে একটু জল এল। একটা লাইন—এত ভালবাসি তাই এত বেশি ব্যথা পাই। সব ব্যথা কথা হয়ে প্রাণে গাঁথা থাক না।

বৃদ্ধ দোতলায় উঠে এলেন। টবের গাছগুলো মরে না যায়। একটু একটু করে জল ঢালতে লাগলেন। পরিচ্ছন্ন. নধর, একটি ঘুঘু নারকেল গাছের পাতায় বসে ঘুরঘুর করছে। বৃদ্ধ সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'শ্মশানের শান্তি ভালবাসিস নে পাখি সব শ্মশান করে দিয়েছি।' শঙ্করের ঘরের তালা খুললেন, ষাটটা বছর যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

আমবাগানে একটি মেয়ে ছুটছে। হলুদ ছাপ ফ্রক। গোল গোল পায়ে পাঁয়জোরের চিনচিনি। হাতে তার জীবনের প্রথম প্রেমপত্র।

ধাপে ধাপে

আর তো বেঁচে থাকা যায় না। খুব খারাপ অবস্থা। খুন, জখম, ডাকাতি, অপহরণ, সন্তান বদল, দেবতারা সব দানবে পরিণত, অমৃতের পুত্ররা কোথায়! জগৎসংসার আর বিধির বিধানে চলছে না। চালাচ্ছে চাঁদির চাকতি। সৎ-অসৎ-এর ব্যবধান ঘুচে গেছে। পাপকর্ম বলে আর কিছু নেই। ধর্ম শব্দে আছে, শাস্ত্রে আছে, আচরণে নেই। ঘটা আছে ঘট নেই। উৎসব আছে পুজো নেই। সূর্যোদয়ে যাবতীয় ধান্দার জাগরণ, সূর্যাস্তে বোতল-বারিতে নিমজ্জন। মধ্যযামে বেপথু নরনারীর খিস্তিখেউড়। এই পথেই আগামী প্রজন্মের আগমন। মাতৃপরিচয় থাকলেও পিতা কে? এই প্রশ্নের উত্তর কেউ খুঁজবে না। ফর্মে ফাদারস নেম-এর জায়গায় লেখা হবে মাদারস নেম। সহবাস থাকবে পরিবার থাকবে না! আমরা মডার্ন, আমরা বোল্ড। আমাদের ধর্ম, জৈব ধর্ম, আমাদের উপাস্য, ক্ষমতা, অর্থ। আমাদের আদর্শ, পশুটাকে জাগাও।

একজন হেসে বললে, 'এসব তোমার ইডিয়েটের মতো ভাবনা। তুমি 'দ্রাক্ষাফল টক' গ্রুপের এক ব্যর্থ মানুষ। চল, তোমাকে আলিপুরের একটা প্রাসাদে বসিয়ে দিয়ে আসি। পাঁচটা পাঁচ রকমের বিলিতি গাড়ি, তিন-চারটে কোম্পানির মালিক। সেখানে ন্যায় নীতি মানুষ সব পেষাই হয়। টাকা দিয়ে আইন কেনা হয়। টাকা দিয়ে মস্তান পোষা হয়। কোটি কোটি টাকা ঢেলে আহামরি মন্দির তৈরি করলেও তোমাকে ধার্মিক বলা যাবে না। তখন এই তুমিই তোমার এইসব ভাবনাকে নেহাতই মধ্যবিত্তের গতানুগতিক ভাবনা বলে মনে করবে। একটা স্তরে মানুষের এইসব ভাবনা আসে। সেই স্তরটা পেরোতে পারলে মন আর মনের ভাবনা দুটোই চলে যায়। সেই মানুষটা তখন একটা দামী গাড়ির মতো। সামনে অনন্ত পথ। তখন তার একটাই মন্ত্র, ড্রাইভ, ড্রাইভ, ড্রাইভ ফাস্ট। থেমো না। থামলেই পেছনের গাড়ি তোমাকে মেরে বেরিয়ে যাবে। তোমাকে ওগডেন ন্যাশের একটা কবিতা শোনাই :

> Remorse is a violent dyspepsia of the mind,
>
> But it is very difficult to treat
>
> because it cannot even be defined.

মনের ডিসপেপসিয়া হলে এইসব চিন্তা আসে। পৃথিবীর কি হচ্ছে, হয়েছে, হবে তোমার কি লাভ! তুমি, আমি, আমাদের পরিবার পরিজন এটাকে পালটাতে পারব! নেতারা পারবেন! মণীষীরা পারবেন! মেজর জেনারেলরা পারবেন! কেউ পারবেন? অপ্রতিরোধ্য। যতদিন না মৃত্যু হচ্ছে ততদিন পালাতে পারবে? পারবে না। জগৎ-খেলায় তুমি আমি কয়েক কোটি ঘুঁটি মাত্র। জন্ম আর মৃত্যু ছকের দু'পাশে মুখোমুখি। অনন্তকাল ধরে খেলা চলেছে। ওগডেনের আরও ক'টা লাইন অনুধাবন কর :

Because everything is not gold that glisters
and everything is not a tear that glistens.
And one man's remorse is another man's
reminiscence.
So the truth is that as far as improving the
world is concerned,
remorse is a duffer.

অতএব তোমার এই বিষণ্ণতা, তোমার এই ভেটকে বসে থাকাটা বোকার বোকামি। যদি কিছু করা যেত তা হলে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতেন না!'

বন্ধু আমার শ্রীমদ্‌ভাগবতের কথা বলছে।

উদ্ধত, মদ্যপায়ী ও যথেচ্ছাচারী হয়ে গেলেন যাদবরা। দ্বারকায় বসুদেবের যজ্ঞ শেষ হল। ঋষিরা এসেছিলেন সেই যজ্ঞে। তাঁরা দ্বারকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বিদায় পর্ব। একদল যাদব যুবকের মনে হল ঋষিদের অপদস্থ করা যাক, তাহলে বেড়ে মজা হবে। শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাম্বকে গর্ভবতী রমণী সাজিয়ে ঋষিদের সামনে উপস্থিত করে প্রশ্ন করা হল, 'দয়া করে বলুন, এর ছেলে হবে না মেয়ে!'

ঋষিরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও অপমানিত হয়ে উত্তর দিলেন, 'এ তোমাদের কুলনাশন মুষল প্রসব করবে।' এই বকাটেদের দলে কে রয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাম্ব! কি সেজেছেন, গর্ভবতী রমণী! এ কি ভাবা যায়, কতটা অধঃপতন!

যাই হোক, ঋষিবাক্য মিথ্যা হওয়ার নয়। পরের দিনই সাম্ব একটি মুষল প্রসব করলেন। যাদবরা বিপ্রশাপ এড়াবার জন্যে মুষলটিকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পাথরে ঘষে ঘষে প্রায় নিঃশেষে ক্ষয় করে ফেললেন। সামান্য যেটুকু ছিল, ওতে আর কি হবে, ভেবে সমুদ্রে ফেলে দিলেন। কিন্তু, ঋষিবাক্য তো মিথ্যা হওয়ার নয়। ঘষাঘষির ফলে সমুদ্র কিনারে গুঁড়ো গুঁড়ো লোহা পড়েছিল। সেই লোহাচুর থেকে গজিয়ে উঠল অসংখ্য 'এরকা তৃণ'। অর্থাৎ তৈরি হল বিশাল একটি নলখাগড়ার বন। ধ্বংসের অস্ত্রশস্ত্র সব তৈরি। মুষলের টুকরোটি হবে ব্যাধের তীরের ফলা। আর এরকা হবে যাদবদের হাতে হাতে শাণিত তরোয়াল। পরস্পরের নিধনের প্রাকৃতিক অস্ত্র।

এদিকে স্বয়ং ভগবান বসে আছেন, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, উদাসীন। অপূর্ব সুন্দর মুখটি হাসি হাসি। জানেন সব, কিন্তু কিছু করছেন না, করবেনও না। অন্তরঙ্গ বন্ধু, ঘনিষ্ঠ সহচর উদ্ধব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলছেন,

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্তন।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সংত্যক্ষ্যতে ভবান্।
বিপ্রশাপং সমর্থোঽপি প্রত্যহন্ন যদীশ্বর॥

উদ্ধব যেন শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় রূপ। অবিকল সেই চেহারা। বন্ধুঅন্ত প্রাণ। বলছেন, হে দেবদেবেশ, হে যোগেশ্বর, হে পুণ্যশ্রবণকীর্তন, সর্বশক্তিমান,

সর্বতোসমর্থ হওয়া সত্ত্বেও তুমি যে বিপ্রশাপ নিবারণের চেষ্টা করলে না, তাতে মনে হচ্ছে, তুমি নিশ্চয় এই বংশ নাশ করে ইহলোক ত্যাগ করবে!

ভগবান বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

উদ্ধব ছলছলে চোখে জিজ্ঞেস করলেন—কেন? কেন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চাইছ?

ভগবান বললেন—ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্যমশেষতঃ। ব্রহ্মার অনুরোধে যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে অংশাবতার বলরামকে সঙ্গে নিয়ে এই সংসারে অবতীর্ণ হয়েছিলাম দেবগণের অভিপ্রেত ভূভাবহরণরূপ সেই কাজ আমি পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছি। এইবার তুমি আমার প্রস্থানটা দেখ। সেটাও তোমার কাছে একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে। প্রত্যক্ষের মধ্যেই তোমাকে থাকতে হবে, থাকার মাশুলও দিতে হবে, কিন্তু কোন মন্ত্রে, কোন কৌশলে তুমি আমার মতো অবিচলিত থাকতে পারবে! ত্বং তু সর্বং পরিত্যাজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু, স্নেহের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেল, স্বজন, বন্ধু সব পরিত্যাগ কর, ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক সমদৃগ বিচরস্ব গাম, আমাকে কি দেখছ? সম্পূর্ণ নির্বিকার, বসে বসে যাদবকুলের বিনাশ দেখছি। একবারও সামনে গিয়ে বলছি না, এই তোরা কেন এমন করছিস! সংযত হও, সুস্থির হও। এখন আমি কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ নই বিদায়ী বৃদ্ধ কৃষ্ণ। যোদ্ধা কৃষ্ণ নই তাত্ত্বিক কৃষ্ণ। যে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের পরিচালনা করেছিল সে নিজের বংশের অনিবার্য ধ্বংস ঠেকাতে পারে না। অবশ্যই পারেন। কোন শর্তে পারেন? আমার শরণাগত হতে হবে। মামেকং শরণং ব্রজ। একমাত্র এই শরণাগতি এলে আমি পারি, অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষেয়িষ্যামি। উদ্ধব আমি নিজেই এবার ধ্বংস চাইছি। মানুষের সামনে দুটো পথ, এক মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। আমাতে চিত্ত স্থির কর। আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও, আমাকে নমস্কার কর। তোমার নিয়তি যাই হোক, এই পথে তুমি আমার প্রিয় হবে। আমার প্রিয়কে আমি বুক দিয়ে আগলাব।

দ্বিতীয় পথ ধ্বংসের পথ। নিজের নিয়তি ও পরিসমাপ্তির রূপকার স্বয়ং তুমি! ভগবানকে যে মুহূর্তে জীবন থেকে বিতাড়িত করবে, সেই মুহূর্তে তোমার ভেতর ধ্বংসের কিছু লক্ষণ ফুটবে, তখন তুমি নিজেকেই নিজে মারবে। ইন্দ্রিয়-সমূহ তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে, ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ। ইন্দ্রিয়পর মানুষ কি করে উদ্ধব! বিষয়ের দিকে ছোটে। ভোগ, আরো ভোগ! সে তখন মানুষ থেকে মুষিক,

> ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে॥
> ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

পরপর ধাপে ধাপে এগোবে ধ্বংসের দিকে। বিষয়, বিষয় করতে করতে

বিষয়ে আসক্তি, আসক্তি থেকে কামনা, তৃষ্ণা, আরো আরো চাই। কামনা প্রতিহত হলেই ক্রোধ। ক্রোধ এলে বিবেক মরে যায়, তখন মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। শাস্ত্রের উপদেশ আচার্যের শিক্ষা বিবেকেই ধরা থাকে, বিবেক চলে গেলে সেই সংস্কারটাও চলে যায়। স্মৃতিবিলোপ। বিলোপ থেকে বিভ্রম। কোনটা সৎকর্ম, কোনটা অসৎকর্ম এই বিচারবুদ্ধি আর থাকে না। বিচারবোধের অভাবে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

দুরারোগ্য ব্যাধিতে যেমন মানুষ মরে, সমাজও মরে নীতিভ্রষ্টতায়, মরে নেতৃত্বের অভাবে, শিক্ষার অভাবে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, পণ্ডিতপ্রবর, প্রয়াত রাধাকৃষ্ণাণ বলছেন—Democracy does not mean merely anybody getting up and lecturing to us। বাঁধা মঞ্চে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালুম, মাইক্রোফোন আঁকড়ে ধরে ঠেসে খানিক বক্তৃতা করলুম, ফুলুরি ভাজার মত।

বর্তমান অবস্থার কারণ অনেক। অনুসন্ধান মানে সমাধান নয়। এমনটাই চলতে থাকবে। তাহলে অস্তিত্ব বজায় রাখার উপায়! পাহাড়চূড়ায় বৃক্ষতলে বসে শ্রীকৃষ্ণ নির্মোহ হয়ে দেখছেন, প্রভাস-মেলায় যদুকুলের পারস্পরিক হানাহানি। এরকা তৃণ উৎপাটিত করে পরস্পর পরস্পরকে বধ করছে। অবশেষে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে গেল দ্বারকা।

অবশ্যম্ভাবী এমন এক পরিণতির সামনে হয়ত আমরাও দাঁড়িয়ে আছি। ভগবানশূন্য এই সময়ে বাঁচব কি ভাবে! কেন, ভগবান উদ্ধবকে কৌশলটি দিয়ে গেছেন। আমি যেমন নির্বিকারচিত্তে যাদবকুলের বিনাশ দেখে যাচ্ছি, তুমিও সেইরকম বাজে প্রসঙ্গ, আত্মীয়স্বজন থেকে মন তুলে নিয়ে, সমগ্র মনটা আমাকে দিয়ে দাও। সমদর্শী হয়ে ঘুরে বেড়াও। ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু। ময্যাবেশ্য মনঃসম্যক সমদৃগ বিচরস্ব গাম॥

এসো মা, এসো এসো

আমি যে বয়সে দাঁড়িয়ে আছি সেই বয়েসটা হল বীতশ্রদ্ধ হওয়ার, সন্দিগ্ধ হওয়ার। এই বয়সের মানুষের যা হওয়া উচিত, সব কথাই নেগেটিভ, পজেটিভ কথাবার্তা নেই বললেই চলে। এসবই হল শারীরিক আর মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ। মুফতে বেঁচে থাকার বাসনা! সংগ্রামের মানসিকতা চলে গেলেই মানুষ 'সিনিক' হবে। 'সিনিক' শব্দটার এককথায় কোনো বাংলা নেই। মনের ভ্যাটভ্যাটে অবস্থা। মনের কোষ্ঠকাঠিন্য। মৃত্যুর ছায়ায় এসে জীবনের উচ্ছ্বাস-উৎসব দেখলে হাড়পিত্তি জ্বলে যেতে বাধ্য। ভুরুর ভাঁজে সদাই যেন ঝুলে আছে অলিখিত বিরক্তি, 'এ সব কী-ই হচ্ছে!' আলোচক থেকে সমালোচকে উত্তীর্ণ হওয়ার পদ্ধতিটা এমনই অপ্রতিবোধ্য স্বয়ংক্রিয় যে আমরা বাধা দিতে পারি না। অনেকটা 'কলেস্টোরোল' বা 'সুগার' বেড়ে যাওয়ার মতো। এতখানি জীবন খরচ করে যা পাওয়া গেল, তা হল ঈর্ষা আর উন্নাসিকতা। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মধ্যে এই ব্যাপারে বিশেষ কোনও তফাত নেই। পাশ্চাত্য-জীবনে আছে সর্বগ্রাসী হতাশা। হেমিংওয়ে, কোয়েসলারের মতো লেখকেরা আত্মহত্যা করেন। সিলভিয়া প্লাথের মতো কবি গ্যাস-স্টোভের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেন।

সেকাল শব্দটা বৃদ্ধদের এলাকাতেই ঘোরা-ফেরা করে। একালে সেকাল এসে ঢোকে বৃদ্ধদের ঘাড়ে চেপে। সেকালের বেড়াল আরও সুন্দরী ও বাধ্য ছিল। সেকালের পাখি আরও ভাল গান গাইত। কাকের ডাক সেকালে এত কর্কশ ছিল না। মায়েরা ছিলেন যশোদা, মেয়েরা সব সাধিকা। শ্রীমতীর মতো সব প্রেমের পুরিয়া! সেকালের সন্দেশ শালপাতায় বসে বসেই ঘি ছাড়ত। গব্যঘৃত এতই গব্য, টানা এক মাস সেবন করলে চিতায় আর ঘি ঢালার প্রয়োজন হত না। পাড়ার ঝুলবারান্দার দিকে তাকালেই দেখা যেত জোড়া জোড়া হরগৌরী ঝুলছেন। হর দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁচছেন, গৌরী চ্যাকোর চ্যাকোর করে জর্দা পান চিবোচ্ছেন। মাঠে-ময়দানে কামধেনুর শীর্ণ সংস্করণ চরছে। দুধের পরিমাণ যৎসামান্য হলে কী হয় একেবারে ফোঁটা ফোঁটা ক্ষীর। কত্তা বৈশাখে দুধ খেয়েছিলেন, আষাঢ়ের শেষেও চিরুনি গোঁফের ডগায় ডগায় ঘি ব্যাড়ব্যাড় করছে।

সেকাল আর একালের যে মস্ত তফাত, সেটা হল সেকালটা ছিল মানুষের একালটা হল যন্ত্রের। যে কারণে একালের যে কোনও করিৎকর্মা মানুষকে আড়ালে বলা হয়, একটি 'যন্তর'। পঞ্চাশ, ষাট বছর আগে আমাদের এই কম আলোর এলাকায় কত জায়গা ছিল, মাঠ, পুকুর, সরোবর, দীঘি, প্রবাহিত গঙ্গা, কম মানুষ, বড় বড় জমিদারদের দুর্ভেদ্য বাগানবাড়ি, দেবালয়, বিশাল গাছ, আম্রকানন। তীব্র দিবালোক, শীতল ছায়া, উৎকণ্ঠাশূন্য, অসন্দিগ্ধ পক্ষীকুল। মানুষের শ্রম আর বিশ্রামের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত একটা সাম্য ছিল। এক জায়গায় বসে দু'দণ্ড গল্পসল্প করার সময় ছিল। সকলেই সকলকে চিনত। দুঃখে দুঃখী,

সুখে সুখী হত। গোটা গ্রামটাই ছিল বৃহৎ একটা পরিবারের মতো। কোনও পরিবারে কারও বেচাল দেখলে যাঁরা গ্রামের মুরুব্বি তাঁরা সমবেত হয়ে বোঝাবার, ফেরাবার চেষ্টা করতেন। বিরোধের অবসান ঘটিয়ে বিবদমান দুই পক্ষকে মিলিয়ে দিতেন। রাগীকে শান্ত করতেন, নির্বোধে বোধ আনতেন। অলসকে কর্মমুখী করতেন। মদ্যপকে তিরস্কার করতেন। সকলেই সকলকে নজরে রাখতেন বলে আমাদের শৈশবটা ছিল স্বপ্নের মতো। স্বপ্নের গ্রামে, স্বপ্নের সবুজ মাঠে, স্বপ্নের জলাশয়ের ধারে, আমরা একদল শ্রীদাম, সুদাম, বলরাম। আমাদের শৈশবে অরণ্যদেব, স্পাইডারম্যান, ম্যানড্রেক তখনও জন্মায়নি। আমাদের অরণ্যের একমাত্র অরণ্যচারী ছিলেন, শিশুদের চিরসখা মধুসূদন দাদা। আফ্রিকার অরণ্যে ছিলেন টারজান।

বহুকালের গুজব, বড় বড় ব্রিজ তৈরির সময় প্রতিটি শিল্পের ভিতে নরবলি দিতে হয়, তা না হলে ভেঙে পড়ে যায়। কিছুতেই গাঁথা যায় না। বড় বড় 'নর' কন্ট্রাকটাররা পাবে কোথায়, তাই ভুলিয়ে ভালিয়ে নরশিশু নিয়ে গিয়ে বলি দিত। বালির ব্রিজ তৈরির সময় আমাদের গ্রামের অনেক শিশু না কি হারিয়ে গিয়েছিল! রটনা অবশ্যই। ভয়ঙ্কর ভাবনার মধ্যে নির্বোধ আতঙ্কের একটা আনন্দ থাকে। সেকালের সঙ্গে একালের সেতু তৈরিতে একালের প্রায় সব শিশুকেই কেরিয়ারের হাড়িকাঠে বলি দেওয়া হয়েছে। একালের মানবশিশুর শৈশব নেই।

আমাদের গ্রাম দেশবিভাগের পর জনঅরণ্যে পরিণত হল। হারিয়ে গেল মাঠময়দান। টলটলে পদ্মভাসা জলাশয় হয়ে গেল নিরেট ভূখণ্ড। চতুর্দিকে 'বড়ির' মতো বাড়ি। কাটা পড়ল আমবাগান, কুলবাগান। অলস এবং বেকার জমিদার পুত্ররা দেহজ্বালা জুড়াতে ডবল 'এ'-এ ডবল ডোজে ধার করা টাকা ঢেলে বিশাল বিপুল বাগানবাড়িতে একালের বেওসায়ী ঘুঘু চরিয়ে দিলেন। কড়িকাঠ আর হাত দশেক লাকলাইন দড়ির কল্যাণে নিজেরা শহিদ হয়ে স্বর্গারোহণ করলেন।

বেওসায়ীরা ঘাস বোঝে না কাঠা আর বিঘে বোঝে। আকাশ বোঝে না ছাদ বোঝে। চাঁদ বোঝে না বোঝে চাঁদি। অমন সুন্দর ছবির মতো জনপদ একটা 'প্রেটোয়' পরিণত হল। নতুন নতুন মানুষ এসে নতুন মূল্যবোধের চর্চা শুরু করল, যার মূল নীতি হল, 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম।' চতুর্দিকে ভুরু কোঁচকানো সন্দেহপ্রবণ মানুষ। কথা মানেই কলহ। স্পর্শ মানেই প্রহার!

শরৎ এসে কোথায় পা রাখবে! শিশির ঝরবে কোন ঘাসের ডগায়। কোন শিশু কচিকচি হাতে অঞ্জলি অঞ্জলি শিউলি তুলে নেবে! ঘাসে ঢাকা সবুজ সেই মাঠ এখন স্মৃতি। ভোরবেলা যে মাঠে দাঁড়িয়ে পুজো আসার পনের দিন আগেই আমরা শুনতে পেতুম, দূরে, বহু দূরে মেঘলোকে কোথাও ঢাক বাজছে, মা আসছেন, মা আসছেন মেঘের ভেলায় চড়ে। রাজহাঁসে চড়ে আমাদের প্রিয় দেবী

মা সরস্বতী। আমরা নির্ভেজাল খাঁটি বাংলা স্কুলে পড়েছি। ত্যাগী এবং অতিশয় রাগী রাগী শিক্ষক মহাশয়েরা অতি সামান্য দক্ষিণায় সন্তানবৎ আমাদের মানুষ করার অক্লান্ত চেষ্টা করতেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর রাখতুম না। আমাদের স্কুল, আমাদের শিক্ষকমশাইরা ছিলেন আমাদের আপনজন। আমাদের সেকেলে নাম সব এমন ছিল, যা সহজেই বিকৃত করা যায়। নেলো, ন্যাপলা, হেবো, শিবে। মাস্টারমশাইরা এই নামেই ডাকতেন। কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনেই বোঝা যেত শাসন না স্নেহ! সেই সরল, পবিত্র, সেকেলে শিক্ষকরা আমাদের মানুষ হওয়ার মন্ত্র দিতেন। শিক্ষা মানে জীবন। মানুষ দ্বিপদ, শিক্ষা চতুষ্পদ, জ্ঞান, চরিত্র, স্বাধীনতা, উদারতা। আমাদের বিদ্যালয় ঘিরে বিরাজ করত পবিত্র একটা গন্ধ। সেই পবিত্রতায় মা সরস্বতী এসে যখন আসন বিছাতেন তখন আমাদের অবস্থা হত, ঘরেই থাকা দায়। একালে স্কুলের পুজোয় কেউ যায় না। লুচি, আলুরদম, বোঁদের স্ট্যাটাস নেই। পেটেও সহ্য হয় না। প্যাস্ট্রি, প্যাটিস, পিৎজা, রোলের যুগ।

সেই মাঠে দাঁড়িয়ে আমরা অনুভব করতুম, মা আসছেন সপরিবারে। বড়রা বলতেন, 'দ্যাখ দ্যাখ কেমন পুজো পুজো রোদ। এই যে 'আকাশে বাতাসে তাঁর আগমনী'—এই বোধটা একালের মন থেকে হারিয়ে গেছে। একমাস আগেই মাঠে বাঁশ পড়ে গেল। মায়ের মণ্ডপ তৈরি হবে। বাঁশ তেমন ভাল জিনিস নয়, বড় হয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। সেই কিশোর বয়সে বাঁশ দেখেই কি আনন্দ! মায়ের বাঁশ এসেছে। ধীরে ধীরে বাঁশের পাকাপোক্ত গঠনটি যেই খাড়া হল, আমাদের আর পায় কে! বাঁশ বেয়ে বানরের দল উঠে পড়ল টঙে। বাঁশ থেকে বাঁশে চোর-পুলিস খেলা। নিচে বড়রা এসে হাঁ করে ওপরদিকে তাকিযে আছেন। তাঁদের বাড়ির দুরন্ত শাবকটি টঙে ঝুলছে বিপজ্জনকভাবে। তিনি চিৎকার করছেন, 'নেমে আয় বাঁদর'। যে ঝুলছে সে জানে নামলেই বিপদ। পালের গোদা পটলা আরও ওপরে। সবাই বলছেন, ওটা বাঁদরেরও বাঁদর। ওইটার জন্যে সবকটা বাঁদর বখে গেল। তা না হলে এরা তো এত বাঁদর ছিল না।'

ওপরে ঝুলতে ঝুলতেই শুনতে পেতুম উদারপন্থী কেউ একজন, তিনি হলেন আমাদের সকলের সত্যেনকাকু, ব্যায়ামবীর, সাঁতরে গঙ্গা পারাপার করেন, বলছেন, 'বলাই! ভুলে গেছিস, আমরা আমাদের ছেলেবেলায় কি করেছি! মা আসার আগে রামচন্দ্রর বাহনদের পাঠিয়ে দেন।' ছেলেবেলার এই ধারাবাহিকতা হঠাৎ হারিয়ে গেল। এখন আর কেউ বাঁদর থেকে মানুষ হয় না। মানুষ থেকে বাঁদর হয়।

পর্যায়ক্রমে কানমলা ও ভারায় ওঠার মধ্যেই তেরপল চেপে যেত, যেন সার্কাসের তাঁবু। ঝুলে-থাকা নারকোল দড়ি মাথা উঁচিয়ে থাকা বাঁকাচোরা ছ'ইঞ্চি পেরেক। তেরপলের ফুটোয় ফুটোয় শরতের নীল আকাশের উঁকি। চেঁদো মাটিতে একটা বাটি পুঁতে দিয়ে বলত, 'যা, বৃষ্টির পথ বন্ধ করে দিলুম। এই

কায়দাটা আমি পঞ্চা গুণীনের কাছে জেনেছি।' একজন সন্দেহ প্রকাশ করলে, 'ব্যাং না বাটি!' লেগে গেল ধুন্ধুমার। গুণীন ইহলোকে নেই। তখন পেল্লায় পেল্লায় মানকচু গাছের ঝোপের তলা থেকে শেতলা একটা ব্যাং ধরে নিয়ে এল। জ্বলজ্যান্ত একটা ব্যাং-কে কবর দিলে, সে তো মরেই যাবে। আবার গবেষণা! সিদ্ধান্ত হল বাটি। ব্যাংটাকে ছাড়ামাত্রই লাফ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে পিচ্ করে আমাদের গায়ে হিসি। গণেশ বললে, 'দেখলি তো, মানুষের কোনোদিন উপকার করতে নেই!'

চতুর্থীর মধ্যরাতে মা এলেন প্যান্ডেলে। ঘরে ঘরে আমাদের মায়েরা জাগিয়ে দিলেন, 'ওঠ ওঠ, মা এসে গেছেন।' ছোট্ ছোট্। ঘুম-ভাঙা চোখে আমরা হাঁ করে তাকিয়ে আছি। দেবদেবীরা সামনে। তখনও গয়নাগাঁটি পরেননি। হাতের মুঠো আছে অস্ত্র নেই। এতেই যা রূপ খুলেছে! আর কিছুর দরকার নেই।

প্রত্যেকবার যা হয়, এবারেও তাই। মা লক্ষ্মী আর মা সরস্বতীর পোজিশান! কে বাঁদিকে, কে ডানদিকে! 'ডাক তারাদাকে। একবার বসে গেলে আর নড়ানো যাবে না!' শ্যামলকাকু বললেন, 'আরে আমি বলছি...'

'চুপ্, তুমি একটা কথাও বলবে না, তোমার জন্যেই আমাদের এই সন্দেহ। সন্দেহটা তুমিই তৈরি করেছ। গতবার সন্ধিপুজোর সময় ধরা পড়ল, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্লেস চেঞ্জ করেছেন!'

'কিন্তু কি রকম ম্যানেজ দিলুম বল্! সরস্বতীর বীণাটা খুলে এনে লক্ষ্মীর হাতে, আর লক্ষ্মীর ঘটটা সরস্বতীর হাতে। প্যাঁচাটাকে স্রেফ এদিক থেকে ওদিকে, আর রাজহাঁসটাকে ওদিক থেকে এদিকে।'

একালে তো তাই হল। বিদ্যা আর বিনয় দেয় না, দুর্বিনীত করে। যে বিদ্যা শুধু জ্ঞান দেয়, সে বিদ্যা বিদ্যাই নয়। বিদ্যা হবে অর্থকরী! স্মৃতি, শ্রুতি, ন্যায় কে তোমারে চায়! বাদ্যযন্ত্র, সরোদ, সেতার আমেরিকায় ডলারে বাজে। ছেলেবেলায় অসুরকেই ভীষণ ভাল লাগত। কারণ, অসুর একেবারে আমাদের চোখের সামনে। গোলাগুলি ফুলিয়ে বুক চিতিয়ে বাস্তবভূমিতে। সিংহটা যেন তার পোষা কুকুর! আর মা দুর্গা সেই কোন ওপরে নাচের ভঙ্গিতে টাল খাচ্ছেন। অনেকটা পিছিয়ে না গেলে মুখ দেখা যায় না। আমরা বলাবলি করতুম, 'মায়ের খুব রিস্ক। ওইভাবে কেউ যুদ্ধ করে!' হারু যোগ করত, 'সিলিপ খেয়ে পড়ে গেলে মহা কেলো!'

সেকালের পুজো একালে মহাপুজোর রূপ নিয়েছে। ভক্তি, কল্পনা, টাকা চাপা পড়ে গেছে। মহাজলুস। প্রোমোটাররা পুজো প্রোমোট করছেন। ঘটের চেয়ে ঘটা বড়। প্রতিমার চেয়ে প্যান্ডেলের আকর্ষণই বড়। মা কখনও হোয়াইট হাউসে, না হয় ভিক্টোরিয়ায়। পুজো এখন মার্কেট আর মার্কেটিং। ঢাক বাজালে একালের শিশুদের বুক নেচে ওঠে না। ইন্টারনেটে পুজো দেখা।

তাঁতের লালডুরে খড়খড়ে শাড়ি পরা মায়েরা কাঁখে তাঁর শিশুটিকে নিয়ে

বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। শিশুটির একটি পা পেছনে দুলছে। কাজল চটকানো মুখ। মুখে বুড়ো আঙুল। পৃথিবীর মা অনিমেষে জগতের মাকে দেখছেন। একালে মা যাদের কাছে পাহাড় ছেড়ে আসেন তারাই সব পাহাড়ে পালায়। একালের কেউ কাঁদতে কাঁদতে বলে না— 'মা আবার এসো!'

উত্তর

সব কাজ শেষ হতে হতেই সন্ধ্যা নেমে এল। হিমাংশুবাবু একেবারে নিঃসাড়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন। সংসারের এক পাশ থেকে, যেন টুক করে গাছ থেকে খসে পড়ে গেল একটি পাকা ফল। এত সফল মানুষের বিশাল এই পৃথিবী থেকে বিফল এক মানুষের চিরবিদায় ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। অমন কত হিমাংশু আসে-যায়! আমিও ওই দলেই পড়ি।

বড় চাকরি করতেন সায়েব কোম্পানিতে। অ্যাকাউন্ট্যান্ট। মোটা মাইনে। বনেদী, সম্পন্ন পরিবারের ছেলে। সুপুরুষ। ভাল ঘরে বিয়েও করলেন। জীবনের একমাত্র নেশা ছিল সংগীত। মার্গ সংগীতে ক্রমশই উন্নতি করতে লাগলেন। নামকরা দুই ওস্তাদের কাছে ধ্রুপদ আর খেয়াল শিখলেন। সংগীতের ব্যাকরণ আর পরিবেশন, উভয় দিকেই সমান ওস্তাদ। তাঁর কালের বড় বড় অনুষ্ঠানে হিমাংশুবাবু ছিলেন গভীর রাতের শিল্পী। এইটাই ছিল তাঁর কদরের প্রমাণ।

সংগীতের জগতের প্রবল আকর্ষণে বাঁধা মাইনের অমন চাকরিটা ছেড়ে দিলেন।

শ্মশান-সঙ্গীরা বলাবলি করতে লাগলেন, মানুষটা নিজেও ডুবলো, সংসারটাকেও ডুবিয়ে গেল। ছেলেটা অমানুষ, মেয়েটার বিয়ে হয়নি, ভাই দুটো স্বার্থপর। আরে গান, রাখো তোমার গান। কে জানবে ক্ল্যাসিক্যাল গান। দরবার কোথায় যে দরবারি গাইবে। ভোর হতে না হতেই মানুষ ছুটছে ধান্দায়, তখন কার দায় পড়েছে ভৈরবী শোনবার। হিন্দি ফিলমি গানের যুগ, সেখানে জিভ ছোলা গান চলে।

হিমাংশু ছাই হচ্ছেন, এদিকে সমালোচনা চলেছে। একজনও প্রশংসার কথা বলছে না। মানুষটার কোনও গুণই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জীবনটা ভুলে ভরা। আত্মঘাতী এক মানুষ। তুমি চাকরি ছাড়লে বেশ করলে, তোমার কি দরকার ছিল সাধুসঙ্গ করার! যোগ আর প্রাণায়াম করতে গিয়ে মাথাটা বিগড়ে গেল।

বিগড়ে গেল মানে? ফুল ম্যাড! একদিন আমরা দু'জেন হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি, ওরই মেয়ের পাত্র দেখতে। আমারই পরিচিত একটি ছেলে। দু-দশ পা হাঁটে আর দাঁড়িয়ে পড়ে ডান পা'টা একবার করে ঝেড়ে নেয়। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, ওটা কি হচ্ছে! বললে, আমার ডান পা'টা মাঝে মাঝে ছোট হয়ে যায় তখন ঝেড়ে ঠিক করে নিতে হয়।

সবাই হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল।

আমার আর সহ্য হল না। সরে গেলুম গঙ্গার ধারে। আমার চোখে হিমাংশুবাবু একজন বড় সাধক। আমি তাঁর অনেক প্রমাণ পেয়েছি। জীবনের শেষ কুড়িটা বছর তাঁর সঙ্গে থেকে আমার মনে হয়েছিল, এই মানুষের সংসার করা উচিত হয়নি। আলু, পটল, ঢেঁড়সের জগতের মানুষ এঁরা নন। জাতশিল্পী, জন্মসাধক। ভুল করে সংসারে ঢুকে পড়েছিলেন। সারাটা জীবন তারই খেসারত দিতে হল।

সেই দিনটির কথা এই মুহূর্তে বড় বেশি মনে পড়ছে।

আমাকে নিয়ে গেলেন বীরভূমের এক নির্জন শ্মশানে। সেখানেই থাকতেন তাঁর তান্ত্রিক গুরু। সেটা ছিল গ্রীষ্মকাল। সেবার গরমও পড়েছিল খুব। চারপাশ জ্বলে যাচ্ছে যেন। সকাল আটটার পর রোদের দিকে তাকানো যায় না। শ্মশানের ধার দিয়ে বয়ে চলা ছোট্ট নদীটা শুকিয়ে কঙ্কাল। বালির ওপর শ্মশানের পোড়া কাঠ, শবের ছাই ছড়িয়ে আছে। দেখলেই ভয় করে। মৃত্যু আমাদের ভেতরেই আছে, ঘুরছে-ফিরছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, তখন ভয় করে না, যেই বাইরে বেরিয়ে এল অমনি ভয়ে মরি। শ্মশানটার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। যে যেখানে পারে চিতা সাজিয়ে শবদাহ করে যায়। আধপোড়া বাঁশ, ভাঙা কলসি, ছেঁড়া কাপড় ছড়িয়ে পড়ে থাকে। দিশি মদের বোতল যত্রতত্র। ব্যবহৃত গাঁজার কল্কে। এক পাল তাগড়া কুকুর। শুকনো নদীর কিনারায় ধ্যানস্থ শকুন। নদীর ওপারে ধূসর একসার পাহাড়। যত্রতত্র টিলা। এইরকম এক ভয়ঙ্কর জায়গায় সেই তান্ত্রিকের আস্তানা। তাল তাল পাথর সাজিয়ে চারটে দেওয়াল, মাথার ওপর পাতার ছাউনি। লম্বা একটা বাঁশের মাথায় লাল একটা পতাকার পত পত। একপাশে বিশাল একটা ত্রিশূল পোঁতা। নিকানো উঠানে একটা তাগড়া হাঁড়িকাঠ। বলির রক্তে মাটিটা লাল রজনের মতো চকচক করছে। আর একপাশে বিশাল একটা হোমকুণ্ড। সবচেয়ে মারাত্মক সেই গুহার মতো ঘরে মায়ের মূর্তিটি। ছিন্নমস্তা। এক হাতে তাঁর নিজের কাটা মুণ্ড। গলা থেকে ফিনকি রক্তের ধারা মুখে এসে পড়ছে। এই ধারা তৈরি করা হয়েছে লাল রঙের তার দিয়ে। মূর্তির বেদীতে সর্বক্ষণ জ্বলছে বড় একটা প্রদীপ। এরই মধ্যে লোভনীয় তান্ত্রিকের একমাত্র শিষ্যা। কত বয়স হবে! পঁচিশ কি তিরিশ। এলো চুল। শ্যামলা রঙ। ধারাল মুখ। নর্তকীর মতো সুঠাম শরীর। হাসলে ঝকঝকে একসার দাঁত বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে। পাতলা দুটো ঠোঁট। একটা মানুষকে পাগলা করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

ধর্ম আমি বুঝি কি বুঝি না, জানি না। তবে এইটুকু বুঝি, আমার একটা দেহ আছে, মন আছে, ইন্দ্রিয় আছে আর আছে প্রেম। কি অদ্ভুত মিলন! একদিকে মৃত্যু, আর একদিকে সেই শ্যামাঙ্গী। তার ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো অদ্ভুত সেই হাসি! বড় প্রেমে পড়ে গিয়েছিলুম: মনে হয়েছিল, তার পেয়ারের কুকুরটাকে সরিয়ে আমি যদি সেই জায়গাটা নিতে পারতুম। তান্ত্রিকদের, ভৈরবীদের একটা সিদ্ধাই থাকে, তার মধ্যে বশীকরণ একটা।

হিমাংশুবাবুর তান্ত্রিক গুরুকে বাইরে থেকে ভয়ঙ্কর মনে হলেও, ভেতরে একজন প্রেমিক ছিলেন। আসন ছেড়ে যেই উঠে দাঁড়ালেন, প্রায় ছ'ফুট লম্বা দশাসই এক মানুষ। বুক সিঁদুরের মতো লাল। মুখমণ্ডল অগ্নিভ। চোখ দুটো থক্‌থকে লাল। ভয়ে আমি কথাই বলতে পারতুম না, আমার যা কিছু কথা, সবই হত ওই তারার সঙ্গে। তার নাম ছিল তারা।

তান্ত্রিক নিজেও উচ্চাঙ্গ সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। ওই আশ্রমে সবই ছিল,

হারমোনিয়াম, একজোড়া তম্বুরা, পাখোয়াজ, খোল, তবলা, মৃদঙ্গ। কোথা থেকে বোধহয় নদীর ওপারে পাহাড়ের দিক থেকেই দুটি আদিবাসী মেয়ে আসত। তারাই সংগ্রহ করে আনত হোমের কাঠ, রান্নার কাঠ। তারাই রাঁধত, আশ্রমের অন্যান্য কাজ সব তারাই করত।

এই শ্মশানেই অমাবস্যার মধ্যরাতে হিমাংশুবাবুর কণ্ঠে মালকোষ শুনেছিলুম। ভূত নামানো রাগ। সত্যিই তাই। মিশকালো আকাশে ঝাঁক-ঝাঁক তারা। দূরে দূরে প্রহরীর মতো পাহাড়ের জমাট অন্ধকার। সদ্য নির্বাপিত চিতার পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়া। প্রান্তরের ওপর দিয়ে বয়ে আসা খড়খড়ে বাতাস।

একজোড়া তম্বুরার একটা আমার হাতে, একটা তারার হাতে। পাখোয়াজে সেই তান্ত্রিক গুরু। বিস্তারে আলাপে মালকোষের রূপ ক্রমশই খুলছে। পাহাড়ের কোলে শেয়ালের ডাক। বিচিত্র এক হাহাকারের মতো। দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে সুরের একটা মণ্ডল তৈরি হল। মা ছিন্নমস্তার তারের ফিনকি সুরের তরঙ্গে থির-থির করে কাঁপছে। রাত যত বাড়তে লাগল ততই মনে হতে লাগল একটা অলৌকিক জগতে প্রবেশ করেছি। অশরীরীদের খিল-খিল হাসি যেন কানে আসছে। শীত শীত করছে। সারা দেহে রোমাঞ্চ। ওই রাতেই বুঝেছিলুম, হিমাংশুবাবু সুর-সিদ্ধ। এমন মানুষ কখনও সংসারী হতে পারে না।

কেউ কেউ বলতে লাগল, ওই তন্ত্র হিমাংশুবাবুর মাথা খারাপ করে দিয়েছে। তন্ত্র তো নয়, গাঁজা, ভাঙ, কারণ-বারি আর রমণী। তা না হলে অমন চাকরি ছেড়ে কেউ সংসারটাকে পথে বসায়! যে যা বলুক, আমি জেনে গিয়েছিলুম, হিমাংশুবাবু একজন গায়ক নন, তিনি সিদ্ধপুরুষ, রাগ-রাগিনীর রূপ দর্শন করেছেন তিনি। তিনি অস্বীকার করলেও আমি তার সাক্ষী। এই বীরভূম আশ্রমেই। ভোরবেলা ভৈরবী গাইছেন কুঠিয়ার পেছন দিকের চাতালে। পাকুড়, বট, অশ্বত্থের ডালপালার আচ্ছাদনে ভোরের আলো ফুটি ফুটি করেও ফুটছে না। বড় মায়াবী লাগছিল সেই স্থানটিকে। চরাচরে ব্যস্ত হয়ে আছে মিহি চাদরের মতো শেষ রাতের কুয়াশা। আমি অনেক দূরে একটা পাথরের ওপর বসেছিলুম আপাদমস্তক একটা চাদরমুড়ি দিয়ে। একটা আচ্ছন্ন ভাব। কিছুটা ঘুমে, কিছুটা সুরের মোহিনী-মায়ার প্রভাবে। হঠাৎ মনে হল, চাতালের একপাশে মিহি সাদা ওরনা গায়ে সুন্দরী এক রমণী বসে আছে, পিঠে ছড়িয়ে আছে রেশমের মতো কালো চুল। ভাবছি, কে এই সুন্দরী! এ তো তারা নয়, অন্য কেউ। চোখের ভুল নয় তো! হতে পারে, শেষ রাতের ঘুম লাগা চোখে এক চিলতে স্বপ্ন পাশ থেকে উড়ে আসতে পারে। কারণও আছে। তারা আমাকে গুণ করেছে, খুন করেছে। কাল আমরা দুজনে হেঁটে নদী পার হয়ে ওই দূর পাহাড়ে গিয়েছিলুম। ওখানে তারার জানা একটা গুহা আছে। অদূরেই আছে অবহেলিত একটি ভৈরব মন্দির। স্থানীয় মানুষ বলে 'ভৈরবথান'। অতীতে সেখানে নরবলিও হত। বছরে একবার শিবরাত্রির দিন এখানে এক ভৈরব আসেন। একটা জমায়েত হয়। সারা রাত

পূজা হয়, পরের দিন আবার সব ফাঁকা। কেউ জানে না, কে এই ভৈরব, কোথা থেকে আসেন! রটনা স্বয়ং মহাদেব এসে নিজের পূজা নিজেই করে যান। সাহস করে যারা আসতে পারে তাদের সব মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

তারা এই 'ভৈরবথানে' মাঝে মাঝেই আসে। যার পাশেই এই গুহা। সঙ্গে দশ-বারোটা আলু এনেছিল। কাঠকুটো জ্বেলে আলুগুলো তার মধ্যে ফেলে দিয়ে আমাকে বললে, তুমি এগুলোকে উলটে-পালটে পোড়াও আমি ততক্ষণে পুজোটা করে আসি। এখানে আর কোনও ভয় নেই, একমাত্র ভয় বিষাক্ত সাপ। যদি দু-একটা আসে ভয় পাবে না, স্থির হয়ে বসে থাকবে আর বাবার নাম করবে।

সেই আগুন, সেই ধোঁযা, আলুপোড়ার সোঁদা-সোঁদা গন্ধ, তারার দীঘল শরীর, থেকে থেকে হাসির বিজলি ঝিলিক, নদীর কৃপণ জলধারায় গা ডুবিয়ে চান— সারাটা দিন সংসার-মুক্ত এক অদ্ভুত আনন্দ। ঈশ্বরকে দেখিনি, দেখবও না কোনোদিন, কিন্তু তারাকে দেখিনি, এ-কথা বলার উপায় নেই। সর্বাঙ্গ দেখেছি, সর্বত্র দেখেছি, স্বাদে ও ঘ্রাণে। কালো শীতল পাথরে শুয়ে থাকা শরীরের বাষ্প ছাপ, এক এক করে সব ত্যাগ, সমস্ত লজ্জা হতে মুক্তি, আবার লজ্জায় ফিরে আসা, হাঁটুতে মুখ ঢেকে বসে থাকা। ঈশ্বরকে বুঝতে না পারলেও, রোদে জ্বলে যাওয়া ওই দুপুরে কুণ্ডলিনী শক্তিকে বুঝতে পেরেছিলুম— সাপ কি ভাবে জেগে উঠে ফণা তুলে ছোবল মারে! সেই ছোবলে বিষ থাকে না অমৃত। তারা বলেছিল, গুহায় সাপ আছে।

মাস্টারমশাইয়ের সামনে যিনি বসে আছেন, তিনি তারা নন। ভোরের মতই স্নিগ্ধ, উদাস কেউ একজন। মনের কতরকম সন্দেহ। হঠাৎ মনে হল, মাস্টারমশাই কি এরই জন্যে সংসার ভুলে এখানে ছুটে ছুটে চলে আসেন, এই বিধবা সুন্দরীর জন্য। প্রথমে ভেবেছিলুম তারার আকর্ষণে। তারা নয়, এই রমণীই আকর্ষণ।

পুবের অন্ধকার আকাশ যেই আলোয় ফাটব-ফাটব হয়েছে, গান যেই শেষ হয়েছে, অবাক হয়ে দেখছি, সেই মহিলা আর নেই। একটা কুয়াশার আঁচল ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। মাস্টারমশাই তম্বুরাটি কাঁধে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন সদ্যফোটা ভোরের আলোয়।

মাস্টারমশাইয়ের কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'কি দেখলুম!'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি দেখেছ? রাগিনী ভৈরবী। আসেন, শেষ রাতে আমার কাছে গান শুনতে আসেন। তুমি কারোকে বোলো না ভাই। তুমি হয়ত আরও অনেককে দেখবে, তোমার সেই চোখ আছে, কিন্তু ভুলেও বলবে না কারোকে, তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

'আর কারা আসেন?'

'বেহাগ, ইয়ামন, বাগেশ্বরী।'

'কেন আপনি কনফারেন্সে গান করেন না!'

'কনফারেন্সে!' হিমাংশুবাবু হাসলেন, 'গান কি বেগুন, না কলা, যে হাটে বসে বিকবো! আমার সেই গানের লাইনটা মনে কর, গান শোনাবে তাকে যিনি দিন দুনিয়ার কাণ্ডারী। আমি ভগবানকে গান শোনাই শ্মশানে বসে, যেখানে জীবনের সমস্ত অহংকার পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। জান না তুমি, কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটের পাশে মহাশ্মশানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কী দর্শন করেছিলেন!'

'না,' বলেছিলুম। জানি না আমি। অত বিস্তারিত লেখা-পড়া আমার নেই। আমার জীবন বড় এলোমেলো, ছন্নছাড়া। আমার লেখাপড়া পাশ করে চাকরি পাওয়ার জন্যে, জ্ঞানের জন্যে নয়। ভালবাসি গান। সুর আমাকে আর একটা জগতে নিয়ে যায়, ঝকঝকে তারা-ভরা আকাশে, পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে পড়া ঝরনায়, ঢেউ ভাঙা সমুদ্রে।

মাস্টারমশাই চুপ করে আছেন দেখে বললুম, 'বলুন না, কী দেখেছিলেন ঠাকুর?'

'মথুরবাবুর সঙ্গে কাশী গিয়েছেন। গঙ্গায় নৌকোভ্রমণ হচ্ছে। মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছে নৌকো এসেছে পাশেই মহাশ্মশান, সারসার চিতা জ্বলছে। ঠাকুর বেরিয়ে এলেন নৌকোর গলুই থেকে, টলবল করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছেন নৌকোর ধারে। মাঝিরা ধর ধর করছে, টাল খেয়ে জলে না পড়ে যান। মথুরবাবু আর হৃদয়বাবু দু'জনে দু'পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ধরতে হল না, ঠাকুর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চিতা দেখছেন। সার সার জ্বলছে। কী দেখলেন, সে-কথা পরে বললেন মথুরবাবুকে। আমি মুখস্থ করে রেখেছি তাঁর জীবনী থেকে, মাঝে মাঝে নিজেকে শোনাই।'

মাস্টারমশাই কিছুক্ষণ নিজের ভাবে বসে থেকে সেই অংশটি শোনালেন : আমারও মুখস্থ।

'দেখিলাম পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী দীর্ঘাকার এক শ্বেতকায় পুরুষ গম্ভীর পদবিক্ষেপে শ্মশানে প্রত্যেক চিতার পার্শ্বে আগমন করিতেছেন এবং প্রত্যেক দেহীকে সযত্নে উত্তোলন করিয়া তাহার কর্ণে তারক-ব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করিতেছেন। সর্বশক্তিময়ী শ্রীশ্রীজগদম্বাও স্বয়ং মহাকালীরূপে জীবনের অপর পার্শ্বে সেই চিতার ওপর বসিয়া তাহার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি সকল প্রকার সংস্কার-বন্ধন খুলিয়া দিতেছেন এবং নির্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করিতেছেন।'

এই শ্মশানে এসে হিমাংশুবাবুকে চিনেছিলাম। বিরাট এক সাধক। সংসার তাঁর জীবনের করুণ এক দুর্ঘটনা। অনেক চেষ্টা করেছিলেন সংসারী হওয়ার। পারেননি। চাকরি গেল। সংগীতের আসরে কেউ ডাকলে না। ছাত্র-ছাত্রীদের এমন গুরুকে পছন্দ হল না, যাঁর নাম নেই, প্রচার নেই, গ্ল্যামার নেই। ভাইরা সাহায্য করার ভয়ে আলাদা করে দিলে। অর্ধাহার, অনাহারে দিন কাটে। ছেলেটি বিগড়ে গেল, মেয়েটির লেখা, পড়া, বিয়ে কিছুই হল না। বউদি চলে গেলেন ক্যানসারে।

তাঁর চলে যাওয়ার রাতটা আজও আমার মনে আছে। রীতিমতো সুন্দরী ছিলেন। বহুলোক, বিশেষ করে হিমাংশুবাবুর আত্মীয়-স্বজনেরা আমার খুব বদনাম করতেন। আমার মতলব খুব খারাপ। মা আর মেয়ে দু-জনকেই ভোগ করছি। ব্যঙ্গ করে আমার নাম রেখেছিল, ঝাঁপতাল। বলত, ফাঁকতালে ঝাঁপতাল মারছি। এর বেশি তাদের আর কিছু করার ছিল না। বউদির ক্যানসার হয়েছিল লিভারে। সেই প্রাচীন রূপকটি আজও কত সত্য! মাকড়সা আর ব্যাধি নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করে নিলে কে কোথায় আশ্রয় নেবে। মাকড়শা বললে, আমার একটু বড়সড় জায়গা চাই, ঝুল তৈরি করতে হবে তো, আমি রাজবাড়িতে যাই! অসুখ বললে, ঠিক আছে যাও, আমার আশ্রয় তো ইট-কাঠ-পাথরের বাড়ি নয়, আমার আশ্রয় রক্ত-মাংসের খাঁচা। মাকড়সা রাজপ্রাসাদে গিয়ে জাল বোনে, আর শত শত ভৃত্য রোজই ঝুল-ঝাড়ু দিয়ে সেই জাল লুটে নিয়ে যায়। এদিকে ব্যাধি আশ্রয় নিয়েছে খেটে-খাওয়া গরিব এক রমণীর শরীরে। অসুখ ভেবেছিল, কত কাণ্ডই না হবে! ডাক্তার-বদ্যি আসবে, ভাল-ভাল, দামী-দামী ওষুধ খাওয়াবে। কোথায় কি! সেই পানাপুকুরে চান, পান্তাভাত, সেই হাড়ভাঙা পরিশ্রম। পাত্তাই দিচ্ছে না! তখন মাকড়সা আর ব্যাধি জায়গা বদল করলে। ও এল গরিবের আটচালায়, এ গেল রাজবাড়িতে। গরিবের কুঁড়েতে ঝুলের সমাদর। তুমিও ঝোলো, আমিও ঝুলি। রাজপুরুষদের শরীরে অসুখের মহা খাতির। ডাক্তার, বদ্যি, ওষুধ-পথ্য।

বউদি প্রথমটায় পাত্তাই দিলেন না। অম্বল, বদহজম, অমন কতই হয়! যার হাঁড়ি চড়ে না তার আবার ডাক্তার-বদ্যি। একটা বছর টোটকা। আস্তে আস্তে পেট ফুলছে। নোংরা লোকগুলো বলতে লাগল, পাপ কি আর চাপা থাকে, বিশেষ করে এইসব পাপ! আরও অশ্লীল ভাষায় বলেছিল, যার অর্থ দাঁড়ায়, উত্তেজনার মুহূর্তে আবরণী ফেটে যায়, অথবা ব্যবহার করার কথা মনে থাকে না। তিনটেই তো উপোসী ছারপোকা।

তিনটের লক্ষ্য, কে, কে! এক নম্বর আমি, দু'নম্বর বউদি, তিন নম্বর তাঁর মেয়ে। একটা পরিবারের অত সেবা কি বিনা প্রসাদে হয় বাবা! আরও অশ্লীল ইঙ্গিত—পাঁউরুটির লোভেই কুকুর ন্যাজ নাড়ে। এইখানেই শেষ নয়, এইসব ইতরজনেরা আরও এক ধাপ এগোলেন। হিতাকাঙ্ক্ষী যেন কতই— 'হ্যাঁ গো, কোথায় হবে, নার্সিং হোমে না হাসপাতালে। হাসপাতালে হলে আগেই নাম লেখানো আছ তো!'

দেখতে দেখতে পা ফুলে গেল। দেহ রক্তশূন্য। অবশেষে নিয়ে গেলুম বড় এক ডাক্তারের কাছে। দেখে বললেন, 'করেছেন কি?' আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'কিছুই করার নেই। লিভার ক্যানসার।' সব শুনে হিমাংশুবাবু বললেন, 'ভালই হয়েছে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মুক্তির একমাত্র পথ। আমি জেলার, আমি কংস। তালা খোলার চাবি আমার কাছে ছিল না। বসুদেব এসেছেন

ক্যানসার হয়ে।' বসে রইলেন চুপ করে। শুরু হল আত্মীয়স্বজনদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। 'তানপুরা ঘাড়ে নিয়েই ভাবলে তানসেন হয়ে গেছি। রোজগারের মুরোদ নেই সংসার! ব্যাটা পাষণ্ড! চোখ বুজিয়ে সারাদিন সুর ভাঁজছে! গলা দিয়ে সুর বেরোয় না। গান গাইছে না ডিঙ্গি বাইছে!' একদিন বলেই ফেললুম, 'তোমরা ইতিহাস জান না, জানলে এসব কথা বলতে না। এককালে হিমাংশুবাবু ছাড়া ফাংশান হত না। সংগীতের জগতের দলাদলি আর নোংরামিতে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন।' পালটা আক্রমণ হল, 'কোন কালে? কালিদাসের কালে? ঢুকলেন কবে যে বেরোলেন!'

বউদি মারা যাওয়ার আধঘণ্টা আগে আমার হাত দুটো ধরে বলেছিলেন, 'তুমি ওকে একটু দেখ, বালকের মতো নিরীহ মানুষ, সুরপাগল। জগৎ-সংসারের কিছুই বোঝে না। আর ওই অসহায় মেয়েটা রইল।' এইটুকু বলার পরই যন্ত্রণার আর্তনাদ। তারপরেই শেষ। তারপরেই প্রশান্ত মুখচ্ছবি। সব যন্ত্রণার অবসান।

শ্মশান থেকে বাড়ি সামান্যই পথ। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটি। তৃষা! রাস্তায় আলো জ্বলে না। বিশ্রী রকমের স্যাঁতসেঁতে একটা অন্ধকার। একটানা দুটি বছর দু'হাতে বাবাকে সেবা করে করে আজ ভারমুক্ত। এতদিন একটা কর্তব্য নিয়ে ছিলে টান ধনুকের মতো হয়েছিল, আজ একবারে নেতিয়ে পড়েছে। বিশ্বসংসারে কেউ নেই। একটি মাত্র ভাই বিয়ে করে বহুদিন আলাদা। একবারও আসে না, আজও আসেনি।

—এখানে দাঁড়িয়ে কেন, চলো, ভেতরে চলো।

তৃষা এই আহ্বানটুকুর অপেক্ষায় ছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ভেতরে যেতে বললেও আমি জানি ভেতর বলে কিছু নেই। হিমাংশুবাবুর এই বিষয়-সম্পত্তির বহু শরিক। তৃষার এখানে স্থান হবে না। আজ হোক কাল হোক, পথে তাকে নামতেই হবে। মায়ের মতোই রূপসী ছিল। এখন সে রূপের কিছুই নেই। শীর্ণ হয়ে গেছে। মুখের লাবণ্য ঘুচে গেছে। বাবার মতোই মৃত্যু স্বভাবের মেয়ে। দন্তুর পৃথিবী আর একা এই মেয়েটি মুখোমুখি।

ঘরে বিশাল খাটটিতে শূন্যতার হাহাকার। মাস্টারমশাইয়ের শেষ সিল্কের পাঞ্জাবীটি হ্যাঙারে ঝুলছে। দেওয়ালে বউদির যৌবনবেলার ছবি। ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে বিখ্যাত সেই তম্বুরাটি। কয়েকদিন আগে পাঁচ কেজি সরু চাল, দু-কেজি মুগের ডাল, তেল আর আলু কিনে দিয়েছিলুম। হয়ত আছে।

চায়ের ইচ্ছা হচ্ছে। জানি যোগাড় নেই।

তৃষা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। সব গেছে, মায়ের মতো চুলের ঢলটি ঠিক আছে। আমি একটা ভাঙা চেয়ারে বসে আছি। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে! দূরে একটা বাড়িতে টিভি চলছে। পর্দায় আলো লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে।

তৃষা হঠাৎ বললে, 'আমাব কি হবে?'

বড় অসহায়, বড় করুণ শোনাল তার গলা। কি হবে? কে জবাব দেবে? আমারই বা কি হয়েছে! কতকিছুই তো হওয়ার ছিল! কিছুই হয়নি। কোনোরকমে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। মনে মনে বললুম, আমার ফুটো নৌকোর যাত্রী হবে তৃষা! তোমাকে বাঁচাতে না পারি, তোমার সঙ্গে মরার একজন সঙ্গী দিতে পারি।

মুখে বললুম, 'কেটলিটা দাও, চা আনি।'

তৃষা বললে, 'ঠিক দু'দিন হল।'

—কি হল?

—উপোস।

রাস্তার কোলাহলে পা রাখতেই কানে বাজল মাস্টারমশাইয়ের শেষ কথা, 'তৃষিত, আমি চলে যাবার পরেও কনসার্ট চলবে।' ফিরে আসছি, অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে উঠছি, হঠাৎ মনে হল, একটা কেটলি, দু'কাপ চা! তৃষা! উত্তর পেয়ে গেছি!

জাল

বাঁ-পাশে নদী। নদীটার সুন্দর একটা নাম। কে রেখেছিল, কবে রেখেছিল কেউ বলতে পারবে না। তারা নেই, নদীটা আছে। নদীর নাম ঝুমকি। ডান পাশ দিয়ে পথ চলে গেছে বরাবর। আর একটু পরেই সন্ধে হবে। আমি হাঁটছি। শীত-শীত বাতাস। শীত আসতে আর দেরী নেই।

এদিকটায় লোকজনের তেমন বসতিও নেই। শহরের বাইরে। স্টেশান অনেক দূরে। দুপুর-দুপুরেই আসার কথা ছিল। ট্রেনটা এত লেট করল, যে বেলা শেষ হয়ে এল। শীতের বেলা ঝপ করে শেষ হয়ে যায়। ইচ্ছে করেই হাঁটছি কারণ, এই পথটা আমার স্মৃতির পথ। এই পথে ছোট ছোট নুড়ির মতো পড়ে আছে আমার অতীত জীবন। যে জীবন নিয়ে কেউ কোনওদিন ইতিহাস লিখবে না। স্ট্যাচু করে মালা পরাবে না গলায়।

এই শহরে আমার বাবা ছিলেন মস্ত এক মানুষ। মিশনারি স্কুলের নামকরা প্রিন্সিপাল। আমাদের সুন্দর একটা বাংলো ছিল। সুখের সংসার ছিল সুন্দর। আমার মা ছিলেন ভারি মিষ্টি। আমার বয়েস যখন ছয় কী সাত, তখন এক বছরের মধ্যেই বাবা আর মা দু'জনেই মারা গেলেন।

এই নদীর নাম ঝুমকি। এই নদী বলতে পারবে, জীবন কেন চলে যায়! কেউ কেউ পৃথিবীতে এসে কেনই কেবল দুঃখ পায়। আমি বলতে পারব না। মানুষের চোখ দুটো সামনে, সে কেবল আগতকেই দেখবে, বিগতকে দেখতে পাবে না। কেন এল, কি নিয়ে এল, কি পেতে এল, প্রশ্ন আছে, জবাব নেই। সন্ধান আছে, প্রাপ্তি নেই!

ঝুমকির একেবারে কিনারায় সেই কুঠিয়া। ওখানে একজন থাকে, যাকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি। তার সাধুর মতো জীবন, জীবিকা কিন্তু মাছ ধরা। তার কেউ নেই, কিন্তু আমার মতো 'কেউ নেই, কেউ নেই' বলে মন খারাপ করে জীবনটাকে বরবাদ করতে চায় না। সে বলে, আমার নদী আছে। সে আমার মেয়ে ঝুমকি। সে বলে, আমার কত গাছ আছে, কত বড় বড় মাঠ আছে। আমার একটা ছোট্ট পাহাড় আছে। রাতে আমি তারাদের মালিক, পনেরো দিনের জন্যে আমার সঙ্গে গল্প করতে আসে আমার সেই ছেলেবেলার চাঁদমামা। কী বলো তুমি, আমার কেউ নেই! এরা তো তোমারও। তুমি কেবল নেই, নেই করেই গেলে।

সে আমার ললিতদা।

কুঠিয়ার সামনেটা ফাঁকা। ঘুরে পেছন দিকে গেলুম। একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে আছে সে। জাল বুনছে একমনে আর গান গাইছে গুনগুন করে। যখন যা মনে আসে সেইটাকেই গানে পেলে সুর চড়িয়ে দেয়।

আমার দিকে চোখ না তুলেই বললে, 'অনেকদিন পরে এলে?'

'অনেক চেষ্টায় একটা চাকরি পেয়েছি।'

'কী চাকরি?'

'রংকলে।'

'বাঃ, খুব ভাল কথা। রং? সে তো খুব ভাল জিনিস! লাল, নীল, হলদে, সবুজ! তাহলে খুব আনন্দে আছ বলো?'

'আট ঘণ্টা ডিউটি, আর রঙের গন্ধে বুকটা কেমন করে! রাত্তিরে মাথা ধরে।'

'সে আর কী করবে, তুমি যদি সাধ করে শহর চাও, শহর তোমাকে জ্বালা দেবে। আমার মতো মাছ ধর, আরামে থাকবে। নদীর মিষ্টি গন্ধ। আমি যে রুপোর কারবারী আর তুমি হলে রূপের!'

'রুপোর কারবারী মানে?'

'মাছ কী তুমি দেখো নি! রুপোর তবক মোড়া মাছ।'

'আমি কী মাছ ধরতে জানি?'

'ওর আর আবার জানাজানি কী! কোমর জলে নামবে, জালখানি ঘুরিয়ে ফেলে দেবে জলে, তারপর টানবে। টানতে টানতে আনবে কোলের কাছে। তিন খেপ মারলেই একটা লোকের পেট চলে যাবে। তবে তুমি যদি খুব ভাল খেতে চাও, আবার যদি মদ খেতে চাও, কাপ্তেনি করতে চাও, আবার যদি মেয়েছেলে চাও, তাহলে তোমাকে যন্ত্রের কাছে যেতে হবে, তোমার বুক চেপে ধরবে, মাথা ধরবে, তুমি কত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাবে! চার দেয়ালের খাঁচায় তুমি মরার আগেই মরে যাবে, ভূত হয়ে বেঁচে থাকবে। তা, সে তোমার ব্যাপার। কী মনে করে এলে! দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ ভালই আছ হে!'

'তুমি তো জানো, এখানে আমার নাড়ির টান। আমি যে এইবার বিয়ে করব। সংসার করব। একটা কপালে একটা সোনালি টিপ, একটা নাকে পাথর বসানো একটা নাকছবি, দু-চোখে কালোজলের টলটলে দীঘি, সেখানে তোমার চাঁদ সাঁতার কাটতে নামবে পূর্ণিমার রাত্তিরে।'

'সে কে? শুনি তো সে কে?'

'তাকে তুমি দেখেছ। সে এখানেই থাকে। ওই চার্চের অরফ্যানেজে।'

'নাম কী তার?'

'ডোনা।'

'সে তো খুব ভাল মেয়ে। আমার কাছে আসে। এই তো সেদিন চাঁদের আলোয় আমাদের ফিস্ট হল। আমরা দুজনে। খুব ভাল রাঁধে তো। তবে তোমাকে বলে রাখি, আমার মতো কেউ রুটি তৈরি করতে পারবে না। একেবারে তুলো। আচ্ছা তুমিই বল, আমি যদি ওকে মশলাটা ওইভাবে পিষে না দিতুম তাহলে মাংসটা কী অত ভাল হত! শোনো, অহংকার মোটেই ভাল না।

আমার মশলাটা যদি ভাল না হত তাহলে ডোনা কী করত। এ-কথা আমি অস্বীকার করছি না যে ডোনা ভাল রাঁধে না, তবে কী জান, আমার মতো খিচুড়ি কেউ রাঁধতে পারবে না। ডোনাকে এ-কথাটা তুমি বলতে পার, তবে আগের কথাগুলো না বলাই ভাল, কেন জান, অহংকার করা ভাল নয়। কিসের অহংকার, তবে এ-কথা ঠিক, ডোনার মতো টোম্যাটোর চাটনি কারও ক্ষমতা নেই করে। তুমি ডোনাকে এখন বিয়ে করতে যাচ্ছ? আমাব কাছ থেকে মেয়েটাকে কেড়ে নেবে! ও তো মেয়ে নয়, ও নদী, ও পাখি, ও গাছ, আকাশ, বাতাস, তারা।'

'ফাদার আমাকে বলেছিলেন, যেদিন তুমি একটা চাকরি পাবে, যেদিন তুমি প্রমাণ করতে পারবে, তুমি তোমার রোজগারে সংসার চালাতে পারবে, সেইদিন তোমার হাতে ডোনাকে তুলে দেব। আমি সেই প্রমাণ দাখিল করতে এসেছি।'

'ফাদার ডেভিসের কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'ওই ফাদার তো ভগবান। সেবার আমার অসুখ করেছিল। করতেই পারে। শরীর থাকলেই করবে। এতে তো লজ্জার কিছু নেই। আমার কিন্তু খুব লজ্জা করেছিল, ফাদার তিন দিন, তিন রাত সমানে আমার সেবা করেছিলেম, ডোনাও ছিল। ডোনা তো থাকবেই, সে যে আমার বন্ধু। ফাদার শুধু তোমার ওই চার্চের ফাদার নন, আমার ফাদার। আমি যে এখন কী করি! মাঝে মাঝে মনে হয়, এই নদীটা ফাদরাকে দিয়ে দি, ওই পাহাড়টাও, শালের জঙ্গলটাও। তুমি বিয়ে করে ডোনাকে কোথায় নিয়ে যাবে?'

'কলকাতার কাছেই একটা জায়গায়।'

'ও তো এখানে একটা চাকরি পেয়েছে।'

'চাকরি পেয়েছে?'

'হ্যাঁ, চাকরি।'

'তাহলে দেখি কী হয়।'

'দেখিটেখি নয়, তুমি বিয়েও করবে, চাকরিও ছাড়াবে, তা কী করে হয়, দোনো এক সাথ! যাঃ, আমি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি। সেই কোন ছেলেবেলা থেকে তোমাদের প্রেম।'

'আমিও অরফ্যান, ও-ও অরফ্যান।'

'বাজে কথা বলিসনি। শোন, এই কুঠিয়াটা আমি তোকে দান করে দিচ্ছি, এইখানে থাক। এই নতুন জালটা তোকে দিয়ে দেব। দেখ, মাছধরা আমার জীবিকা ছিল না, আমি শিখেছি নদীর কাছে থাকব বলে। কোথায় ছিল আমার দেশ! কেউ জানে না। হঠাৎ এসে গেছি, হঠাৎ পেয়ে গেছি জীবন। শহর কিন্তু ডোনার জন্যে নয়। ডোনা হল নদীর মেয়ে! শহরে গেলে ও নষ্ট হয়ে যাবে।

শুনেছি, সেখানে লম্পট বড়লোক আর গুণ্ডারা থাকে। সেখানে মানুষের হৃদয় নেই, মনে প্রেম নেই, চোখে জল নেই। শহর হল শয়তানের। গ্রামকে ফুসলে নিয়ে গেছে বেশ্যা শহর করবে বলে। ওখানে এমন একটা নদী পাবে!'

'কেন, আমাদের অত বড় নদী, গঙ্গা!'

'ওটা আর নদী নেই, কলকারখানা, আর তোমাদের শহরের নোংরা জলের নর্দমা।'

ললিতদা আবার জাল বুনতে লাগল। অন্ধকার নেমে গেছে। অভ্যাসে হাত চলছে। ঘরের ভেতর কাঠের টেবিলে সোনার জলে লেখা বাইবেল, তার ওপর একটা ক্রুশ। ক্রুশটা মাথায় আর বুকে ঠেকালুম। মনে মনে বললুম—Lord, I believe, help thou mine unbelief!

ললিতদা বললে, 'লণ্ঠনটা জ্বেলে দে, পাশেই দেশলাই আছে।'

লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে টেবিলে রাখলুম। অন্ধকার ঘন হলে এই আলোটাই জোর হবে।

'আমি তাহলে আসছি। ঘুরে আবার আসব।'

'রাতটা থাকবি?'

'তা না হলে যাব কোথায়?'

'তাহলে খিচুড়ি চাপাই।'

'চাপাও। এতটা হেঁটে খুব খিদে পেয়েছে।'

বিশাল একটা গেট। পুরো খোলা। ও, আজ যে শুক্রবার। চার্চে প্রেয়ার হচ্ছে। আলো জ্বলছে। জেনারেটারের শব্দ। লাল সুরকির চওড়া পথ, দু-পাশে বাগান রেখে সোজা এগিয়ে গেছে ভেতরে। অনেকটা দূরে সাদা ঝকঝকে একটা মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে। বিদেশ থেকে বড় কেউ এসেছেন। সবাই প্রেয়ারে। বাইরেটা একেবারে ফাঁকা। কোথাও চাঁপা ফুল ফুটেছে। ভীষণ গন্ধ। গন্ধের সঙ্গে ভালবাসার খুব যোগ। ভালবাসার সঙ্গে কোমল একটা শরীরের, পায়রার মতো নরম বুকের, ঝকঝকে কালো মণির মতো দুটো চোখের, ফুলফুল একটা স্কার্টের, ভরাট বুকে সাদা একটা ব্লাউজের।

হলে ঢুকতেই প্রেয়ারের সুরে ভেসে গেলুম। অরগ্যান বাজাচ্ছেন বৃদ্ধ ফাদার ডেভিস। নানেরা সব সাদা হুড পরে দাঁড়িয়ে আছেন। লম্বা লম্বা জানলায় টিন্টেড গ্লাস। সোনার জলে ছবি আঁকা। আলো পড়ে ঝকঝক করছে। চোখের অনুসন্ধান ডোনাকে। কোথায় সে! ওই তো পালপিটের সামনে। মনে হল, ছুটে যাই, উড়ে যাই। সে তো উপায় নেই।

'মাস' শেষ হল এক সময়। অরগ্যানের সুর, সমবেত প্রার্থনা, সমাবেশ,

আলো, বাতি, খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ প্রলম্বিত মূর্তি, সব মিলেমিশে মনটা বেশ ভরে গেল। মনে হল, এই সুন্দরের এলাকায় চিরকাল যদি থাকা যেত। শহরের ঘুপচি এলাকা, সদা ব্যস্ত মানুষের খুণ্ডযুদ্ধ, রংকলের রোলার ড্রামের ভেতর পোর্সিলেন বলের অনবরত শব্দ, থিনারের গন্ধ, মাসের শেষে সামান্য ক'টা টাকার জন্যে হাত পেতে দাঁড়ান! সুখের চেয়ে যন্ত্রণা বেশি। স্বপ্ন কোথায়, সবই তো দুঃস্বপ্ন।

সিস্টাররা একে একে বেরিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকেই বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে আছেন বাইবেল আর ক্রুশ। পোশাকের খশখশ শব্দ। পালপিটে অরগ্যানের সামনে বৃদ্ধ ফাদার ডেভিস।

খুব আস্তে কথা বলেন, বাতাসের সুরে। আমাকে সামনে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। সামনে একটু ঝুঁকে আছেন।

'ব্লেসিংস মাই সন! কেমন আছ তুমি?'

'প্রভুর আশীর্বাদে ভালই আছি ফাদার! আই হ্যাভ গট এ জব। ফাদার! আপনি কেমন আছেন?'

'আই অ্যাম অলওয়েজ উইথ মাই লর্ড।'

'ফাদার! আপনি বলেছিলেন...'

'ইয়েস, আই নো, বাট শংকর, আই হ্যাভ সামথিং... না, এখানে নয়, আমার কটেজে চল, তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই।'

সুরকি ঢালা পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে একেবারে পেছনের দিকে। শেষ হয়েছে ঝুমকি নদীর কিনারায়। চার্চ কম্পাউন্ডের পাঁচিল। পাঁচিলের পরেই ঢালু পাড়। পাড় ছুঁয়ে কুলুকুলু বইছে নদী। ওদিকে ছোট্ট একটা গেট আছে। সেই গেট খুলে নদীতে নামা যায়।

সাদা গাউন পরে ফাদার হাঁটছেন আগে আগে। আমি পেছনে। কেউ কোনও কথা বলছি না, নিস্তব্ধতা ভেঙে যাওয়ার ভয়ে। মাঝে মাঝে শুকনো পাতায় পা পড়লে সামান্য মচ্‌মচ্‌ শব্দ। পথ যেন আর ফুরোয় না।

ফাদারের কটেজের বাইরে একটা ঢাকা বারান্দা। গোটা কতক বেতের চেয়ার-টেবিল, নিখুঁত সাজান। ঘরের দরজায় নেটের পর্দা। ভেতরে মৃদু আলো। বাইরে থেকে ভেতরটা মনে হচ্ছে স্বপ্ন।

ফাদার বললেন, 'বোসো, আগে কফি খাওয়া যাক।'

'আমি নিয়ে আসি!'

'না, তুমি বোসো। সব আমার হাতের কাছে আছে।'

ফাদার ঘরের ভেতর থেকে একটা ফ্লাস্ক আর দুটো কাপ নিয়ে এলেন। নিঃশব্দে কফিপান হল কিছুক্ষণ। হঠাৎ খুব মৃদু স্বরে ফাদার বললেন, 'আই হ্যাভ এ সিক্রেট ফর ইউ। একটা গোপন খবর! এতদিনে সেটা প্রকাশ পেল।'

‘কী খবর ফাদার!’

‘তুমি কী জানতে, তোমার বাবা আর মা দু’জনেই আত্মহত্যা করেছিলেন!’

‘মারা গিয়েছিলেন। আত্মহত্যা করেছিলেন বলে জানতুম না।’

‘ইয়েস, বোথ অফ দেম কমিটেড স্যুইসাইড, কেন জান?’

‘না ফাদার।’

‘ডোনা, তোমার বোন।’

‘আমার বোন! তা কেমন করে হয়! আমিই তো একমাত্র ছেলে!’

‘ওয়েট, দেয়ার ইজ এ লেটার। আমার হাতে এসেছে।’

ফাদার উঠে ঘরের ভেতর গেলেন। সেখান থেকে ডাকলেন, ‘শংকর, ভেতরে এসো।’

আমার হাতে একটা কাগজ দিলেন। কাগজটা পুরনো হয়েছে। কালির কালো রঙ লালচে হয়েছে। টেবিলল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়ে বললেন, ‘এইখানে বসে পড়ো।’

আমার হাত কাঁপছে। বুকের কাছটা কেমন করছে। পড়তে অসুবিধে হলেও পড়া যাচ্ছে—

‘পাপ করেছি আমি।’

‘কেন করেছি, তার কোনও ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই নি। হয় তো ওই রাতে শয়তান আমার ওপর ভর করেছিল। যা করা উচিত নয়, মুহূর্তের ভুলে তাই করেছি। ভেবেছিলুম, পার পেয়ে যাব, তা হয়নি। সে গর্ভবতী হল। আমার সন্তান সে ধারণ করল। সে খুব ভাল ছিল। আমাকে ভালবাসত। আমাকে ব্ল্যাকমেল করার ইচ্ছেও তার ছিল না। কিন্তু সেও ছিল পাপী।

মুহূর্তের ভুলের এই কলঙ্ক আমার স্ত্রী, আমার একমাত্র সন্তানকে যেন স্পর্শ না করে। আমার স্ত্রী আমার অবর্তমানে আমার সন্তানকে মানুষ করে তুলতে পারবে—এই বিশ্বাস আমার আছে। আমার পুত্রের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নৈতিক দিক থেকে আমি পতিত হলেও, শিক্ষায়, জ্ঞানে, আমার কিছু সুনাম ছিল। সেই উত্তরাধিকার আমি রেখে গেলুম। অর্থ, বিত্ত, এসব আমার কিছুই নেই।’

পড়া শেষ হল, ফাদারকে জিজ্ঞেস করলুম, ‘কে এই সে? কেমন করে বুঝলেন, ডোনা সেই মেয়ে?’

‘খুবই সঙ্গত প্রশ্ন তোমার। এই সে হল তোমার পিতার এক ছাত্রী। সম্প্রতি সে মারা গেছে। মৃত্যুর সময় আমি তার কাছে ছিলুম। সে আমাকে সব জানিয়ে গেছে। তোমার বাবার এই লেখাটা তার কাছেই ছিল, আমাকে দিয়ে গেছে। বলে গেছে, ডোনাকে যদি কেউ বিয়ে করে সে জানতে চাইবে, ডোনার বাবা কে, ডোনার মা কে!’

'আমি তো জানতে চাইনি ফাদার! আমি তো না জেনেই ভালবেসেছি, বিয়ে করে ঘর বাঁধতে চেয়েছি। আপনি বলেছিলেন, তুমি চাকরি পেলেই সব হবে।'

'তুমি যাকে বউ হিসেবে চাও, সে এখন তোমার বোন। এই তথ্যটা তো আমার তখন জানা ছিল না শংকর। তবে তোমার মা জানতেন।'

'মা কেন আত্মহত্যা করলেন?'

'এইটাকেই বলতে পার প্রেম, ট্রু লাভ। তোমার বাবা নেই, এটা তিনি সহ্য করতে পারলেন না।'

'আমি তাহলে তাঁর কেউ ছিলুম না!'

'মেডিকেল রিপোর্ট বলছে, তোমার মা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।'

'ডোনার মা তখন কোথায়?'

'মেয়েটাকে আমাদের ক্রেডলে ফেলে দিয়ে সে এখান থেকে চলে গিয়েছিল। লেখাপড়ায় খুবই ভাল ছিল। শি বিকেম এ রাইটার!'

'কী নাম?'

'অনুপমা বোস।'

'আমি তাঁর বই পড়েছি। তাঁর কাহিনী নিয়ে একটা সিনেমা হয়েছিল।'

'হোয়াটস্ দ্যাট?'

'দোলনা, সুপার হিট। সে তো তাহলে আমাদেরই কাহিনী।'

'আই হ্যাভ গট দি ইংলিশ ট্রানস্লেশান পাবলিশড ইন ব্রিটেন।'

'আমার এই মা তো তাহলে বিরাট লেখিকা ছিলেন!'

'অফ কোর্স!'

'কী ভাবে মারা গেলেন?'

'অ্যাকসিডেন্ট।'

'ফাদার! এঁরা এমন করলেন কেন? আমার বাবা বিয়ে করতে পারতেন?'

'তাহলে তো সবই সোজা হয়ে যেত। নদী তো সোজাই চলতে পারে, কেন হঠাৎ বাঁক নেয়, কোর্স চেঞ্জ করে, কূল ভাঙে, কূল গড়ে। হোয়াই! দ্যাট ইজ ফেট। দ্যাট ইজ ডেসটিনি। শংকর! আমাদের প্রভু বলে গেছেন—Be sure your Sin will find you out। তিনি আরও কী বলেছেন! আমাদের পিতারা খেয়েছেন টক আঙুর, তাই ছেলেদের দাঁত টকে আছে। The fathers have eaten sour grapes, and the childrens teeth are set on edge। তোমার পিতা সাময়িক হলেও কামার্ত হয়েছিলেন, তিনি স্বভাব-পাপী হলে এই পদস্খলনে কিছুই হত না, কিন্তু তিনি ছিলেন মানী, জ্ঞানী, কর্তব্যপরায়ণ। আর তোমার মা আর ডোনার মা—দু'জনেই সমান, দু'জনেই সন্তানকে পরিত্যাগ করেছিল, তাই মৃত্যু তাদের তাড়া করল, পাপের বেতন মৃত্যু। তুমি কী ডোনার সঙ্গে দেখা করবে!'

'না ফাদার, আমিও পাপ করেছি, I confess, তবে না জেনে। আমি জানতুম তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তাই তিন বছর আগে এক্সমাসের সময় আমি তাকে স্পর্শ করেছিলুম, পাপ করেছিলুম পুণ্য করছি ভেবে। পিতার রক্ত আমারও শরীরে আছে। The wages of sin is death'।

'যা হয়ে গেছে গেছে। Past is past, নতুন বর্তমান তৈরি কর।'

'ফাদার, বাইবেল আমার নিত্যসঙ্গী, জেরেমিআয় আছে– Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots। ইথিওপিয়ার মানুষ চামড়ার রং পাল্টাতে পারবে? চিতা বাঘ মুছে ফেলতে পারবে তার গায়ের স্পট? আমি যাই ফাদার?'

'এই রাতে যাবে কোথায়?'

'আমার একটা জায়গা আছে কাছেই।'

'The grace of our Lord Jesus Christ be with you all Amen'।

একটা কালো কুকুর আমার পেছন পেছন এল ললিতদার চালা পর্যন্ত। যেমন এল হঠাৎ দেখি নেই। গা'টা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। স্পিরিট, আত্মা, কার আত্মা! ললিতদা গান গাইছে, আর খিচুড়ির হাঁড়িতে হাতা মারছে। আমাকে দেখে বললে, 'ব্রাদার! আজ খুব কেয়ার নিয়ে রাঁধছি। গানটা শুনলে, বোম্বাইসে আয়া মেরা...।'

এতক্ষণ শক্ত ছিলুম, এইবার হঠাৎ কেঁদে ফেললুম। ললিতদা উঠে এল, 'কী হয়েছে দোস্ত!'

'যে আমার বউ হবে সে আমার বোন। এখন তার আর বোন হওয়ারও উপায় নেই, আমি তাকে বউয়ের মতো আদর করে এসেছি এতদিন। একদিন চরম আদরও করেছি।'

'কিছুই বোঝা গেল না।'

খেতে খেতে সব কথা ললিতদাকে বলে ভেতরটা একটু হালকা হয়েছে। দু'জনে বসেছি ঝুমকির ধারে। অন্ধকারে বইছে নদী। আকাশের গায়ে থেবড়ে আছে চুরালিয়া হিলস। চার্চের বিরাট চূড়া স্তব্ধ হয়ে আছে দিনের প্রতীক্ষায়। বিরাট ঘণ্টা যেন মৃত্যুর ঘোষণা।

ললিতদা অন্ধকারে হেসে উঠল, 'আমি তোর চেয়ে অনেক অনেক বেশি চালাক শংকর। মানুষের সংসারের একপাশে আছি, ভেতরে ঢুকিনি। তোকে আমি বার বার বলছি, এখনও সময় আছে, নদীকে বন্ধু কর। ফিরে তাকায় না, থেমে থাকে না। চলেই যায়, চলেই যায়, সামনে কেবল সামনে! একই জলে দু'বার চান করা যায় না। নদী হল সময়। ধুয়ে ধুয়ে নিয়ে গেল আমার চল্লিশটা বছর, আমার যত সুখ, যত দুঃখ। নদী আমার মা, নদী আমার মেয়ে, নদী

আমার প্রেমিকা। জাল দিয়ে মাছ ধরি, কথা বলি, যাকে ভাল লাগে তাকে মুক্তি দি। যাদের ভাল লাগে না পাঠিয়ে দি মানুষের ভোগে। আমি ভগবান যদিও আমার নাম ললিত গোমেজ।'

খশ্ করে একটা শব্দ হল। ললিতদা বললে, 'কে, কে ওখানে!'

অন্ধকার নড়ছে, অন্ধকার চলছে, এগিয়ে আসছে। কালো চাদর জড়ানো একটা মূর্তি, 'চুপ্, আমি ডোনা। পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।'

ডোনা ঝাঁপিয়ে আমরা বুকে এসে পড়ল, 'দাদা! তুই আমার দাদা। স্বামীর চেয়ে অনেক ভাল। আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে চল।'

চার্চের বিরাট ঘণ্টাটা একবার ঢং করে উঠল। বোধ হয় বাদুড় ঢুকেছে ঘণ্টা-ঘরে। তিন বছর আগের সেই রাত। ডোনা আমার আলিঙ্গনে। সে রাতে প্রেমের সঙ্গে কাম ছিল, আজ শুধুই প্রেম। তাই এত ভাল লাগছে, চোখে জল আসছে। নিজের রক্ত খুঁজে পেয়েছি। দাদার মধ্যে তো বাবাও থাকে!

আমাদের সংবেতেই ফাঁকি। এর জন্যে দায়ী ইলেকট্রিসিটি। বিদ্যুতের আবিষ্কার আর তার জনমুখী ব্যবহার চালু হওয়ার পর থেকে ফাঁকিবাজি আরও বেড়ে গেল।

কি রকম?

সুইচ টিপলুম, পটাস করে জ্বলে গেল আলো। সুইচ মারা মাত্রই পাম্পের গর্জন, ছাদের ট্যাঙ্ক ভরে গেল। চিমনি পরিষ্কার, পলতে কাটা, তেল ভরার বালাই নেই। আলোটিকে সাবধানে রেখে, যাতে দমকা বাতাস না লাগে, কাছে সরে এসে, আলোর বৃত্তে বইখানি খুলে নিবিষ্ট অধ্যয়ন, আলোর বাইরে ছায়ান্ধকার, তারপর নিবিড় অন্ধকারের এলাকা। রাত বাড়ছে, চিমনিতে দীপের রাত্রি জাগরণের কালিমাও বাড়ছে। এই যে তিনটি বৃত্ত, আলো, ছায়ান্ধকার, ঘোর অন্ধকার, এই তো আমাদের মন। জানি না, অল্প আভাস, পূর্ণ প্রকাশ। আলো থেকে অনেক দূরে, অর্থাৎ অজ্ঞান, অল্প দূরে, অর্থাৎ আভাস, রয়েছে কি সব, তেমন স্পষ্ট নয়, আলোর সন্নিকটে উদ্ভাস, অতঃপর নিবেশ—নিবিষ্ট—জ্ঞান। বোতাম টেপা আলোর জীবনের সান্ধ্য চিত্রটা এইরকমই ছিল। প্রথমে আলোর যত্ন, সাধুর নিত্য লোটা মাজার মতো কাঁচের চিমনি পরিষ্কার করা, আলোর রাতের পরমায়ু তেল ভরা, পলতেটিকে গোল করে কাটা, সামান্য গোলযোগে শিখা তেড়াবাঁকা হয়ে যাবে। এটি যেন আলোর অ, আ, ক, খ। মন যদি পলতের মতো গোল না হয়, তাহলে জ্ঞানের আলোও ছেতরে যায়। অতঃপর আলোর বৃত্ত জ্ঞানের সাধককে টেনে আনবে একপাশে। মন নিবিষ্ট হবে, আঁধারে ঢাকা থাকবে যাবতীয় অন্য বিভ্রান্তি। সেসব থেকেও থাকবে না। রাত যত প্রভাতের দিকে যাবে, আলো পাণ্ডুর হবে। উষা এসে অন্ধকারের গলায় রবির কিরণমালা পরাবে। উষালগ্নে প্রতিদিন এই অদ্ভুত, অলৌকিক বিবাহ! আলো এসে অন্ধকারকে বরণ করে নেয়। ঠাকুরের সেই কথা—অবিদ্যামায়াকে বিদ্যামায়ায় রূপান্তরিত করে নাও। আলোর বুকে, শিবের বুকে, অন্ধকারের, শ্যামার নৃত্য সাক্ষাৎ সত্য, সংগ্রাম নয় সমর্পণ। দূর থেকে দেখলে আলোও কালো! জ্ঞান থেকে দূরে—এক দর্শন, জ্ঞানের কাছে– আর এক দর্শন। ঠাকুর বললেন, দূর থেকে দেখি, তাই সমুদ্র নীল, দূর থেকে দেখি, তাই ভুবনমোহিনী, জ্যোতির্ময়ী জগদম্বা কালো। কাছে গেলে, শিব, শক্তি অভেদ। এইবার জ্ঞানের পারে যাও, আলোও নেই, কালোও নেই।

ঠাকুর কত অদ্ভুত, কত সহজ। বিভাগ করছেন– জ্ঞান আর চৈতন্য। জ্ঞানের পারে গেলেই চৈতন্য। সসীম থেকে অসীমকে দেখা, আবার অসীম থেকে সসীমকে দেখা। আমার দেহবোধ রয়েছে, দিন, রাত, জন্ম, মৃত্যু দেখছি। স্থান, কালের বোধ আছে। টনটনে 'আমি' রয়েছে একটা। আমি একটা তুমি একটা বিভাজন রয়েছে স্পষ্ট। তখন 'নেতি, নেতি' করে এগোচ্ছি সত্যের দিকে।

শাশ্বতের দিকে। তিনি কেমন? শ্রীভগবান গীতায় বলে দিলেন,

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

পৃথিবীর দৃশ্যমান জগতের এক একটাকে ধরছি। এটা নিত্য, এটা, এটাও না? কোনোটাই অজ, নিত্য, শ্বাশত ও পুরাণ নয়। আমি সেই বস্তুকে চাই, যা অজ, জন্মরহিত, নিত্য, ত্রিকালে পরিণামশূন্য, শাশ্বত, অপক্ষয়শূন্য ও পুরাণ, পরিণামশূন্য। এগোতে এগোতে যখন প্রায় হতাশ, সবই তো চলে যায়। হু হু শব্দে বর্তমান চলেছে অতীতে, ভবিষ্যৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বর্তমানের বুকে। অনুক্ষণ এই তাণ্ডবে বসবাস। বাউলের দল এল, খানিক নাচাগানা হল। চলে গেল। পড়ে রইল ভাঙা উনুন, পোড়া কাঠ। আবার এল একদল।

ঠাকুর বলছেন, অস্তিত্বের এই বহমানতা চোখে পড়াটাই উদয়, জ্ঞানের উদয়। যার পরেই প্রশ্ন আসবে—'কে ঠেলছে?' কে কে ঠেলে ঠেলে কাঠ গুঁজছে অস্তিত্বের অনির্বাণ হোমানলে। 'কে খেলায় আমি খেলি বা কেন?' মথুরবাবু সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, 'বাবা! সবই তো প্রাকৃতিক নিয়মে হচ্ছে, লালে লাল, সাদায় সাদা। তোমার লাল জবা গাছে সাদা জবা হবে?' ঠাকুর বললেন, 'তাঁর ইচ্ছে হলে তাও হতে পারে।'

হলও তাই। ঠাকুর ডালটা মথুরবাবুর টেবিলে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এই দেখ মথুর!'

সবিস্ময়ে দেখলেন, 'লাল আর সাদা জবা।'

অন্তরালে কার শক্তি, কোন শক্তি! ছোট্ট এতটুকু একটা বীজে বিশাল বটের শক্তি! নদীর গর্জমান তরঙ্গে বিদ্যুতের শক্তি! বিদ্যুতের বিস্ময়কর চালিকা শক্তি। আকাশে বিদ্যুতের এক চমকে কয়েক লক্ষ ভোল্টের উৎপত্তি। বালকের বিশ্বাসে একরকম, বিজ্ঞানীর পঠিত জ্ঞানে একরকম, আর আধ্যাত্মিক মানবের জ্ঞানে সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেটি কেমন? ঠাকুর বলছেন তাঁর বালক ভাইপো শিবরামের কথা। 'ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে ঘরের ভেতর সে আছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তবুও দ্বার খুলে খুলে বাইরে যেতে চায়। বকার পর আর বাইরে গেল না, উঁকি মেরে মেরে এক একবার দেখছে আর বলছে, খুড়ো, আবার চকমকি ঠুকচে।'

কে ঠুকছে! কোন সুদূর নভোলোকে বসে আছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক নিয়ন্তা। তাঁর কাছে সব আছে। বিরাট বিরাট চকমকি পাথর তাঁর হাতে। ঝড়ের রাতে আকাশের অলিন্দে বেরিয়ে এসে তাঁর ইচ্ছামতো এক-একবার ঠোকেন, আর ব্রহ্মাণ্ড ঝলসে যায় নিমেষ-নীল আলোয়। বালক তার স্থির পরা বিশ্বাসে সেই কনক হাত দুটি দেখতে পায়।

ঠাকুর তাঁর কলেজে পড়া যুবক ছাত্রদের তড়িৎ-সম্বন্ধীয় আলোচনা শুনে প্রশ্ন করলেন, 'হাঁরে, তোরা ও-কি বলছিস? ইলেক্‌টিক্‌টিক্‌ মানে কি?' যুবক-

ভক্তেরা তখন পরম উৎসাহে তাঁদের কলেজি জ্ঞান প্রকাশ করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, বজ্রনিবারক দণ্ডের উপকারিতা। সবাপেক্ষা উচ্চ পদার্থের ওপরেই বজ্রপতন হয়, সেই কারণে ওই দণ্ডের উচ্চতা বাড়ির উচ্চতার চেয়ে একটু বেশি হওয়া উচিত।'

ঠাকুর মন দিয়ে সব শুনে বললেন, 'কিন্তু আমি যে দেখেছি, তেতলা বাড়ির পাশে ছোট চালাঘর---শালার বাজ তেতলায় না পড়ে ওইটেতে এসে ঢুকল। তার কি করলি বল! ও সব কি একেবারে ঠিকঠাক বলা যায় রে। তাঁর ইচ্ছাতেই আইন, আবার তাঁর ইচ্ছাতেই উলটে-পালটে যায়। যাঁর আইন, যিনি আইন করেছেন, তিনি ইচ্ছে করলে আইন পালটে অন্য আইন করতে পারেন।'

নেতি নেতি করে যে শূন্যে উপনীত হবে সেখানে জ্ঞান নয়, আছে চৈতন্য। জ্ঞান আপেক্ষিক অনেক নিচের জিনিস। জ্ঞান হল প্রত্যক্ষের জ্ঞান। চৈতন্য হল চিদাকাশ। সেখানে জ্ঞান সূর্য উদিত হয়। কেন ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন। সে জ্ঞান কেমন? ইলেক্‌ট্রিক্‌টিকের জ্ঞান নয়। কূপ থেকে ইন্দ্রিয়ের পাকান দড়ি দিয়ে বোধের বালতি দিয়ে জল তোলা নয়। সমুদ্রের চরাচর উচ্ছ্বাসের মতো প্লাবিত হওয়া। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-এর চৈতন্যে জাগরিত হওয়া। 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে' নিজেকেই খুঁজে পাওয়া। এইটিই হল আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের বিকিরণের নাম চৈতন্য।

ঠাকুর সেই অবস্থায় পৌঁছেছিলেন জ্ঞান, ভক্তি আর তন্ত্রের পথ ধরে। সেই অবস্থাটা কেমন? পূজার জন্যে দূর্বা, বিল্বপত্র তুলতে গেছেন। দূর্বা তুলতে তুলতে অনুভব করছেন- -সর্বত্র চৈতন্য—ছিন্ন দূর্বাদলের বেদনা নিজে অনুভব করছেন। বিল্বপত্র তুলতে গিয়ে পাতার সঙ্গে বেলগাছের ছাল একটু উঠে এসেছে, মনে হল নিজের ছালই উঠে এল, বেলপাতা আর তোলা হল না।

এই কথাই বললেন, শ্রীভগবান তাঁর শ্রীমুখে,

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।

(গীতা : ৬অ/৩২)

হে অর্জুন, যে ব্যক্তি নিজের সঙ্গে অভিন্ন তুলনা করে সকল প্রাণীতে সুখ বা দুঃখ সমানভাবে দেখেন, সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ।

অনুভূতির জগতে প্রবেশ করতে হলে নীরব, নিবিড় ধ্যানের প্রয়োজন। মনে, বনে, কোণে। বোতাম-টেপা ব্যস্ততার এই যুগে মন যেন স্কেটিং বুট পরে সদাই ধাবন্ত। বন হয় প্রমোদকানন, না হয় মাফিয়াদের লীলাক্ষেত্র, আর কোণ। আসবাব পরিকীর্ণ!

সভ্যতার অসভ্যতায় মানুষের আত্মা আত্মহত্যা করেছে।